চন্দ্রিল ভট্টাচার্য

গুরুচণ্ডালিকা : রবীন্দ্র-রচনাবলি গুলিয়ে ঘণ্ট। শ্যামাকে প্রোপোজ করল অমিত রায়। দলে দলে যোগ দিন : মহামিছিলে আলেকজান্ডার তৈমুর লং-কে 'খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং !' কমরেড মঙ্গল : আলিমুদ্দিনের ছাদ থেকে অটো উড়ল মঙ্গলগ্রহে, সঙ্গে অ্যাসেট-লিস্টি—সৌরভ গাঙ্গুলি—আজীবন বামপন্থী, কক্ষনও ডান হাতে ব্যাট করেননি। জ্যোতি বসু—স্টক সীমিত। ঠুলি মাথায় ভাবো জুতসই কোটেশনঃ কেন ধনঞ্জয়ের ফাঁসি বাঙালির রঙিনতম সার্কাস। কলিকাতার বর্ণপরিচয় : 'উ'— লাগলে, ইংরিজি মিডিয়ামরা যা গিলে নিয়ে 'আউচ' বলেন। 'ঊ'—খুব লাগলে ইংরিজি মিডিয়ামরা যা বলেন। দশমহাবিদ্যা : প্রতিজ্ঞা-লিস্টি : র-ফলা উচ্চারণ করব, বাংলা ঠিক বলা পোচোন্ডো পোয়োজন। ফলিবেই ফলিবেই : বাসভাড়ার চেয়ে প্লেনভাড়া কমবে, নেতাজি এ বছরও ফিরবেন না। ওরে ভোঁদড় ফিরে চা : বাগুইহাটির মোড়ে দাঁড়িয়েও কীভাবে মেরুদাঁড়ার বেস অবধি অমৃতের চান—মেড-ইজি। আরও, আরও, আরও উড়নতুবড়ি, ঢিচক্যাঁও, পাখিশিস।

রস কষ
সিঙাড়া বুলবুলি
মস্তক

চন্দ্রিল ভট্টাচার্য

রস কষ
সিঙাড়া বুলবুলি
মস্তক

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

RAS KASH SINGARA BULBULI MASTAK
A Collection of Bengali essays by CHANDRIL BHATTACHARYA
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330/2219 7920, Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
₹ 150.00

ISBN : 978-81-295-1179-9

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১, মাঘ ১৪১৭
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১১, পৌষ ১৪১৮

প্রচ্ছদ : ব্ল্যাক মলাট, উপল সেনগুপ্ত

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৫০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রন্থন : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

সঞ্চারী মুখোপাধ্যায় ও অনির্বাণ ভট্টাচার্য

(যাঁরা মুদ্রণের আগে লেখাগুলো একশোবার পড়েছেন,
দু'শোবার মতামত দিয়েছেন, তিনশোবার ধাতানি খেয়েছেন,
চারশোবার ফিরে পড়েছেন, পাঁচশোবার পুনঃপরামর্শ
দিয়েছেন, ছ'শোবার ফের-বকুনি খেয়েছেন, সাতশোবার
কোলন না কমা, কমা না সেমিকোলন, কনুই না এলবো,
মৌরলা না সরপুঁটি, এগরোল না বাঘরোল, হ্যাৎ না ধ্যাৎ,
সমুদয় ধাঁধা-প্রশ্নে হাই চেপে ও চোখ জ্বলজ্বলিয়ে উত্তর
দিয়েছেন, আটশোবার তার বিরুদ্ধ-কাঁইমাঁই সহ্য করেছেন,
ন'শোবার একই মানচিত্রে আতস কাচ নিয়ে পুনরায়
ঝুঁকেছেন, এবং হাজারবার মনশান্তি মাঠসফর মিহিদানা ত্যাগ
করে ধন্যবাদহীন ট্র্যাপিজে ঝাঁপ খেয়েছেন)

আনন্দবাজার পত্রিকা ও তার বিভিন্ন ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত আমার লেখাগুলো এখানে সংকলিত হল। অবশ্য কয়েকটা একেবারেই উতরোয়নি, সেগুলো চেপে গেলাম। কিছু লেখায় সামান্য অদল-বদল হল, কোনও 'এখনত্ব' আরোপ করতে নয়, প্রকাশ-সময় থেকেই কিছু খুঁত নজরে ছিল—সেগুলো মেরামতের জন্য। বইটার তিনটে ভাগ : 'একের পাতা চারের পাতা', 'রবিবাসরীয়', 'অন্য অন্য'। প্রথমটায় আছে উত্তর-সম্পাদকীয়, যেগুলো প্রকাশিত হত আনন্দবাজারের চারের পাতায়, আর দেওয়া হল গঙ্গাসাগরের রিপোর্ট-সিরিজটা, যা অনেক সময়েই একের পাতায় শুরু হত। দ্বিতীয়টায় রবিবাসরীয়-র প্রচ্ছদকাহিনি। আর তৃতীয়টায় অন্যান্য ক্রোড়পত্রের লেখা। তার মধ্যে দু'টো পদ্য অবধি গুঁজে দিলাম। সময় ও প্রপার নাউন অস্ত গিয়েছে, কিছুটা পড়তে নির্ঘাত পুরনো লাগবে, কিন্তু সিংহভাগ দিব্যি নলেন ও ঝ্যাম্পোরপ্যাম্পোর : ভরসা।

চন্দ্রিল ভট্টাচার্য

আমারবই.কম amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও !

Amarboi.com Like 814

Say Thanks to Humayun Ahmed at www.humayunahmed.org

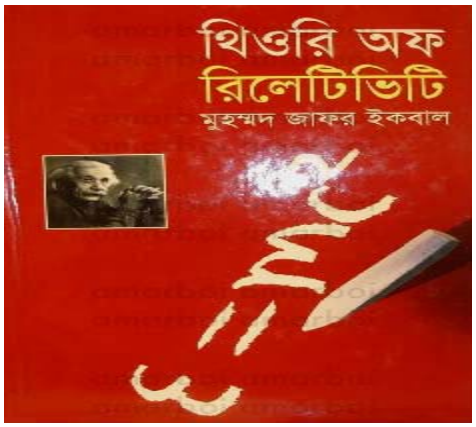

থিওরি অফ রিলেটিভিটি - মুহম্মদ জাফর ইকবাল

30 Nov 2011 | 1 comments

// থিওরি অফ রিলেটিভিটি E=mc[2]মুহম্মদ জাফর ইকবাল You can follow us ... *Read more*

আলোচিত বইগুলি

Dec/01 পূর্ব পশ্চিম (অখন্ড) - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

Dec/01 হাঙ্গর নদী গ্রেনেড - সেলিনা হোসেন

Dec/01 Winner of Amazon Gift Card

Nov/30 থিওরি অফ রিলেটিভিটি - মুহম্মদ জাফর ইকবাল

Nov/26 তিন ডব্লিউ - হুমায়ূন আহমেদ

Nov/26 অর্ধেক জীবন - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

Nov/25 AmarBoi Gets Google+ Page. Join. Win A Amazon.com Gift Card!

Nov/23 তেল দেবেন ঘনাদা - বাংলা সম্পূর্ণ কমিক

Nov/22 বৃক্ষকথা - হুমায়ূন আহমেদ

Nov/19 কচ্ছপকাহিনি হুমায়ূন আহমেদ

আরোও আছে

জনপ্রিয় বইগুলি

হিমু এবং হার্ভার্ড পিএইচডি বন্টুভাই - হুম আহমেদ

থিওরি অফ রিলেটিভিটি - মুহম্মদ জাফর ই

মিসির আলি বিষয়ক রচনা যখন নামিবে ত

প্রডিজি - মুহাম্মদ জাফর ইকবাল [বইমেলা

একটি সাইকেল এবং কয়েকটি ডাহুক পা আহমেদ

মেঘের উপর বাড়ি (২০১১ ঈদ) হুমায়ূন আ

হুমায়ূন আহমেদ এবং হুমায়ূন আহমেদ

শার্লক হোমস গল্প সংগ্রহ

রাতুলের রাত রাতুলের দিন - মুহম্মদ জাফর

বৃক্ষকথা - হুমায়ূন আহমেদ

বাংলা বই

পূর্ব পশ্চিম (অখন্ড) - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হাঙ্গর নদী গ্রেনেড - সেলিনা হোসেন

Winner of Amazon Gift Card

থিওরি অফ রিলেটিভিটি - মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আলোচিত বই

থিওরি অফ রিলেটিভিটি - মুহম্মদ জাফর ইকবাল

30 Nov 2011 | 1 comments

// থিওরি অফ রিলেটিভিটি E=mc[2]মুহম্মদ জাফর ইকবাল You can follow us ...*Read more*

Subscribe To Get F Books!

enter your email address...

subscribe

RECENT POSTS | COMMENTS

পূর্ব পশ্চিম (অখন্ড) - সুনীল গঙ্গো
01 DEC 2011

হাঙ্গর নদী গ্রেনেড - সেলিনা হোসেন
01 DEC 2011

একের পাতা চারের পাতা

সাগরসঙ্গমে চন্দ্রিলকুমার ১৩

দর্শক হইতে সাবধান ২০

দ্বন্দ্বমূলক বাস্তুবাদ ২৪

পাড়াপড়শির ঘুম নেই ২৯

কোকাকোলাহীনতায় ৩৩

বাবা কী এনেছ? নোবেল পেরাইজ! ৩৭

ভাল আছো, zানতি পারো না ৪০

ঠুলি মাথায় ভাবো জুতসই কোটেশন ৪৪

কলকাতার রেনি ডে ৪৮

পরের বিজয়া থেকে প্রণাম করব তোমায় ৫২

অঃ ৫৫

এ কী দ্বিলেমা ৫৮

চলো ছোবল শানাই ৬২

কেন চেয়ে আছো ৬৬

একলা পুজো ফোকলা পুজো ৬৯

ফিল্ম নয়, ফ্লিম ৭৩

যত মত, একটাই পথ ৭৭

'ও কিছু হবে না' ৮২

জিদান বাড়ি আছিইইস! ৮৬

বাইপাস করাব, তবু ৯০

ওরে ভোঁদড় ফিরে চা ৯৪

রবিবাসরীয়

গুরুচণ্ডালিকা ১০১
দলে দলে যোগ দিন ১১৪
কমরেড মঙ্গল ১২৪
দশমহাবিদ্যা ১৩২
নোয়ার নাও ১৩৯
রস কষ সিঙাড়া বুলবুলি মস্তক ১৪৭
ফলিবেই ফলিবেই ১৫৫
বিগ্রহ ও বি-গ্রহ ১৬৫
জু ১৬৮
মায়ার পিদ্দিম ১৭৬
হীরক রাজার দেশে ২০০৭ ১৮৩

অন্য অন্য

খাড়া বড়ি থোড় ১৯৫
অই লইয়া থাক ২০২
ছোট আছো ছোট থাকো ২০৮
কলিকাতার বর্ণপরিচয় ২১৩
ওম শান্তি ওম ২১৬
কলাবতী ২১৯
বিয়ে করতে ভয় করে ২২৫
শুক-সারীর গান ২৩০
নেই গুণ, কপালে আগুন ২৩২
পয়লা বৈশাখ কত তারিখ পড়ছে? ২৩৯
পুজোর পকেট-বুক ২৪৩
অপুর প্রথম ভোট ২৪৯
আমার ও-পার কাঁকুড়গাছি ২৫৫

একের পাতা চারের পাতা

সাগরসঙ্গমে চন্দ্রিলকুমার

১.

মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি নে মা। এমনকী যন্ত্রও জানি নে। সকলে কথায় কথায় ফটাফট বার করছে টেপ রেকর্ডার, এস এল আর, ভিডিও ক্যামেরা। আমি আনপড় গাঁওয়ার, মাঙ্কি ক্যাপ বাগিয়ে গঙ্গাসাগরের মোচ্ছব দেখতে এসেছি। বাসে সবাই খুব গুম হয়ে ঝিমোচ্ছিলেন, লঞ্চে উঠে সচিন-সৌরভেরা ফর্ম খুললেন। ইনি এর আগে ১৭ বার গঙ্গাসাগর এসেছেন তো উনি ১৮ বার ট্রিপ মেরেছেন। সাংঘাতিক সাফারিং তাঁদের সমৃদ্ধ করেছে। তখন আলো ছিল না, ফোন ছিল না, বালি খুঁড়লেই সাপ বেরোত। শুনতে শুনতে লজ্জায় আমাদের মাথা নিচু হয়ে গেল। কী যে অবুঝের মতো সরকার এখন সুযোগসুবিধেগুলো করে দিল। শুনেছি, সন্ধ্যায় একেবারে আলোর ভেল্কি লেগে যায়।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি, কই শিহরন জাগছে না তো? ভেবেছিলাম এমন থিকথিক করবে ভিড়, সমুদ্র পর্যন্ত দেখা যাবে না। কিন্তু এ যেন নিতান্তই সর্বজনীনের চত্বর, শুধু দু'শো গুণ বড়। লোকজন ঘুরছে ফিরছে, এগরোল কিনছে। দোকান থেকে 'ও কাকা' বলে খদ্দেরদের সাধছে। ক'জন সাধু দেখি বুক চিতিয়ে দাড়ি চুমরিয়ে গটগট করে হাঁটাহাঁটি করছেন। ত্রিশূল উঁচিয়ে বাচ্চাদের তাড়া দিচ্ছেন। সিংহের সাহস সঞ্চয় করে এক সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই শীতে আছেন কী করে?' জড়িয়ে-মড়িয়ে যা বললেন আর মাথার উপর হাত ঘোরালেন, তার মানে দাঁড়ায় : টাটকা বাতাসেই ঈশ্বরকে পাবে। সাগরের সন্ধ্যায় টাটকা বাতাস খালি গায়ে নিলে যে ঈশ্বরের আগে নিউমোনিয়াকে পাবে, এই জরুরি তথ্য জানানোর সাহস হল না। পটাপট সব নিরুদ্দেশ হচ্ছেন। টাওয়ার থেকে ক্ষণে ক্ষণে বাংলা-হিন্দিতে আশ্চর্য সব নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। বাবা, মা শিশুকে একটু জোরে আঁকড়ে ধরছেন এসব শুনে। যুবকেরা সাঁ করে এসে এস টি ডি বুথে ঢুকে মনের মানুষের খোঁজ নিয়ে

নিচ্ছে। যুবতীরাও। এত কম ভিড়ে বেশিক্ষণ নিরুদ্দেশ হওয়া শক্ত। আর কপাল খারাপ পকেটমারদেরও। শুনেছিলাম, এখানকার লক্ষ মানুষের কোটি পকেট থেকে দক্ষ পকেটমারের এক বছরের ইনকাম হয়।

সেই যে মহাসমারোহে এক কোট-প্যান্ট পরা এগজিকিউটিভ পুণ্যস্নানে এসেছিলেন আর বালুতটে লাগেজ রেখে সমুদ্রে নামার শেষে লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে কলকাতা ফিরতে হল, সে গল্প এখন তামাদি। নিজের মনেই জিভ চুকচুক করলাম। পরের লঞ্চযাত্রায় শহিদ-শহিদ গলায় জম্পেশ গল্প করার কিছুই রইল না।

২.

সাগরমেলা বলে কথা। তাই এখানে 'বেনফিশ' দিয়েছে নিরামিষ খাবারের দোকান। বইয়ের স্টলের পাশাপাশি বিকোচ্ছে কাশীদাসী মহাভারত, আরব্য রজনী, আধুনিক সেলাই কাটিং উলবোনা শিক্ষা। প্রমাণ সাইজের মূর্তি গড়া রয়েছে মনসা, কালী, নারায়ণ, লক্ষ্মীর। পাশেই ফেরিওয়ালার ছোড়া প্যারাসুট-পুতুল সাঁ করে মা কালীর নাক ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে। কপিল মুনির আশ্রমে ঝিকিমিকি আলোর মালা। কেউ ভিক্ষে করছেন এস্রাজ বাজিয়ে, কেউ ভয়াবহ কুষ্ঠগ্রস্ত শরীর দেখিয়ে। মোটামুটি থইথই করছে সব সংজ্ঞাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া ভারতবর্ষ। এবং ভারতবর্ষ থাকলে, ক্যান বিদেশ বি ফার বিহাইন্ড? জাপানি ভ্রমণার্থী হন্তদন্ত হেঁটে যাচ্ছেন। ছ'ফুট মেমসাহেব ডিজিটাল ক্যামেরায় চোখ রেখে ঠায় ভিড় দেখছেন। ভিড়ের অনেকেই সমুদ্র ফেলে তাঁকে দেখছে। সাধু দেখলেই কেউ পায়ে ধরছেন, কেউ হাত দেখাচ্ছেন, হাত-পা কিছুই ধরার ইচ্ছে নেই যাঁর, তিনি গরুর ল্যাজ ধরে বৈতরণী পার হচ্ছেন! গরু নয় ঠিক, বাছুর। কারও গায়ে চট, কারও নকশা করা চাদর, একজনের আবার শিঙে লাল টুকটুকে পাগড়ি। সকলেরই 'প্রতিটি লোমে এক কোটি বিষ্ণু'। এই বিজ্ঞাপনে লোভ সামলাতে পারলাম না, প্রথমে খালি পায়ে বালির উপরে থেবড়ে বসতে হল। গাঁদাফুল, থোড়, কুশ হাতে কিছু অং বং বলে, দাঁড়িয়ে উঠে জোরসে পবিত্র জানোয়ারের ল্যাজ চেপে ধরলাম। গরুর কী দাপানি! পাপীর মুষ্টি সহ্য করবে কেন? যাক গে, পাঁচ টাকা চার আনার বিনিময়ে 'জম্বুদ্বীপে ভারতখণ্ডে কলিযুগে পৌষমাসে' সব পাপ থেকে মহা-শর্টকাটে মুক্তি পেলাম।

যেদিকে তাকাও শুধু হোগলার ছাউনি ও ঘর, জায়গায় জায়গায় গোল হয়ে বসে সমবেত গান। 'গৌরদেশে যাবি তো মন পাসপোর্ট করা রে' গেয়ে

একজন আসর মাতাচ্ছেন। তাঁর আধুনিক 'টাচ' বহুত প্রশংসা কুড়োচ্ছে। বহু সাধুর স্টলে ব্র্যান্ড নিউ নামাবলি বিকোচ্ছে। সারে সারে ক্ষৌরকারও ক্ষুর উঁচিয়ে আছেন। ন্যাড়া হয়ে নামাবলি চাপিয়ে নেওয়া কয়েক মিনিটের ব্যাপার। অনেক সন্ন্যাসী টিভি চ্যানেলের সঙ্গে প্রাণপণ দরাদরি করছেন। না-পোষালে পারফরম্যান্স দেবেন না। একজন অবশ্য দর্শকসমাগম হতেই হঠযোগ দেখাতে শুরু করলেন। মহাসমারোহে পা দু'টোকে মাথার উপরে ঘুরিয়ে এনে প্রণামের ভঙ্গি দেখিয়েই 'কোঁক' করে বসে পেটে হাত বোলাতে লাগলেন। বেকায়দায় লেগে গিয়েছে আর কী।

দাপট দেখতে হয় নাগা সন্ন্যাসীদের। যত ঠাকুর-দেবতা আছে, সবার ছবি দেওয়ালময় সেঁটে সারি সারি ছাউনিতে বসে আছেন। লোকজনকে হেঁকে হুমকি দিচ্ছেন, 'হেই, কিছু দিয়ে যা শিগগিরি!' কেউ সোজা হেঁটে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ছেন, যাতে অস্বস্তির ট্যাক্স দিতে বাধ্য হন লোকে, কেউ দু'মাইল লম্বা জটা ও চামর দুলিয়ে মুশকিল আসানের গ্যারান্টি দিয়ে ধমকে ডাকছেন। কয়েকজন নাগা সাধু মিলে দেখলাম এক পঙ্গুকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন, সে তাঁদেরই এলাকায় ভিক্ষেয় ভাগ বসাচ্ছিল।

এর মধ্যে আবার 'যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা' স্টল খুলে 'সাপের মানচিত্র' বুঝিয়ে তাক লাগাচ্ছে। পাশেই চকচক করছে এড্‌স সচেতনতার পোস্টার। খুঁজলে কালাজ্বর, সততা, পরিবার পরিকল্পনাও পাওয়া যাবে। দলপতির লাঠির ডগায় পতাকা, কাতারে কাতারে মানুষ সব পাশ কাটিয়ে সাগরের দিকে চলেছেন। মাইকে মুহুর্মুহু শৌচাগারের কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের বিকার নেই। এত বড় সমুদ্র থাকতে স্যানিটারি-স্বস্তির বাড়তি প্রয়োজন কেউ বোধ করছেন না। কেউ সমুদ্রেই দু'টাকা দামের নারকেলে গোঁজা ধূপকাঠি গঙ্গামাই-কে নৈবেদ্য চড়াচ্ছেন। ঝপাঝপ ডুব দিচ্ছেন। মেয়েরা হাতে হাতে বিছিয়ে ধরে ভেজা শাড়ি শুকিয়ে নিচ্ছেন। চার দিকে উলুধ্বনি, খঞ্জনি, একতারার আওয়াজ। একজন কাঁধে লাউডস্পিকার ঝুলিয়ে প্রচার করছে। কাছেই ছাইমাখা সাধু সামনে শিবের পোস্টার রেখে আড়ে দেখে নিচ্ছেন, মিলছে কি না। বেয়াড়া বাছুর উদ্দাম দৌড়ে মালিককেই প্রায় বৈতরণী দেখিয়ে দিচ্ছে। বাচ্চারা কেঁদে ককিয়ে বালিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, ওই বড় বেলুনটাই চাই। ভিক্ষুক বাচ্চারা অ্যালুমিনিয়ামের থালা বাড়িয়ে আছে, কিন্তু ভিক্ষেয় মন নেই, হাঁ করে ঘনঘটা দেখছে। কালকে সি পি এমের সমাবেশ ছিল বলে বেশি লোক আসতে পারেননি। আজ কপিল মুনির সমাবেশে স্নানমুখী ঢেউ। ভারতবর্ষ।

৩.

যাঁরা ট্রেন-বাস-লঞ্চ বোঝাই করে ষাঁড়াষাঁড়ি বানের মতো রমরমিয়ে গঙ্গাসাগরে এসে, তিন মিনিটে তিন হাজার বার হারিয়ে গিয়ে, বালুকাবেলায় আসনপিঁড়ি হয়ে সংসার পেতে, পূর্ব দিকে মুখ করে গরুর কপালে সিঁদুর লেপে, ব্রহ্মতালুতে গীতা ঠেকিয়ে পূর্বপুরুষদের জন্য কলার খোলায় তিল-তণ্ডুল পিণ্ড ভাসিয়ে, গেয়ে নেচে কাপড় কেচে চরাচর সরগরম করে রেখেছিলেন, পুণ্যলগ্নে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে সমুদ্রে ডাইভ মেরে কিছুটা শান্ত হলেন। আগের রাত থেকেই গঙ্গাকে প্রদীপ জ্বালিয়ে, ডালা ভাসিয়ে তুষ্ট করা চলছিল। সন্ধেবেলা সমুদ্রের ধারে ছোট ছোট জ্বলন্ত প্রদীপ, ভাল ফোটোগ্রাফির হিন্দি সিনেমা মনে করিয়ে দেয়। আর্ট ফিল্মও আছে, যদি পাশাপাশি পাঁচ প্রৌঢ়াকে চুপ করে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতে দেখেন। অনেক উঁচু উঁচু স্তম্ভের আলোয় সমুদ্র এখন আলোকিত। যদি চট করে কেউ সেখান থেকে মেলার দিকে ফিরে তাকান, স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। ফ্লাডলাইটে ধুয়ে যাওয়া স্টেডিয়ামের মতো উজ্জ্বল, রাশি রাশি হ্যালোজেন, লাল-নীল-সবুজ টিউবলাইট শূন্যে ঝুলছে। মাইকে মাইকে বিভিন্ন ঘোষণা পরস্পরকে কাটাকুটি করছে। সমুদ্র চুপ, কিন্তু মেলার সম্মিলিত কোলাহলকে দূর থেকে ঢেউয়ের শব্দই মনে হবে।

সকালে অনেকে বালিতে মূর্তি গড়েন, মূলত হনুমানের। ইনি এখানে খুব জনপ্রিয়। এঁর খড়ের, মাটির মূর্তিও প্রচুর শোভা পাচ্ছে। তারপরেই কপিল মুনি। এঁরও লাল-নীল অনেক মিনি-ভাস্কর্য। সব মূর্তির সামনেই পয়সা ফেলার জন্য কাপড় পাতা। বহু লোক অবশ্য ব্যাপারটা ভীষণ শর্টে সেরেছেন। স্রেফ ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে ভগবানের ছবি ছিঁড়ে সারে সারে সাজিয়ে রেখেছেন। মহাদেবের বরাভয়ের তলায় জ্বলজ্বল করছে কারখানার নাম। একজন আর কিছু না-পেয়ে শার্ট-প্যান্ট পরা হাসিমুখ বাচ্চা ছেলের ছবি লাগিয়ে দিয়েছেন এঁদের মাঝখানে। আধুনিক নাড়ুগোপাল বোধহয়। রাতে দেখি, বালির বজরঙ্গবলীকে পদদলিত করে চলে গিয়েছে কারা।

ভগবানের কলোনির পরেই মানুষের বসতি। সেখানে যে কোনও সন্ধের মতোই রান্নাবান্না, গল্পগুজব, কেনাকাটা। যেন হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় কম্বল জড়িয়ে সমুদ্রসৈকতে শুয়ে পড়া কিংবা সামান্য হোগলার চাটাই দু'ভাঁজ করে তার মধ্যে রাত্রিযাপন খুব সহজ ও স্বাভাবিক ঘটনা। ধর্মের জন্য এতগুলো

মানুষ বাড়ির আরাম ছেড়ে এই প্রাণান্তকর কষ্ট করতে এসেছেন। তার মধ্যে দেহাতি মানুষ আছেন, জিন্‌স পরা তরুণীও আছেন। অন্য ভাষার ছেলের সঙ্গে অন্য ভাষার মেয়ের চকিত চোখাচোখি ও চমকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া চলছে।

সাধুবাবারা দেখলাম অধিকাংশই ঝাঁপ ফেলে দিয়েছেন। কেউ কেউ জাগ্রত চিহ্ন হিসাবে ত্রিশূলটিকে সামনে পুঁতে রেখেছেন। একজন পাহারায় রেখেছেন তাঁর অবিকল আঁকাবাঁকা তেলচুকচুকে গোখরোর মতো লাঠিটিকে। জেগে থাকা সাধুর মধ্যে জমিয়ে দিয়েছেন এক রক্তপোশাক পরিহিত হ্যান্ডসাম সন্ন্যাসী। তিনি লোকের থুতনি ছুঁয়ে বলে দিচ্ছেন, কে চায়ে চিনি কম খায়, কার ভোগ বেশি। এক কলকাতার যুবককে 'ওরে, তুই একদম আমারই মতো, বুকে আয়' বলে বাঁশের বেড়া টপকে আসার উপক্রম করলে সে 'এই ব্যাগ রেখেই আসছি বাবাজি' আউড়ে পত্রপাঠ চম্পট। সাধু তখন চোখ মটকে মুখভঙ্গি করে 'আমি পাগলা' বলে খ্যাকখ্যাক করে হাসতে থাকলেন।

কিন্তু সাধুর চেয়ে তাক লাগায় হরেক কিসিমের দোকান। আপনি যে জিনিসেরই নাম করবেন, এ মেলায় তা বিক্রি হচ্ছে। প্লাস্টিকের হাঁস, বিশাল আয়না, নকুলদানার প্যাকেট, লুডোবোর্ড, কপিল মুনির স্ন্যাপশট—কিছু বাদ নেই। মেয়েরা শাঁখা কিনছেন, পুরুষেরা ফুলকপি দর করছেন, বাচ্চারা দু'বার করে জগদ্বন্ধু সেবাঙ্গনের ফ্রি শরবত খাচ্ছে, রসিকদের জ্বালায় আলুর চপ, জিলিপি কড়ায় পড়তে পাচ্ছে না। ১২ টাকা জোড়া 'ফোল্ডিং হরিণ'। তারের তৈরি, শিং আর পা মুড়ে থলেয় ঢোকাও। একজন দেখলাম সাগরের ধারে শতরঞ্চি পেতে সেকেন্ড হ্যান্ড চশমা বিক্রি করছেন! 'পাওয়ার দেওয়া চশমা, পাওয়ার দেওয়া' বলে হাঁকছেন। রুদ্রাক্ষের স্টল দেওয়া সাধুবাবার ঠিক মাথার পিছনে পোস্টার পড়েছে, 'শিক্ষার গৈরিকীকরণ বন্ধ হোক'। পাশেই ঝলমল করছে বিশালাকৃতি সানি দেওল ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখ, দু'জনেই বিজ্ঞাপনে আকর্ণ হেসে তীর্থযাত্রীদের একই বিস্কুট খেতে অনুরোধ করছেন।

পৌষ সংক্রান্তির দিন আমাদের বাঙালি বাড়িতে পিঠে যেমন কম্পালসরি, এখানে তেমন খিচুড়ি। মেলার অধিকাংশ ক্যাম্প, ত্রাণশিবির, মায় ডি এম-এর অফিসেও গরম, ধোঁয়া ওঠা খিচুড়িরই প্রথা। মহামানবের সাগরতীরে বিপুল ভিড়ে ঘুরেফিরে ধাক্কা খেতে খেতে মনে হল, এমন দৈব মহিমান্বিত পাঁচমিশেলকে স্যালুট জানানোর এর চেয়ে ভাল উপায় আর আছে কি?

৪.

গঙ্গাসাগরের নেড়ি কুকুরেরা প্রথম প্রথম হেলেদুলে ঢেউ শুঁকে বেড়াচ্ছিল, যেন মহাপ্রস্থানের পথে 'পোজ' দিচ্ছে, গত দু'দিন ক্রমাগত মাড়িয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা তটস্থ। কাল থেকে ফের স্বস্তি। তবে বেচারাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় নির্ঘাত ঝালাপালা হয়ে গেছে। হাজার হাজার লোক, কোলে কাঁখে ব্যাগ-সন্তান-কম্বল, পরস্পরের কাপড়ের প্রান্ত ধরে হাঁটছেন, লেভেল ক্রসিংয়ের মতো বাঁশ উঠছে নামছে, তাঁরা স্রোতের মতো যাচ্ছেন আবার যানজটের মতো দাঁড়িয়ে পড়ছেন, ফৌজের লোকের খাতিরে নিয়ম লঙ্ঘন করে বাঁশ এক চিলতে উঠল তো পিলপিল করে ৫০ জন বেরিয়ে গেলেন। নিজের লোকের হাত ধরতে গিয়ে অন্যকে ধরে কিছুটা চলে যাচ্ছেন, উল্টোবাগে ফিরতে গিয়ে সটান ঐশ্বর্য রাইয়ের পোস্টার-পসরার দিকে। অবশ্য তার মধ্যে কী করে একটা নজরুল ইসলামের পোস্টারও ঢুকে গিয়েছে। দোকানির 'স্লিপ অব টাং'।

ওদিকে হারমোনিয়াম বাজিয়ে মিছিল বেরিয়েছে। লোকনাথ বাবা থেকে বামাখ্যাপা, সবার বিশাল ছবির উপরে ছাতা ধরে ভক্তেরা চলেছেন। সাগরে স্নানশেষে বালির উপরে আঙুল দিয়ে 'বৈকুণ্ঠের ঘর' আঁকছেন এক দল মহিলা। এটা হল, মৃত্যুর পরে যদি স্বর্গে যান, সেখানকার ঘরের অ্যাডভান্স বুকিং। প্রায় সকলেই কাটাকুটির মতো ছক কাটলেন, একজন দেখলাম দরজা, জানলা, কুলুঙ্গি সব এঁকে দিচ্ছেন। পারলে অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম। ওখানে গিয়ে আর হোগলার চালে পোষাবে না, বোঝা গেল। কত রকমের ঝগড়া। তেরিয়া যুবক বিস্কুট কিনে দোকানির সঙ্গে তর্ক করছে, 'কার্ড নেই কেন? অমুক খাও ওয়ার্ল্ড কাপ যাও কার্ড, আমি জানি না ভেবেছ?' ঘ্যানঘেনে বাচ্চা নাকে কেঁদে বলছে, 'ও বাবা, আর কত হাঁটবে?' তার ছোট বোন কোলে চড়তে পেয়েছে, দাদাকে টুকটুকে জিভ বার করে ভ্যাঙাচ্ছে। এক বৈষ্ণব বিনি পয়সায় চা খেতে চেয়েছিলেন, দোকানি না দেওয়ায় রেগে অস্থির : 'আমি শ্রীকৃষ্ণের ডিউটি করি। আমিও হকার, তুমিও হকার। আকাশ নিরাকার, সাগর নিরাকার, আমরা সাকার!' কিন্তু এত প্রকারেও লিকার না পেয়ে অকথ্য গালি দিতে দিতে চলে গেলেন।

আসল লগ্ন ঠিক কখন পড়ছে? কারও পরোয়া নেই। ভগীরথ অনেক দিনের লোক, হয়তো ক্যালেন্ডার গুলিয়ে ফেলেছিলেন। লোকে লগ্নের আগে, পরে, সব সময় চান করছেন। প্রি-পুণ্য, পোস্টপুণ্য, কিছুতে আপত্তি নেই।

অনেকে পাটকাঠি জ্বেলে প্রাইভেট হোম করছেন, প্রিয়জনদের নাম করে করে ডুব দিচ্ছেন, ইচ্ছে করে ননদের নাম ভুলে যাচ্ছেন, শেষকালে জলে পয়সা ছুড়ছেন। ফচকে কিশোরী বাবা-মায়ের জোড়াস্নানের ছবি তুলে খিকখিক করে হাসছে। ঢেলে বিক্রি হচ্ছে ফিনফিনে গাছের ডাল, 'ইন্দ্রজাল'। বাড়িতে রেখে জল ছেটালেই বশীকরণ হাতের মুঠোয়। পুরুতমশাই মন্ত্র পড়তে গিয়ে থমকে হাঁ করে অতিকায় হোভারক্রাফ্‌ট দেখছেন। গরুরা রাত জেগে ওভারটাইম করছে। তাদের মালিকেরা 'ও দাদা, গোদান করুন' ডেকে হেদিয়ে গেল। সকালে ছুড়ে দেওয়া পয়সা সমুদ্র যদি কিছু ফিরিয়ে দেয়, একজন সেই খোঁজে টর্চ নিয়ে ঘুরছেন।

সময় বুঝে ঠান্ডাও জাঁকিয়ে পড়েছে। সকলে শিউরে শিউরে পুণ্য করছেন। যে ফক্কড়ের দল ফিনফিনে জ্যাকেট লড়িয়ে নিয়মিত ইয়ার্কি করছিল, তাদের এখন ব্রেক-ডান্সের অনুশীলন। নাগা সন্ন্যাসীদের দেখে মালুম হচ্ছে, ব্রহ্মতেজ সোয়েটারের বাবা। অবশ্য সাধারণ মানুষ কম কী? স্নান সেরে গামছা-পরা ভদ্রলোক কাঁপতে কাঁপতে স্ত্রীকে ধমকাচ্ছেন, অবশ হাতে ধর্মগ্রন্থের পাতা ওল্টাচ্ছেন প্রৌঢ়া, গোটাটা সৈকতে বসে পাঠ না-করলে মুক্তি নেই, মুশকো জোয়ান দীক্ষামন্ত্র নেওয়ার সময় আষ্টেপৃষ্ঠে আলোয়ান জড়িয়ে মাঙ্কি ক্যাপ ফাঁক করে একটা কান খুলে দিচ্ছেন।

ক্রমে সব সুনসান। রাত ১২টায় ক্যাম্প-ফায়ার হয়ে গিয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির ১০ মিনিটের কোটা মেনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ। হোগলা নিলাম হয়ে গিয়েছে। বাবুরা ইলেকট্রিকের তার খুলে দিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছেন। যে বোবা ভদ্রলোক লিলুয়া থেকে ১০ জনের সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি সূচনাকেন্দ্রের নীচে বসে কাঁদছিলেন। সারা দিন বারবার ঘোষণা সত্ত্বেও কেউ নিতে এল না, তাঁর কী হবে? সমুদ্র বহু দিন ডিউটি দিচ্ছে, সে খুব ভাল করেই জানে, সবার পৌষমাস নয়। যে দলটির সর্বস্ব চুরি করে নিল গঙ্গাসাগরগামী বাসের পকেটমারেরা, যে মহিলার আট বছরের ছেলে হারিয়ে গেল ভোরবেলা, তাঁরা মেলার কী সর্বনাশা স্মৃতি নিয়ে ফিরবেন, সমুদ্রের তা অজানা নয়। সে তাই দু'দিনের কুটুমদের ভুলে থাকবে তার সঙ্গীদের নিয়েই : কপিল মুনির আশ্রম আর কয়েকটা ইতিউতি নেড়ি কুকুর।

১৩-১৬ জানুয়ারি, ২০০৩

দর্শক হইতে সাবধান

ভয়ানক কূট বখেড়া। সমগ্র জাতির মগজ কুটকুট করছে। আজহারউদ্দিনের বেটিং, তেন্ডুলকরের পিঠ-ব্যথা, দ্রাবিড়ের ঠুকুরঠুকুর ইত্যাকার প্রাণপণ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা পেরিয়ে যেই না অ্যাদ্দিনে 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ কাপটি লবে' মার্কা একটি ত্রিবর্ণ রামধনু রামাশ্যামা-চিদাকাশে মুন্ডু বাড়িয়েছে, অমনি ধড়াস করে থার্ড-রেট আতান্তরে ভারতীয় ক্রিকেটের পতন। উৎকুন মৎকুন টাইপ কতিপয় অলপ্পেয়ে নচ্ছার দর্শক ঢিল-পাটকেল-শিশি-বোতল হাতের কাছে যা পাচ্ছে বিদেশি ফিল্ডারকে তাক করে ছুড়ছে। এদের প্রক্ষেপণ আবার সম্পূর্ণ 'নিরপেক্ষ'! আগে লোকে ভাবত, দেশ হারলে জনগণ ক্ষোভে দুঃখে ঢিলপরায়ণ হয়ে ওঠে। এখন প্রমাণিত, ভারত হারুক আর নিশ্চিত জিতুক, বাঘের বাচ্চা সহবাগ ক্রিজে থাকুন আর প্যাভিলিয়নে, 'ঢিল ফর ঢিল্‌স সেক' দর্শন সপাটে চলবে। শিব্রাম বেঁচে থাকলে বলতেন, এ ঢিলেমি আমাদের মজ্জাগত। কিন্তু সমাধান তো সাততাড়াতাড়ি চাই। এ তো আর খাদ্যাভাব, শিশুমৃত্যু, গণহত্যার মতো অকিঞ্চিৎকর বিষয় নয়; যে ধীরেসুস্থে তদন্ত কমিশন বসালেই চলবে। ক্রিকেট বলে কথা। রাজার খেলা, মহারাজের দল, রাজকীয় পয়সা। একুনে এই ছোটলোক দর্শক লইয়া কী করিব?

বহু গুণী পর্যবেক্ষণশীল মানুষ এই সমস্যাসূত্রে পুলিশের পশ্চাদ্দেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অভিযোগ নিম্নরূপ : পুলিশের উচিত মাঠের দিকে পিছন ফিরে দর্শকদের দিকে স্থির লক্ষ রাখা। অথচ তাঁরা কিনা দর্শকদেরই পিছন দেখিয়ে একগাল হাসি নিয়ে মাঠের খেলা দেখতে ব্যস্ত। অর্থাৎ, সংঘবদ্ধভাবে পুলিশ তাঁদের পশ্চাদ্দেশ বিপরীতবাগে (অনৌচিত্যে) প্রোথিত করেছেন। এবার পুলিশের মানবাধিকারের কথাটা বিচার করুন। মাঠে ঠা ঠা উত্তেজনা, সচিন সেঞ্চুরির পথে কিংবা সহবাগ ঝড় তুলেছেন, অথবা স্লগ ওভারে দোদুল্যমান সমীকরণ, এই আসে তো এই ভেঙে যায় শ্রীনাথে বিশ্বাস,

জিভ শুকিয়ে আসছে হৃৎপিণ্ড স্পিড লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছে, সমগ্র ভারতের কোটি কোটি লোক অফিস-ব্যবসা-কলেজ-ভিক্ষে-রান্নাবাথরুম সমস্ত ফেলে হাঁয়াবড় হাঁ আর গোল্লা গোল্লা চোখ নিয়ে চোদ্দো ইঞ্চি কুড়ি ইঞ্চি যা খুশি ইঞ্চিতে সর্বসম্মতিক্রমে সেঁটে গেছে, শুধু পুলিশে কাজ করেন বলে ওঁরা নাকি অনড় অব্যয় দৃঢ় পিছন নিয়ে ওই কূলপ্লাবী থরোথরো উৎসবের সময় পরিপূর্ণ উলটো দিকে ফিরে দর্শকদের ব্রণ ছুলি খুশকি মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করবেন। অত্যাচারটা ভাবুন। একদম নাকের ডগায় হাজার হাজার দর্শক লাফিয়ে চেঁচিয়ে বিউগিল বাজিয়ে একাকার, আর তাঁদের পুলক, হতাশা, মুখব্যাদান বা নাসিকাকুঞ্চন দেখে পুলিশটিকে আঁচ করতে হচ্ছে সৌরভ ফসকালেন না ছয় মারলেন। এটা একটা 'অলৌকিক আন্দাজ কনটেস্ট' হতে পারে, 'উদ্ভট আই কিউ পরীক্ষা' হতে পারে, মানবিক দাবি হতে পারে না।

মহান গাওস্কর বলেছেন, সহ-দর্শকদের উচিত অসভ্য দর্শকদের দিকে লক্ষ রাখা এবং হাতেনাতে ধরিয়ে দেওয়া। কী রকম 'অ্যাসেমব্লি হল'-এ হেডমাস্টারের ভাষণ মনে হচ্ছে না? দর্শকরা অন্য দর্শকদের দিকে তাকিয়ে থাকবেন তো খেলা দেখবেন কখন? আর কেউ যদি এই অজুহাতে সুন্দরী মহিলার দিকে বিস্ফারিত নয়নে ঠায় তাকিয়ে থাকেন আর বলেন 'দেখছিলাম অসভ্যতা করছেন কি না', তখন? অসংখ্য বজ্জাত এই সুযোগে প্রতিবেশী, শত্রু আর প্রাক্তন প্রেমিকাকে বারবার ধরিয়ে দেবে, ক্লাস ফাইভের মতো পাইকারি হারে নালিশের ধুম পড়ে যাবে, 'স্যর, ও না, কী যেন ছুড়তে গিয়ে ফট করে লুকিয়ে ফেলল', 'না পুলিশকাকু, আমি না। ওই হলদে সোয়েটারের কাছে একটা পুঁচকে মিসাইল আছে।' নরম পানীয় বা সাবান কোম্পানিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সেরা শনাক্তকারীকে প্রাইজ দেবে। (আজকের 'সফেদ শার্লক হোমস' হলেন তেঘরিয়ার গুল্টু বসু। তিনি ছত্রিশটি অপরাধীকে ধরিয়ে দিয়েছেন। ফটাফট হাততালি, গুল্টুবাবুর ক্লোজ, চেক অর্পণ। এবার মেয়ের মিহি গলায় : সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। যেন শার্লক হোমস। সব রহস্য নিমেষে সাফ। টিং টং)।

সমস্যা উপড়ে ফেলতে গেলে সমস্যার মূলে যেতে হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বলেছে, দর্শক জিনিসটাই কাটিয়ে দাও। সব দর্শককে মাঠ থেকে বের করে খেলা শুরু হোক। অবিলম্বে এই টিমটাকে নোবেল, বুকার, জ্ঞানপীঠ সব দিয়ে দেওয়া উচিত। মার্কেজ-গোদার-পিকাসো কেউ এর ধারেকাছে ফর্ম ভাঙতে পারেনি। ক্রিকেট হবে আর দর্শক থাকবে না। বাহবা। কেয়া আইডিয়া হ্যায়।

দুই দেশের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেট, খেলা হচ্ছে নিউট্রাল দেশের মরুভূমিতে, ক্যামেরা সেই খেলা বয়ে দিচ্ছে কোটি কোটি পর্দায়। কোনও ঝামেলা নেই, কোলাহল নেই, হাততালি নেই, ঢিল নেই। এবং আসলি চিজ, স্পনসর আছে! খেলা হল টাকা ও ট্যালেন্টের বিবাহ, দর্শক তো এক উটকো অপ্রাসঙ্গিক ঝঞ্ঝাট, আবেগপ্রবণ হতচ্ছাড়াগুলোর আচরণ কোনওভাবেই আগে থেকে নির্ধারণ করা যায় না। হাটাও ব্যাটাদের। ন্যাড়া গ্যালারি খুব বেখাপ্পা দেখালে কম্পিউটারের কায়দায় ভিড়ের ছবি কপি করে বসিয়ে দাও। কোনও রক্ষণশীল গোঁয়ার খেলোয়াড় যদি অভ্যাসের বশে মাঠে 'সমর্থন', 'ধিক্কার' গোছের মানবিক ছোঁয়া চায়, ইংরিজি কমেডি সিরিয়ালের মতো মোক্ষম মুহূর্তে 'হা হা হা', 'হো হো হো', 'ছি ছি ছি', 'উই ওয়ান্ট সিক্সার' সাউন্ডট্র্যাক চালিয়ে দাও। বাস্তব আবার কী? শব্দ আর ছবি দিয়ে যা নিখুঁত নির্মাণ করব, তা-ই 'সত্য'!

একটু মাথা ঠান্ডা করে খতিয়ে দেখুন, মাঠে যাওয়া মানেই গাঁটের কড়ি খরচা করে ক্ষতি স্বীকার। মাঠে কী হয়? রোদ লাগে, হাওয়া দেয়, বাথরুম মাইলখানেক দূরে, আধশোয়া ফুলশোয়া হওয়ার সিন নেই, ফিল্ডার দৌড়লে বোঝা যায়, অ, ওই দিকে বল গেল। কী হচ্ছে না হচ্ছে গিলিয়ে দেওয়ার জন্য প্রাজ্ঞ শাস্ত্রী, ইংরিজি সিধু, ঠোঁটকাটা বয়কট নেই; ওভার শেষ হলে আমির খান ও সতেজ 'কুড়ি' শোভিত লোলালুলু বিজ্ঞাপন নেই; এবং সর্বোপরি, অ্যাকশন রিপ্লে নেই! ঘাড় ঘুরিয়েছ বা মনোযোগ দিয়ে গোড়ালি চুলকেছ তো ব্যস। আউট দেখতে পেলে না। এই প্রাগৈতিহাসিক ব্যবস্থা ভাবা যায়! আজকাল প্রেমিক প্রেমিকা চুমু খেলেও লোকে ছটা অ্যাঙ্গল থেকে রিপ্লে আশা করে। পাড়ার খেলায় আস্তে আস্তে দৌড়ে স্লো মোশনে রিপ্লে অভিনয় শুরু হল বলে। যে কোনও বিতর্কে ফ্রেম বাই ফ্রেম দেখিয়ে দিচ্ছে, রান আউটে ব্যাট এই এগোয় তো এই পিছোয়, এল বি-তে নীল সরলরেখায় লাল বল ড্রপ খায়নি তো মরেছ, ব্যাটে লাগলে শব্দগ্রাফ ধ্যাবড়া হয়ে উইকেটকিপারের সাক্ষী। আর ওদিকে বিজ্ঞানবঞ্চিত মেঠো বুদ্ধুর দল 'আমাদের এল বি দিলেই আম্পায়ার চোর' তত্ত্বে জিগির তুলে ফ্ল্যাগ নাড়িয়ে যাচ্ছে।

প্রগতি এই পোড়া দেশের পোষালে তো! এই তো 'বসনিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন' হিংসাত্মক ক্লাবদের অন্তরিন ম্যাচ খেলাচ্ছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় 'ক্লোজড্-ডোর ক্রিকেট' চালু করো, মাঠে যাওয়া নিষিদ্ধ করে টিভিতে আরামে উন্নততর খেলা দেখতে দাও, অতীতচারীগণ কেঁদে ককিয়ে 'আঁমরা কাঁই সুঁন্দর কঁমলালেবু নিয়ে মাঁঠে যেঁতাম!' জুড়ে দেবে। আরে, সে ব্যবস্থাও হবে।

মাঠ-মাঠ, পিকনিক-পিকনিক, সোনাঝরা দিনের গন্ধ চাই তো? 'হোম ডেলিভারি'তে লেবু, চিপ্‌স, টিফিনকারি ভর্তি পাঁউরুটি মাংস (ট্যাশদের জন্য পিৎজা), স্পনসরের নাম লেখা টুপি, পাউচবন্দি বিস্বাদ জল, মুখোশ, ভেঁপু, পোস্টার, রংচটা সোয়েটার সব ঘণ্টায় ঘণ্টায় পৌঁছে যাবে। লাখ লাখ বেকারের চাকরি হবে। খেলার দিন সাইকেল-অক্ষৌহিণী যখন আসমুদ্রহিমাচল গলিঘুঁজি বেয়ে অযুত নিযুত পরিবারের বসার ঘরে বস্তা উপুড় করে মাঠের নস্টালজিয়া সাপ্লাই দেবে আর কড়কড়ে নোট গুনে নেবে, লক্ষ্মীদেবী নাচতে নাচতে ভারতের ম্যাপে আরূঢ় হবেন। বহুজাতিক দৈত্যরা পিছিয়ে থাকবে না কি? 'আপনি মাঠে যাবেন কেন, বালাই ষাট, মাঠ আপনার ঘরে আসবে' স্লোগানের 'হোম ইডেন গার্ডেন' নির্মাতা আপনার বাড়ি বয়ে দিয়ে যাবে আর্টিফিসিয়াল সূর্য (যখন খুশি অফ করা যায়), দমকা হাওয়া মেশিন (বউয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়), এবড়োখেবড়ো সিমেন্টের ছোট্ট ছ'সিটার গ্যালারি, কিছু সিন্থেটিক ঘাস, টিভির দিকে তাক করে ছোড়ার স্পঞ্জের নিরপরাধ বোতল। বিশ্বায়নের বোলবোলাও দেখে আমেরিকা ট্যারা হয়ে যাবে।

কিন্তু জ্যান্ত ব্রহ্মতালুর দিকে ঢিল ছোড়ার ধর্ষকামী মজা? কবি বলেছেন, বেশ্যারা সমাজের বাড়তি যৌনতা ধারণ করেন বলে তা অন্যত্র অনর্থ ঘটায় না। তা হলে এই ঢিলোবার ধ্বংসাত্মক এনার্জি যাতে দাঙ্গা না বাধায় তার উপায়? খুব সহজ। স্টেডিয়ামে স্টেডিয়ামে জায়ান্ট স্ক্রিন খাটিয়ে তৈরি হবে 'অসভ্যতার মাঠ'। লেসার টেকনোলজিতে থ্রি-ডি খেলাও দেখানো হবে, বেশি দামের টিকিটে। এই ভার্চুয়াল ম্যাচে যত খুশি তাণ্ডব কর। পিচে ন্যাংটো হয়ে নাচ, অপোনেন্টকে কিলিয়ে কাঁটাল পাকিয়ে দে। সরকার এই অ্যাম্ফিথিয়েটার-মোচ্ছব তুর্কি নেচে অনুমোদন করবে। এক খেলার টিকিট পাঁচশো স্টেডিয়ামে বিক্রি, তদুপরি সমাজের বদরক্ত বের করার এমন ম্যাজিক তোকমারি, সোজা কথা? তিরঙ্গা ঢিল ফ্রি দেবে, 'কাম অন ইন্ডিয়া, পিটা দো' জিংগল বাজিয়ে দেবে। তা হলে এখানে কি কিছুই নিষিদ্ধ, বারণ থাকবে না? আলবাত থাকবে। গাওস্করের সূত্র অনুযায়ী, কোনও ব্যাটাচ্ছেলে যদি এই মাঠে এসে হাত গুটিয়ে সভ্য হয়ে বসে থাকে, সহ-অসভ্যদের দায়িত্ব তাকে পত্রপাঠ ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া!

১৭ নভেম্বর, ২০০২

দ্বন্দ্বমূলক বাস্তুবাদ

আরে বাপ রে, ভারত কি সহজ দেশ! হাজার হাজার বছর আগে মুনি ঋষিরা খাগের কলমে বনবন করে সেই সব লিখে গেছেন, যা আজ আমরা ইংরিজি আদিখ্যেতায় দেখে চমকে চমকে উঠছি। সেই আমরা ক্লাস থ্রি-তে বলাবলি করতাম, ওরে, তোদের আমেরিকা প্রভৃত ফান্ডা লড়িয়ে বিশ্বভুবনের নিমীলিত চক্ষু নিত্য চড়কগাছ করছে, ও সবই রামায়ণ-মহাভারতের যুগে আমাদের দেশ জলভাত করে হেলায় কুলকুচি। পুষ্পক রথ কী জানিস? এরোপ্লেন! সঞ্জয় কী দেখে কুরুক্ষেত্রের রানিং কমেন্ট্রি করেছিল? টেলিভিশন! এভাবেই : মেঘনাদের ক্যামোফ্লাজ, অর্জুনের মিসাইল, সীতার মেট্রো-রেলপ্রবেশ ('হে স্লাইডিং ডোর দ্বিধা হও')! এই 'পিতামহের অলৌকিক বিজ্ঞান' এখন বাজারে হেভি কাটছে। চাড্ডি সংস্কৃত বুলিয়ে দিলেই 'শাস্ত্র', সহজপাচ্য প্রাচ্য-ম্যানিয়ার আদিগন্ত সুড়সুড়ি। অ্যাদ্দিন আয়ুর্বেদিক বিজ্ঞাপনে স্মিতহাস্য জটাধারী মাজনের প্যাকেট এগিয়ে দিতেন। এবার, ভারতীয় রাজনীতির হাঁড়ির হাল ফেরাতে সংসদ ভবন সংশোধনের জন্য বাস্তুবিদ ডেকে আনলেন স্পিকার মনোহর জোশী।

সংসদ ভবনে, যাকে বলে, কলির কেচ্ছা। এ চটি ছুড়ে মারছে তো ও চোখে কলম খুঁচিয়ে দিচ্ছে, ইনি ছুটে গিয়ে ফরফরিয়ে শাড়ির পাড় ছিঁড়ে দিলেন তো তিনি কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে গজালেন নতুন খেউড়। তার ওপর আবার আগের ডিসেম্বরে উগ্রপন্থী হানা হয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড। তবে সবচেয়ে দুঃখজনক, তেরোজন পদাসীন সদস্যের অকালপ্রয়াণ। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন স্পিকার, বালাযোগী। নিতান্ত সুস্থ, ফিটফাট মানুষ, সেদিন জরুরি কাজে আকাশপথে যাচ্ছিলেন। হেলিকপ্টার উড়ছিল বোঁ বোঁ করে দিব্যি, যেন প্রগতির প্রাণভোমরা, আচমকা একটা আখাম্বা নারকেলগাছে দড়াম করে ধাক্কা মেরে ঘুরতে ঘুরতে পানাপুকুরের তলায়। এ কি স্বাভাবিক ঘটনা? অহরহ

কোঁদল, মিথ্যাচার, দাঙ্গায় মদত, অপঘাত মৃত্যু, গগনে এই ঘনঘোর অমানিশা স্রেফ সমাপতন? জোশী-মশাই বুঝেছেন, এ দৈব দুর্বিপাক, পার্লামেন্ট হাউসের গঠনটাই ভুল। 'বাস্তুদোষ' কাটাবার জন্য পণ্ডিত এসে ১৬ অক্টোবর আর ৭ নভেম্বর সরেজমিনে তদন্ত করে দশ পাতার লম্বা রিপোর্টও দাখিল করে ফেলেছেন। তা পেশ করা যাচ্ছে না শুধু বেরসিক কমিউনিস্টগুলোর ভয়ে।

বামপন্থীদের আবার, বিজ্ঞানমনস্কতার বাই আছে। ভারতে থাকব, আর হাঁচি, কাশি, পঞ্চমুণ্ডির আসন, হোমিওপ্যাথি, কিচ্ছুতেই পেত্যয় যাব না, এ পাকামো দেখলে গা জ্বলে যায়। এদিকে নিজেরা ভোটের তদ্বির করে বেড়াব আর এক সুন্দর সকালে আকাশ থেকে বিপ্লব খসে সক্কলের ঘাড়ে পড়বে এবং সর্বহারার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এই অলীক বিশ্বাস গিলতে খুব একটা বেগ পেতে দেখা যায় না। যাক গে, এঁরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিষ পড়াবার বিরোধিতা করেছিলেন। (ফার্স্ট পেপারে কুষ্ঠি মেলাতে পারলেই পঞ্চাশে পঞ্চাশ, রাশিফলের চোতা লুকিয়ে ছাত্ররা পরীক্ষার হলে ঢুকছে, 'বরাহ মিহির স্কলারশিপ' পাওয়া ছেলের নোট্স ছলাকলায় বাগিয়ে 'খনা মেডেল' পেয়েই কেটে গেল সুন্দরী ছাত্রী, এই সিনারি দেখে পূর্বপুরুষদের সামবেদ-সাধা গলা কি সাধুবাদে উদাত্ত হয়ে উঠবে না?) জ্যোতিষের ভাই বাস্তু। তবে বাঁচোয়া, বাস্তুর মাসতুতো ভাই ফেং শুই, খোদ কমিউনিস্ট চিনের শাস্ত্র। অবশ্য চিন যা অচিন রাজ্যে পাড়ি জমাচ্ছে, আর কদ্দিন বামপন্থীরা 'চিনের বুদ্ধ আমাদের বুদ্ধ' স্লোগানের মাও সামলাতে পারবেন, সন্দেহ আছে। সহজ বাক্য, বিশ্বাসে মিলায়ে 'বাস্তু', তর্কে বহু দূর! এই সরলরেখা ধরেই সংসদ ভবন স্টাডি করতে ঢুকলেন বাস্তুবিশারদ অশ্বিনীকুমার বনশল।

ঢুকেই তাজ্জব! আমেরিকা, ইংল্যান্ড, পাকিস্তান, রাশিয়া, জার্মানির সংসদ ভবন দেখে এসেছেন, কোথাও এত ভুরিভুরি পরিমাণে গলদ নেই। আঁতকে উঠে তিনি লক্ষ করেন, বাড়িটি একটি হুবহু গোল্লা! তাঁর দেখা সমস্ত দেশের সংসদ ভবন হয় আয়তাকার, নয় নিখুঁত চৌকো। গোল পার্লামেন্ট হাউস আবার কী? বনশল সাফ জানিয়েছেন, দেশের তামাম গোলমালের মূলে এই গোলাকৃতি। এটা স্টেডিয়ামের ডৌল হতে পারে, শাসনবাড়ির নয়। হয়তো ১৯২১ সালে রসিক লুতিয়েন্স সাহেব নকশা তৈরির সময় ভেবেছিলেন, এখানে বেধড়ক খেলাধুলোই হবে। সরকার একটা কথা বলবেন, তার খেই ধরে নিয়ে নাক-বরাবর উলটোবাগে ছুটতে থাকবেন বিরোধীপক্ষ; ওদিকে বামপন্থীরা দারুণ 'অফ দ্য বল' দৌড়বেন কিন্তু নিশ্চিত পাস পেয়েও

'ঐতিহাসিক ভুল' করে গোলে শট নেবেন না, আর মমতাজিকে রেড কার্ড দেখাতে গিয়ে স্বয়ং রেফারি (অর্থাৎ স্পিকার) বারবার গুলিয়ে ফেলবেন, তিনি এখন কোন দলে। গোলচক্কর সমূলে গাঁইতি পিটিয়ে ভেঙে ফেলে পঞ্চাশ কোটি টাকা দিয়ে নতুন নিশ্চিত বর্গক্ষেত্র গঠনের উপদেশ দিয়েছেন অশ্বিনীবাবু।

এই 'আকার দেখে বিকার বোঝো' বাস্তুতন্ত্রী বীজ কিন্তু সাধারণ বাঙালিদের মধ্যে অনেক দিন ধরেই নিহিত ছিল! গোলাকৃতিকে আমরা কি তেড়ে ভয় খাই না? পরীক্ষার আগে রসগোল্লা, ডিম, জিলিপি, গোল আলুভাতে, সব ভয়াবহ রকম বারণ। এমনকী কলাভক্ষণও বারণ, প্রশ্নপত্র পাছে চোখ মটকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফ্যাচফ্যাচ করে হাসতে থাকে। লম্বাটে ল্যাংচাও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত, 'ওয়ান' পাওয়ার ভয়ে। আর অতি বুদ্ধিমান ছাত্র প্রথমে একটা ল্যাংচা খেয়ে পরপর দুটো রসগোল্লা মেরে দেবে, নিশ্চিত একশো! লোকসভা আবার আধকাঠি বাড়া, শুধু গোল নয়, অর্ধগোলও আছে!

বনশল বলেছেন, সভাকক্ষটা ইংরিজি 'ডি'-র মতো দেখতে, বাস্তুমতে ভীষণ অশুভ। প্রধানমন্ত্রী বসেন দক্ষিণ-পশ্চিমে, যেটা বায়ুর এলাকা। বায়ু হতভাগা অস্থির হয়ে ঘোরে, চাপ দেয় এবং কুপিত হয়। হাঁটু তো নড়বড় করবেই! ওঁর বসা উচিত একদম মধ্যিখানে। যে জায়গা এখন 'এ ডি এম কে' আর 'টি ডি পি'-র দখলে। সাধে কি জয়ললিতা ফিনিক্স পাখির মতো পুনর্জীবিত এবং চন্দ্রবাবু নাইডু 'ভারতের বিল গেটস'? স্পিকারের চেয়ারটা আবার প্রেস গ্যালারির ঠিক নীচে। সেজন্যেই তিনি বিশৃঙ্খলা বাগে আনতে পারেন না। তাঁর সমস্ত বিবেচনার বিকিরণ বোধহয় ওই গ্যালারিতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে, অথবা ওপর থেকে বদবুদ্ধির প্রবল চাপে ঘিলু ভেস্তিয়ে যায়। অর্ধবৃত্তকার আসন-বিন্যাসের চোটে শাসক দলের কেউ বসেন পূর্ব দিকে মুখ করে, কেউ উত্তর-পূর্বে, কেউ আবার উত্তরে। একটা সমস্যাকে এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা তো তাঁদের পক্ষে অসম্ভব, সম্বচ্ছর অন্তর্দ্বন্দ্ব লেগে থাকবে না? বিরোধীরাও একই কারণে নারদ-নারদ। জলের মতো করে অশ্বিনীকুমার বুঝিয়ে দিচ্ছেন, গোটা দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে স্রেফ একটা নির্দিষ্ট বাড়ির স্থাপত্য-স্ক্যামের জন্য।

আরও আছে। সাড়ে-সর্বনাশ ঘটেছে ১৯৯৩ সালে প্রাঙ্গণে গান্ধী-মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করে। 'নেগেটিভ এনার্জি'র প্রভাব এতে বহুগুণ বেড়ে গেছে। তবে বনশলবাবু যত বড় বিশেষজ্ঞ হোন, তাঁর ঘাড়েও তো একটাই মাথা। তাই ওই

মূর্তি ভেঙে, তুবড়ে, দাড়ি লাগিয়ে বা স্থানান্তরিত করে সমাধানের পরামর্শ দেওয়া তাঁর বাস্তুতে কুলোয়নি। উনি বাতলেছেন, মূর্তিটি ঘিরে দেওয়া হোক, আর মূর্তি ও ভবনের মাঝখানে অনেকগুলো ফোয়ারা তৈরি করে দেওয়া হোক, তাদের সতত উৎসারিত জলধারা ঋণাত্মক শক্তির বিচ্ছুরণকে অনেকটাই শুষে নেবে, প্রশমিত করবে। ডিভোর্স-উপনীত দম্পতি কিন্তু এই টোটকা ব্যবহার করে দেখতে পারেন। স্বামী-স্ত্রী সর্বদাই একটা ছোট্ট পোর্টেব্‌ল ফোয়ারা নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন, মধ্যিখানে রেখে দিলেই তুষানল অনেকটা নিভে আসবে, আর পরস্পরকে জলের মিহি পর্দার মধ্যে দিয়ে ঝাপসা ঠাহর হওয়ার সুবিধে আছে, মুখ স্পষ্ট দেখতে না পেলে চট করে মাথায় খুন চড়ে যায় না। অবশ্য খাটের মাঝখানে সারা রাত ফোয়ারা চললে ঘুম চমৎকার হওয়ার কথা নয়, তবে এই বাধ্যতামূলক জলকেলি কত মিলনান্তক 'পজিটিভ এনার্জি'র দিগন্ত খুলে দেবে কে বলতে পারে?

এখন ফেং শুই জনপ্রিয়তার চার্টে এক নম্বর। কিন্তু তার মধ্যে একটা 'টুকিটাকি' ব্যাপার আছে। হাস্যরত পুতুল কুলুঙ্গিতে সাজাও, বাড়িময় খুশিয়ালি। ঘণ্টা ঝুলিয়ে দাও, প্রাণে আনন্দলহরী। হয়তো বৈঠকখানার টেবিলে মিনি-রাক্ষস রাখলে কাঁটাতার আর ন্যাজকাটা ডোবারম্যানের খরচা বেঁচে যাবে। কিন্তু এসবে ছাপোষা গেরস্থ ভাল থাকে, নেশন-স্টেট বাঁচে না। বাস্তুর একটা লার্জ-স্কেল ঘনঘটা আছে, গজেন্দ্রগমন। বাড়ি, ছাদ, পার্কিং জোন, জাতির জনক, লট কে লট শোধন করে দিচ্ছে। এই তো সংসদ চৌকো বাড়িতে উঠে গেলেই সমস্ত পাজির পাঝাড়া ভারতীয় নেতা সৎ ও জনদরদি হয়ে যাবেন, খাটের তলা থেকে ঘুষের সুটকেস বের করে কোটি টাকার লঙ্গরখানা খুলবেন। পুরো ভুল ধারণায় চলছিলাম তো আমরা, মৃত্যুহার কমাতে ওষুধ দিচ্ছিলাম, ফসল বাড়াতে সেচ করছিলাম। আরে, চাষির গোঁফের আকৃতিটা দ্যাখ, রোগী উত্তর-পূর্ব কোণে শুয়ে আছে কি না নজর কর!

বনশল বরং এরপর ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমিকের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, এগুলোয় মন দিন। আর উদ্বাস্তু-বাস্তু (অর্থাৎ ফুটপাথের কোন দিকে মাথা করে শুলে ওই রাস্তাতেই অচিরে তিনমহলা অট্টালিকা হবে) চালু করতে পারলে তো অর্থনীতিবিদগণ এবং ভারতীয় ভিখারিকুল সম্মিলিত হয়ে ডি. লিট দেবে! এইসব সর্বপাপতাপহর শোধনপ্রক্রিয়ার জন্য যদি সুনীল জলধিস্থিত এবড়োখেবড়ো ম্যাপ কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করতে হয়, হবে। ভারতের ফিগার তো সুবিধের নয়। হিমালয়টা যদি বাঁ দিকে ইঞ্চি বিশেক সরিয়ে দিতে

হয়, এ রাজ্য ও রাজ্য খাবলে নিতে হয়, কন্যাকুমারীতে কার্নিক মেরে ল্যাজটা মেরামত করতে হয়, কোযাগার উপুড় করে সে যজ্ঞ স্পনসর করা হবে। আহা, সে কী মাল্টিকালার দিন! কপিকল দিয়ে হিমালয় টানা হচ্ছে, এ মিরাক্‌ল দেখাতে পারলে আমেরিকা সেধে করজোড়ে দোরগোড়ায় বাস্তুসাপ হয়ে থেকে যাবে। মার্কসীয়রা লোকাল কমিটিতে পড়াবেন দ্বন্দ্বমূলক বাস্তুবাদ। আর বি জে পি-র গেরুয়া পৈতেবাজরা দু'হাত তুলে নেত্য করতে করতে কোরাসে বলবেন, শুভমস্তু, থুড়ি, 'শুভবাস্তু'!

১ ডিসেম্বর, ২০০২

পাড়াপড়শির ঘুম নেই

ময়রা মুদি চক্ষু মুদি পাটায় বসে ঢুলছে কষে হঠাৎ চমকে আঁতকে দ্যাখে উরি উরি বাবা ফের মোচ্ছব! পাস করা মেয়ের বাবা ডিউস বল সাইজের রাজভোগ ঠুসে দিচ্ছেন পড়শির প্রফুল্ল বদনে, ফেল করা ছেলের বাবা চাঁছাছোলা ফোল্ডিং বেত কিনে নিয়ে যাচ্ছেন হতচ্ছাড়ার নুনছাল তুলে ফেলবেন বলে। ধারেকাছে ওয়ান-ডে নেই, পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রাচীন ইস্যু, সুচিত্রা সেন আগামী সপ্তাহের মধ্যে মুখ দেখাবেন আশা করা যাচ্ছে না, অতএব ইদিক উদিক চেয়ে ময়দান বেবাক ফাঁকা দেখে মোক্ষম মওকায় হইহই করে আত্মপ্রকাশ করলেন মাধ্যমিকের রেজাল্ট। আর যায় কোথায়, পশ্চিমবঙ্গ রাতারাতি শিক্ষা-সচেতন পাবলিকে ছয়লাপ, হোলসেল বাস-ট্রাম অবচেতনে মাধ্যমিক-স্পেশাল, গত বিশ বছর যাঁদের পড়ার বইয়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই এবং আগামী বিশ বছর থাকার কোনও সম্ভাবনা নেই তাঁরা সিলেবাস বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তির উৎপত্তি ঘটাচ্ছেন চকিতে ব্রেনের কন্দর হতে, ইংরিজি প্রশ্ন ঠিক কী ধাঁচের হওয়া উচিত সে প্রসঙ্গে প্রতিটি ডিসপেপটিক গেরস্থ এক এক জন গ্রান্ডারি ওয়ান-ম্যান কমিটি, বাচ্চাদের অবধি সহসা ভুল হচ্ছে মডেলিং-এর চেয়ে মাধ্যমিক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য বিদ্যাসাগর আশু মুখুজ্জের রাজ্যে এর কম কি আশা করা যায় প্রাজ্ঞ আমজনতা হইতে? এফ এম চ্যানেলে ফোন পেলেই যাঁদের সমাজ বিষয়ে মিনি-বক্তৃতার ঢল নামে, তাঁরা নিজ দায়িত্বে মগন হবেন না এই শিক্ষালগনে? দেশের কচি কাঁচা ফিউচারগুলোর হাল জানতে ফেটে যাবে না তাঁদের কুতূহলী বুক? নিন্দুকের মুয়ে আগুন, শত ধিক, একশো ছি। টিভি চ্যানেল সঙ্গে আছে, করবি আমার কী?

আরে বাপ রে, টিভির তো সেদিন ওভারটাইম, সাইক্লোনের স্পিডে ইস্কুল পরিক্রমা, রং বেরং অ্যাঙ্কর-বাহার, টেনশনে আকুল হাউহাউ ক্রন্দনরত

মেয়েটির নাকে মাইক্রোফোন ঠুকে দিয়ে মনোজ্ঞ প্রশ্ন : তোমার টেনশন হচ্ছে? পালাবার পথ টোটাল বন্ধ। একে তো বাপ-মা হাতে একটি করে বেঁটে মোবাইল ধরিয়ে দিয়েছেন। দু'সেকেন্ড অন্তর হুড়ো লাগাচ্ছেন। খারাপ খবর পেয়ে যে টুক করে দিঘা কেটে পড়বে, তার জো নেই। তদুপরি কাঁদলেই ক্লোজ-আপ। দুঃখী মানুষকে একা থাকতে না দেওয়ার মধ্যে পাপারাৎজি-ঘ্রাণ পেলেন না কি? আরে ছো, সাধে কি মারকাটারি সিরিয়াল ছুড়ে ফেলে গৃহবধূর আকুল সওয়াল, ওগো, কে ফার্স্ট হল? কোন স্কুল হইতে? ড্রামা জমিবে কখন? বোর্ড তো হাত ধুয়ে খালাস। তিন মাস পর জানাবে। তা বললে সান্ধ্য চাউমিন হজম হয়? চালাও পানসি দিগ্বিদিকে। খুঁজে বের করো ফার্স্ট সেকেন্ড। সকলেরই দিব্যি পড়াশোনাময় সুরৎ, ভোলাভালা, সদানন্দ, চশমায় সাধনার ছাপ, হাসিতে সাত খুন মাপ। ক্যামেরার গন্ধ পেয়েই প্রতিবেশী গিন্নি ধনেখালি বাগিয়ে সাততাড়াতাড়ি এবাড়ি (ওকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি জানেন? এখন অবশ্য কোলে চড়ে না। কিন্তু অঙ্ক বুঝতে হলে কাকু ছাড়া চলবে? এবং টাক্না চাই কাকিমার আপন হাতের পাঁউরুটির পোলাও। টিং টিং টিটিং)। ছাত্রের প্রাণান্ত। পিঠে হাত রেখে কে দাঁড়াবে তার প্রতিযোগিতা, লেন্সের সামনে মিষ্টিমুখ করাবার জন্য চোরাগোপ্তা কনুই-ঠেলাঠেলি, পাশের ঘরে তো উচ্চণ্ড কলহ : জিওগ্রাফির কথা বলার সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে তোমার পুঁচকি প্রাণপণ পুতুল খেলছিল, তা হলে হিস্ট্রির শটে গুলতিসহ আমার খুদেটি কী দোষ করল দিদিভাই?

ওদিকে আবার এঁকেবেঁকে নৃত্য জুড়েছেন মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় না তৃতীয়! কেন নাচছেন বোঝা যাচ্ছে না, ওই তা তা থৈ লঘুলাথিচালনায় কি বই-তরণী পেরোলেন সদ্য? আরে না, ক্যামেরায় তো অঙ্ক কষে দেখানো যায় না, তাই নেচে দেখাচ্ছেন। মোল্লা নাসিরুদ্দিন যেমন অন্ধকার বাগানে চাবি হারিয়ে আলোকিত ল্যাম্পপোস্টের তলায় খুঁজতে গিয়েছিলেন, অন্ধকারে খুঁজবেন কী করে? আর হ্যাঁ, ওই 'মেয়েদের মধ্যে প্রথম/দ্বিতীয়'টি কী বস্তু? মেয়েরা কি কম বুদ্ধি নিয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন? না কি পায়ে গোদ? ছেলেদের ও তাঁদের কি আলাদা রঙের প্রশ্নপত্র ছিল? কর্তৃপক্ষ তাঁদের সুযোগ-সুবিধে বেশি-কম দিয়েছেন? আসলে এই আলাদা-লিস্টির ঐতিহ্যে নিহিত 'দ্যাখো, মেয়ে হয়েও ইনি ভাল রেজাল্ট করেছেন, ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছেন' শংসাবাক্য, একটু মাথা খাটালেই যাকে তুমুল অসম্মান বলে চেনা যাবে। তবে এর ক্ব নিয়ে রইরই কাণ্ড করে দিয়েছেন মিডিয়া-বাবাজি।

পুজোয় যেমন অভিনব পুরস্কারের হিড়িকে 'সেরা কার্তিক', 'শ্রেষ্ঠ ইঁদুর', 'দুর্ধর্ষ পুরোহিত' চালু হয়ে গেছে, তেমনই স্কুপের তাড়নায় 'বাঁকুড়ায় প্রথম', 'বাজেশিবপুরে প্রথম' এক্সক্লুসিভ কভারেজ চলছে। সামনের বছর 'এই তিনটে গলির মধ্যে প্রথম', 'চার ফুট দশের মধ্যে প্রথম', 'কষের দাঁত-ভাঙাদের মধ্যে প্রথম' দেখার জন্য তৈরি হোন।

সবচেয়ে যা মিস করার, তা হল গেজেট-কাণ্ড। আহা, সে ছিল দিন, সিনেমার ব্ল্যাকাররা অবধি ধর্মেন্দর-হেমামালিনী ছেড়ে গেজেট তুলত। আর তাদের ঘিরে শীতকালীন মশার ঝাঁকের মতো চলমান ভিড়। জনসমুদ্রে হাঁচোড়পাঁচোড় গলে গিয়ে বাজখাঁই স্বরে নিজনাম পুকারো। সমবেত সাসপেন্স ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে। ব্ল্যাকার নাম খুঁজছে, ক্লাইম্যাক্স চড়ছে। ফার্স্ট ডিভিশন হলে গচ্চা পনেরো টাকা, সেকেন্ড ডিভিশনে দশ, আর নাম না থাকলে? ওই লাখো লোকের সামনে সজোর স্ট্যাম্প : ফেলুবাবু! মনে হবে বিশ্বে ঢ্যাঁড়া পিটে দেওয়া হল, নতমুখে ভিড় ঠেলে ফিরতি গুটিগুটি। ধরণী তখনও দ্বিধা হয়নি, মেট্রো রেলের ইউজার-ফ্রেন্ডলি চটজলদি আত্মহননের হটলাইন অনাগত। লেভেল ক্রসিং খুঁজে গনগনে রোদে ঘাতক-প্রতীক্ষা কাঁহাতক পোষায়? অনেকেই ম্যাটিনি শো-তে ঢুকে পড়ত। মেয়েদের প্রস্থান হত দু'টাইপ। হয় মুখে রুমাল ও বক্ষে কান্না চেপে আশু বিবাহের নিষ্কৃতি কল্পনা করতঃ গজগমন। নচেৎ ছিমছাম দেখে ছোট গলি বেছে ঠাস করে মূর্ছা। পরে উঠে ভাবা যাবে'খন।

এখন মূল ম্যাচ কলকাতা ভার্সাস জেলা। এবং কলকাতাবাসীও কলকাতার বিরুদ্ধে! দেখেছেন, জেলাগুলো কীর'ম প্রতিবার মেরে বেরিয়ে যাচ্ছে? ক্লান্ত চোখে লাদেন-ঝলক। এই জয়ে একটা গেরস্থ অ্যান্টি-এস্ট্যাব্লিশমেন্টপনা আছে। দাদাগিরি-বিরোধিতা। যে তৃপ্তির উদ্‌গারে আমরা বউয়ের কাছে নকশাল সাজি, এ টক্করে সেই সরল বিপ্লবিয়ানা বিরাজে। ভিকট্রিটা নগরের বিরুদ্ধে গ্রামের, রাজধানীর বিরুদ্ধে প্রত্যন্ত অঞ্চলের, সুতরাং বাঙালি লজিকে বড়লোকের বিরুদ্ধে গরিবের, অমানুষ উৎপল দত্তের বিরুদ্ধে সৎ উত্তমকুমারের। আমেরিকাকে ভিয়েতনাম যখন কম্বল-ধোলাই দেয়, কিংবা ফ্রান্সের পেনাল্টি বক্সে সেনেগালের ভেল্কি চলে, তখন আমরা যেমন প্রতিশোধের মুঠি খুলি আর বন্ধ করি, ভেতর থেকে একটা তুরীয় 'মার শালাদের' উথলে ওঠে, জেলার শ্রেষ্ঠত্বে সেই প্রোলেতারিয়েতের জয় খচিত।

তবে রিভার্স সুইংও সমানে। নাস্তিকের যেমন ভগবান ছাড়া চলে না,

ইদানীং বাঙালি তেমন সি পি এম-কে গাল না দিয়ে আচমন করে না। চলতি গুজব : বামফ্রন্ট জেলাগুলোকে প্রীত করার জন্য ফি বছর একটি করে ফার্স্ট প্রাইজ পাইয়ে দিচ্ছে। এতে মেধাবী ছাত্রদের তেড়ে অপমান করা হয় ঠিকই, কিন্তু আড্ডা হেভি জমে। 'আরে রাখুন মশাই, শেষ কবে কলকাতার স্কুল ফার্স্ট হয়েছে বলুন তো? শুধু নাম না জানা গাঁয়ে-গঞ্জে পড়াশোনা হয় বলতে চান?' অবশ্য এ-ও ঠিক, নোবেল থেকে দাদাসাহেব ফালকে সকল উপঢৌকনই যে-রেটে রাজনীতির আজ্ঞাবহ, উপদ্রুত অঞ্চলে লাগসই সম্মানপ্রদান কম্পেনসেশন-কৌশল হিসেবে অধুনা অ্যায়সা হিট, যে নিন্দুকটির থিওরির জবর সাম্প্রতিকতার গুণ গাইতেই হয়।

কিন্তু আসলি জিনিস আমাদের এই রোগাভোগা তনুমধ্যে দেশ কি ধড়কন। পাঁজরের তলে মোদের দপদপ করছে মহান সমষ্টিবাচক হৃদয়। পড়শির ছেলে পরীক্ষা দিলে সারা রাত এপাশ ওপাশ। আবাসনের একটি ক্যান্ডিডেট মানেই গোটা কম্পাউন্ড বিনিদ্র। সব সত্তর বছরের বুড়িরা মুহুর্মুহু বাথরুম। ভাল করে ফ্ল্যাটটা চিনিও না, তাতে কী? মাহেন্দ্রক্ষণে সবাই বারান্দার গ্যালারিতে। তুখোড় স্পেকুলেশন—দুপুরে রেজাল্ট জেনে ফিরেছে, বিকেলে বেড়াতে বেরলে পাস, নইলে লবডঙ্কা। ইতিমধ্যে চুটকি প্রচুর : জেল থেকে পরীক্ষা দিল, অ্যাঁ? সে কয়েদিরা তো হিরো। দু'বেলা স্পেশাল লপ্‌সি। সঙ্গে পেপসি। কিছু পাপ ডিসকাউন্টও দেওয়া হল বোধহয়। আর ইন্টারনেটের পেঁয়াজিটা লক্ষ করেছেন? ওয়েবসাইট কি পোড়ো মন্দিরের দরজা, চাড় না দিলে খুলবে না? আরে ইতালি গিয়ে প্যান্ট পরলেই কি হাই-ফাই হওয়া যায়? বলতে বলতে কোরাস, বেরিয়েছে, বেরিয়েছে। ওরে, পাস? হ্যাঁ মাসিমা, হাই সেকেন্ড ডিভিশন। (বাঙালির ভাষাপ্রতিভা! এক ডিভিশনের তিন বিভাগ খুলে দিয়েছে। কিন্তু কেউ ভুলেও বলে, আমার ছেলে 'লো ফার্স্ট ডিভিশন'? উঁহু, অপ্রচলিত)। আর তোর সেই লম্বা বন্ধুটা? ও ফেল মেরেছে। হবে না, বাবাটা তো রোজ রাত্রে ড্রিং করে। পিশাচ! ধীরে ধীরে ফেনিয়ে ওঠে সুশিক্ষার গ্যাঁজলা, সমব্যথার সর্‌রা। ফোন যায়, খবর আসে, চুরমুরের মতো মাখা হয় গাল ও গল্প। কে র‍্যা, এডুকেশনলিপ্ত বাঙালিকে কেচ্ছাপ্রবণ বলে গাল পাড়ছে? হিংসে না করে দলে দলে যোগ দে। আসছে বছর আবার হবে।

২২ জুন, ২০০৩

কোকাকোলাহীনতায়

হাফ সার্কল ফুল সার্কল হাফ সার্কল এ, হাফ সার্কল ফুল সার্কল রাইট অ্যাঙ্গল এ : বলো তো আমি কে? টিফিন টাইমে চরাচর নিমেষে স্তব্ধ। বুঝভোম্বল ক্লাসমেটদের সামনে খাতা বাগাও, হাঁদারা, হাফ সার্কল হল C, ফুল সার্কল O, রাইট অ্যাঙ্গল L, হেঁয়ালির উত্তর COCACOLA! লোকগাথায় প্রোথিত স্বর্গীয় পানীয়ের নাম শ্রবণে সবাই অবচেতনে ওয়াটার বট্‌লের প্রতি হাত বাড়িয়েছে, অজ্ঞজনের প্রশ্ন, হ্যাঁ রে, কোকাকোলা কারে কয়? সে কী জানিস না, সে তো পুরো আমেরিকাময়! বহুত বরষ পহলে, হামাদের বাপ-দাদারা পঞ্চাশ পয়সায় কোকাকোলা পিয়ে থাকত। হারে মা, কী তার সোয়াদ, কী সুবাস। কিন্তু বদমাস জনতা সরকার উহা ব্যান করিলে। এখুন হামরা তার নামে রিড্‌ল বানায়েছি, খেতে পাইছি না। কুইজপ্রবণ ফার্স্ট বয় পিছিয়ে থাকবে কেন? সবাইকে জড়ো করে ফিসফিসিয়ে : জানিস, কোকাকোলার ফর্মুলাকে কী বলে? সেভেন এক্স। ফর্মুলা ছিঁড়ে সাত ভাগ করে সাতটা লোকের কাছে রাখা থাকে। লোকগুলো থাকে সাতটা আলাদা শহরে। কখনওই সবাইকে একসঙ্গে তুমি পাবে না। যাকেই কিডন্যাপ করো, গোটা ফর্মুলা পাওয়া অসম্ভব। গুলবাজ বেঁটে জুড়ে দিলে, ছ'টা লোককে যদি বা পাও, সবচেয়ে ভাইটাল সপ্তম লোকের সন্ধান তো ইমপসিব্‌ল। বউ অবধি জানে না, সে আসলে ফর্মুলাবাহক! বুকপকেটে ছোট্ট কাগজে একটা ছোট্ট কথা, সেটাই কোকাকোলার আসলি উপাদান। উহাতেই ধুমাধাড় স্বাদ। গুলবাজের কথা তখন কেউ বিশ্বাস করিনি। গুলবাজ বড় হয়েছে, সেদিন বলে গেল—ওই ম্যাজিক উপাদানটাই বোধহয় : কীটনাশক।

ডাইনোসর যায়, স্পিলবার্গ আসে, উথালপাথাল ঘটে ইতিহাসের চ্যাপটারে, কিন্তু সত্য ও আমেরিকার জয় অবশ্যম্ভাবী। যেই আমাদের দাড়ি গজাল, প্রভূত ডঙ্কা বাজিয়ে কোকাকোলা আসিছে ফিরিয়া। দোসর: নবীন কিন্তু প্রবল পানীয় পেপসি। সঙ্গে বিজ্ঞাপনের রাজকীয় টোটকা: আর ইউ রেডি ফর

দ্য ম্যাজিক? আরে হ্যাঁ স্যর, সকল নিয়ে বসে আছি 'আহা!' বলার আশায়, এবারে ভাসাও মোরে অনন্ত তামাশায়। উঠে যাবে রে, তোদের এসব ইন্ডিয়ান খুচুরখাচুর কুটিরশিল্প হয়ে ফুটে যাবে, অ্যাদ্দিন ভাবতিস 'কোক' মানে কোকশাস্ত্র, আজ জানবি কোকাকোলা। ওই দেখুন রেমো ফার্নান্ডেজ আর জুহি চাওলার যুগলবন্দি শুরু করছে সেই ঐতিহাসিক ক্যাম্পেন, যা ক্রমশ তুড়ি মেরে বৃহৎ পাঞ্জায় টেনে নেবে তাবৎ বড়-মেজো স্টার, লম্বু বচ্চন আর নাটা সচিনকে নাচাবে একই সুতোয়, কুছ কুছ হোতা হ্যায়-এর মূল কাস্ট-কেই হাজির করে দেবে, একে ট্রাকে তো ওকে মোটর সাইকেলে। সমগ্র ইন্ডিয়ান টিম ড্রেসিং রুমে সাজুগুজু করছে, হেনকালে কৈ ওই পরচুলামণ্ডিত, নেমে যায় সচিন সেজে? শাহরুখ মশাই না? আরে, অবাক হওয়ার কী? প্রিটি জিন্টার সঙ্গে শিল্পাঞ্জির রঙ্গ দেখাচ্ছি, সিংহের কপালে ঠাঁই করে ছুড়ে মারছি ডিউস বল, চিতাবাঘের ফোঁটা দিয়ে লিখে দিচ্ছি 'মাউন্টেন ডিউ'। ন্যাড়া সলমন থেকে পেশল অক্ষয়, ম্যাচো ফারদিন থেকে মেয়েলি সইফ, বিড়াল বিপাশা থেকে ক্লাসিক ঐশ্বর্য—কে তোর প্রাণেশ্বর/শ্বরী? আমরা তাকে এমপ্লয় করি।

শুধু স্বপ্নের নায়কদের দাবার ঘুঁটির মতো চেলে দেওয়া নয়, টাকা ঝনঝনালেই তাঁদের পছন্দ যে রাতারাতি বদলে দেওয়া যায়, এ তত্ত্ব গিলে আমরা শিখলাম কত। যে আমির খান সুন্দরী প্রতিবেশিনীর জন্য দোকানের নেমে আসা শাটারের মধ্যে দিয়ে বিপজ্জনক ভাবে গলে গিয়ে পেপসি উদ্ধার করে আনতেন, আজ অনেক বড় ও দড় তারকা হয়ে তিনিই স্লোগান শেখান, 'ঠান্ডা'র প্রতিশব্দই কোকাকোলা। উল্টোটা: প্রাক্তন কোক, অধুনা পেপসিও আছে। প্রিয়তম সৌরভ। আগে ওপর থেকে কোক পড়লে ধরার জন্য পড়িমরি দৌড়তেন, এখন পশুরাজের কবল থেকে পেপসির ক্রেট উদ্ধার করে রেগে ভাজ্জিকে বলছেন, যা, বল লে কে আ। ভাই, সত্য বোলে তো, এ সকল পানীয় আমাদের পিতামাতাস্থানীয়। নীতি-গীতি-ত্রিকোণমিতি এঁরাই আমাদের টিকি টেনে কাঁধ ঝাঁক্কে নিরন্তর। আমাদের দিল, তাই, এখন মাঙ্গে মোর। ফেরার পথ নেই। আমাদের সানগ্লাস থেকে জুতো, টাকার লোভ থেকে মেয়ে-আকাঙ্ক্ষা, বে-শরম নিতম্ব-আন্দোলন থেকে ক্যান্টিনের ভাষা, সব যে ওঁরাই তৈরি করেছেন। আমরা সেলফোন না থাকলে মিশি না, ডিওডোর‍্যান্ট না মাখলে প্রেম করি না, ট্যাক্সিকে 'ক্যাব', টাকাকে 'বাক্স', প্রেমিকাকে 'বেবি' বলি, ভুঁড়িবাগীশ হলে ডায়েট কোক-পেপসি গিলি, হৃতিকের মতো সুরত হলেও দাঁতে ব্রেস পরলে দুয়ো দিই, বন্ধুকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'অ্যান্ড হোয়্যার

আর ইউ মারাওয়িং আড্ডা?' আমরা 'জেনারেশনেক্সট', অ্যাড দেখে আমোদে মরব, সে বিজ্ঞাপনের স্প্রাইট-কৃত প্যারডি দেখেও উল্লাসে লুটোব, কীটনাশক অর নো কীটনাশক, তুমি হুট করে এই রেগুলার আনন্দযজ্ঞের নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করতে পারো না।

আর সত্যি খতিয়ে দেখা যাক তো, এত হাঁউমাউয়ের হয়েছেটা কী? কোক ও পেপসিতে কীটনাশক পাওয়া গেছে। খেলে নাকি ক্ষতি হয়। মানববাবু আবার তড়িঘড়ি তারাতলা থেকে নমুনা নিয়ে গবেষণাগারে পাঠালেন। সবাই উঠে পড়ে লেগেছে, মার ব্যাটাদের ধর ব্যাটাদের। আরে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম টালা ট্যাঙ্কের জল খেয়ে ফাটিয়ে দিল, মহালয়ার তর্পণ করছে গঙ্গার গা-গুলনো জলে, যেখানে ডুব দিচ্ছে সেখানেই যা মুখে আনতে নেই তা ভেসে বেড়াচ্ছে, আবার হঠাৎ এ কী হাইজিনের ফ্যাশন! শিয়ালদায় কত কীটনাশকের বাবা ভেসে বেড়াচ্ছে খোঁজ নিয়ে দেখুন না বাপ। প্রস্রাবের স্রোত আর জঞ্জালের স্তূপ মাড়িয়ে বাজার করে ফিরছি রোজ, রাস্তার রং পাল্টে দিলাম গামলা গামলা পিক ফেলে, ট্রেনযাত্রীরা পার্ক সার্কাসের চামড়ার আড়তের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নাক টিপে টিপে খ্যাঁদা হয়ে গেলেন, বাসযাত্রীর নাসামর্দনের দায়িত্ব নিল ধাপার মাঠের অসহ পারফিউম, ন্যাংটার হঠাৎ এই বাটপাড়ফোবিয়া দেখলে হাসি চাপা দায় হয়ে পড়ে।

ছেলেবেলায় হরদম টালা ট্যাঙ্কে মড়া ভাসার মিথ শুনেছি, কেউ তো মশাই নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাব-এ পাঠায়নি। মেটানিল ইয়েলো রং মারা কমলাভোগ আর বোঁদে কুটুমদের সামনে ধরে দিচ্ছি, তুঁতে দেওয়া সবুজ পেঁপে পটল এনে উপুড় করে সগর্বে ঢেলে দিচ্ছি বউয়ের সামনে, এস্টার দিয়ে সুগন্ধ তৈরি করা ল্যাবেঞ্চুস বাচ্চার মুখে ঠুসছি কাঁড়ি কাঁড়ি, কার্বাইড দিয়ে পাকানো আম প্রত্যেক ডিনারে শেষপাত মহিমাময় করে রেখেছে। প্রতিটি বিষ। মারাত্মক, ও নিশ্চিত ক্ষতিকর। প্রায় সব সবজিতে কীটনাশক। আর নলকূপ ও আর্সেনিকের হরিহরাত্মা সম্পর্কের কথা ঠিকঠাক জানলে, খোদ পানীয় জলেই প্রেতের তাণ্ডবনেত্য বুঝে, কোল্ড ড্রিঙ্কে সিসাক্যাডমিয়াম নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। ফ্র্যাংকলি বলুন তো, এ সবে কী এসে যায়, এই ক্যালাস নীলকণ্ঠ-প্রজাতির। আসলে, বহু দিন শারজা টুর্নামেন্টের দেখা নেই, কারা দুম করে গবেষণার হুড়ো লাগিয়ে দিল। আর ইয়ের ওপর বিষফোঁড়া, এরা আমেরিকান।

আমেরিকার পিছনে লাগার একটা বড় সুবিধে, কেন যে আমেরিকা খারাপ, যুক্তি দিয়ে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। প্রাণ বা প্রেম চোপড়াকে দেখলেই যেমন

নিশ্চিত হওয়া যায়, ব্যাটাকে লাস্ট সিনে বেধড়ক ঝাড় দেওয়া উচিত, আমেরিকার ভিলেনত্বও তেমনই স্বতঃসিদ্ধ। আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মানেই প্রবল ঠিকতা, সচেতনতা, স্বদেশিয়ানা। সংঘ পরিবারের স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ বলেই দিয়েছে, আমরা কোক-পেপসির গাড়ি ভাঙব, বোতল আছড়াব, কেউ কিছু বলতে পারবেন না। পরেশ পাল বলেছেন, কোক নয়, ডাব খান। আদিখ্যেতা দেখে বাঁচি না। নাইটক্লাবে ডাব বিকোবে? উৎসুক ছেলেটি তার 'ডেট'কে কী অফার করবে? রঙিন স্ট্র দেওয়া ডাব? একটা রগরগে শিরশিরে চনমনে পৃথিবীকে হঠাৎ ম্যাড়ম্যাড়ে সাত্ত্বিক করে ফেলা যায় সহসা উল্টো দিকে চাকা ঘুরিয়ে? ইতিমধ্যেই দোকানে দোকানে সাধারণ লোক কোল্ড ড্রিঙ্ক ঠেলে ফুট জুস খাচ্ছেন। ভাবুন, পেপসির বদলে পেঁপের রস? এ তো যৌনতার বদলে হঠযোগ! আমরা ভাবসম্প্রসারণের জাতি। কবি কী বলিয়াছেন, কবি না বলে দিলেও আমরা বুঝে ফেলি। এটুকু বুঝব না, এই পানীয়রা শুধু পানীয় নয়, এরা রীতিমতো যাপন, এরা আমাদের রক্ত, ভাষা, ভোগ এবং মূল্যবোধ; চতুষ্পার্শ্বের এই যে বহমান জগৎ, এই যে এ টি এম-এস এম এস-ডি ভি ডি, ক্রেডিট কার্ড ও হোম লোন, এরাই কোক, হ্যাঁ পেপসিও। এদের বাদ দিয়ে আমরা বাঁচব তো? ভারতীয় ক্রিকেট টিম বাঁচবে তো? প্রিটি জিন্টা ঠিক থাকবেন তো? অ্যাদ্দিনের তিল তিল নির্মিত উচ্চগু মজার বায়ুস্তর আজ নিরামিষ হলে তা গালভরা শোনাবে, শ্বাস চলবে তো? তার চেয়ে চাড্ডি স্বাদু কীটনাশক খেলে কী হত? পকেট থেকে জেলুসিলের ন্যায় অ্যান্টি-কীটনাশক চিবিয়ে নিতাম নয়। (ভয় নেই, দ্রুত বেরিয়ে যাবে, ইফ বিষ কাম্‌স, ক্যান বিষহরি বি ফার বিহাইন্ড?) ভেবে দেখুন, প্রতিবাদীগণ, আমরা কিন্তু শাটার নেমে আসার আগেই ডিগবাজি দিয়ে নিপুণ গড়িয়ে সর্‌রা খেয়ে ঢুকে যাচ্ছি পানীয়ের মন্দিরে, প্রিয়তমা এসে চোখ তুলে বলেছে যে, 'হাই, আই অ্যাম সঞ্জনা'!

১৭ অগস্ট, ২০০৩

বাবা কী এনেছ? নোবেল পেরাইজ!

আজি হতে শতবর্ষ পরে, কে তুমি ঝাড়িলে কষি আমার নোবেলখানি সিঁদ কেটে ঘরে! রবিস্যর একেবারে ফায়ার। ইন্দ্র, বিষ্ণু, দেবাদিদেব সব পায়ে ধরে বসে আছেন। নারদ লেটে এসে আবার আলখাল্লার আড়ালে পা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ম্যানেজ করতে উল্টে পিনিক দিয়ে ফেললেন, 'বুদ্ধর পুলিশগুলোকে থাবড়ে ই-টিভিকে একটা প্ল্যানচেট-ইন্টারভিউ দেবেন না কি স্যর?' একে তো টকটকে রাজরং, তায় অনবরত মাথায় রক্ত চড়ছে, এবার দিব্য-আনন একদম কমিউনিস্ট পতাকার মতো লালটুসকি। তড়িঘড়ি কোরাসগণ 'আহাহাছে বার্গলার, আহাহাছে স্মাগলার, নোবেল লয়ে সে ভাগে' গাইতে লাগলেন, 'তবুও শান্তি'র জায়গাটায় একটু মুচকি হাসি যেন আভাস রেখে গেল।

বাঙালি 'হোম লোন' নিয়ে খুপরি ফ্ল্যাট কিনতে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ এত বড় শোকটা মাথায় ধড়াস করে এসে পড়ায় কেমন ভোঁ ধরে গেল, প্রথমটা মড়াকান্নার স্কোপ পেল না। খানিক অবিশ্বাস (খাস ঠাকুরঘরে বাটপাড়ি!), শেষে ইরফান পাঠানের গোলার মতো গুডলেন্থ খেউড়। 'আরে, কীর'ম অপদার্থ রে! জয় বাবা ফেলুনাথ থেকেই তো জানি, আসল জিনিস ব্যাঙ্কে রেখে রেপ্লিকা-টা লোককে দেখাতে হয়। আর এরা খোদ নোবেল নাকের ডগায় সাজিয়ে, নকলটা ভরেছে স্ট্রং রুমে!' অফিসবাবু গভীরতর অসুখ খুঁজে বার করেছেন, 'ব্যাটারা গার্ড দেবে কী, বুধবার খেলা গিলছিল তো সব! এই শালার ওয়ান-ডে হুজুগই গোটা দেশটার সর্বনাশ করবে, বলে দিলাম!' ম্যাচের জন্যে সি এল নেওয়ার কথাটা আলতো চেপে গিয়ে কোলের ওপর ব্রিফকেস সযতনে রাখলেন। কোমল কাব্যপ্রেমীর অবশ্য গাল দেওয়ার জো নেই, সেনটেন্সের মাঝামাঝি গলা বুজে আসছে। সেই ভোরবেলা সঞ্চয়িতা নামিয়ে বসেছেন, ব্রেকফাস্টের ছানা অবধি জানলা দিয়ে ফেলে দিলেন। 'কী করে আজ খাওয়ার কথা ভাবলে তোমরা? তাও যদি টকে না যেত!'

চোরের কথা ভাবলে সক্কলে হকচক। 'আচ্ছা ও করবে কী বলুন তো ওগুলো দিয়ে? নোবেলের ধন কিছুই যাবে না বেচা।' মানকিক আঁতেল কিন্তু প্লটের হদিশ পেয়ে গেছে : ছেলে এসে বললে, বাবা বাবা, আজ আমার জন্য কী এনেছ? চোর বললে, এই নাও বাছা, নোবেল পেরাইজ! এই বিগিনিং কেউ দেখেছে? কিংবা বউকে মাঝরাত্তিরে তুলে হানিমুনের প্রেজেন্ট—অ্যায় মেরি হেমামালিনী, এই লাও ঝোলা দুল, নোবেল গলিয়ে গড়িয়েছি। আঠারো ক্যারাট, দুশো গ্রাম। এট্টু ভারী, কান ঝুলে যাবে, কিন্তু পয়া খুব, ডেলি কে ডেলি পেন্নাম পেয়ে আসছে। তবে সবার তো অত থিওরি গজায় না, চোরবাবাজির আদ্যশ্রাদ্ধ লাগাতার। আস্তিক নিশ্চিন্ত, 'ও হাত খসে যাবে। কুঠ হবে। ভাবছেন কী, যে হাতে নোবেল ধরেছে সে হাতে ভাত মাখতে পারবে বাছাধন?' পণ্ডিত ঘেন্নায় মরে যেই বলেছেন, 'ছ্যা ছ্যা, সোনা নে দানা নে, ন্যূনতম একটা এডুকেশন নেই ছোঁড়ার!' ফেমিনিস্ট স্টাইল ভরে কেশেকুশে, 'আহেম! কী করে জানলেন ওটা ছোঁড়া? করিৎকর্মা ছুঁড়ি তড়িৎগতিতে এ কুকর্ম করতে পারে না? এত জেন্ডার-ইনসেনসিটিভ কেন আপনারা?'

সহ-চোরেরা অবশ্য প্রণিপাতে ফ্ল্যাট। উরিপ্পা, তুমি নোবেল গ্যাঁড়া দিলে বস! লোকে টিভি-ফ্রিজ মায় ব্যাংক সাবড়ে দশ কোটি, লেকিন এত্তাবড়া লিড-খবর কেউ কোনও দিন পারেনি। বাঙালির শ্রেষ্ঠ আইকনের কানখুসকি চুরি গেলেও নিউজ হত, কিন্তু এ একেবারে 'মারি তো ডাইনোসর' হয়ে গেছে গুরু। যদ্দিন বাংলা সাহিত্য থাকবে তুমি থাকবে।

বাঙালি ততক্ষণে হিস্টিরিয়া গুছিয়ে নামাচ্ছে। দীর্ঘশ্বাসের লু বয়ে যাচ্ছে পাড়ার রকে, বুক থাবড়ে 'এর চেয়ে আমার পাঁজর নিলিনে কেন রে' বলে রোদন মচাতেই বুড়ো দাদু 'মডার্ন দধীচি' লেবেল পেয়ে গেলেন। কোটেশনবাগীশরা ভাল পারফর্ম করছেন, 'হা জীবনদেবতা' বলে এ মুচ্ছো যাচ্ছে, ও ফোটোর দিকে হাত তুলে 'তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ' বলে হাই-পিচ শোক জ্ঞাপিল, 'চুরা লিয়া হ্যায় তুম নে নোবেল কো' গেয়ে টিন-এজার ভেবেছিল হাততালি, দ্যাখে তেড়ে কানমলা! পাকা পাবলিক অফিস গিয়ে 'এ আমার এ তোমার পাপ' চেঁচাতেই প্রবল ধমকি, 'কক্ষনও আমাদের নয়, শুধু তোর পাপ!' গৃহবধূ আর থাকতে পারছেন না, 'এতগুলো রুপোর বাসনপত্তর নিয়ে গেল গো, একটা রেখে গেল না, ওফ!' যেন রেখে গেলেই বিশ্বভারতী ওঁকে ডেকে ওগুলো পায়েস খাওয়ার জন্য প্রেজেন্ট করত। বেঁটে ডানপিটে শুধু আশা করে করে হেদিয়ে গেল, 'অ মা, নোবেল চুরি গেছে, ইস্কুল ছুটি দেবে না?'

কিঞ্চিৎ ডামাডোল নোট করার, এ মারকাটারি হুতাশে। চুরি মাত্রেই হেভি নিন্দনীয়, সে রবিকবির বাড়িতে হোক, বা রামাশ্যামার। এই যে 'ছি ছি ইতর অসভ্য অমানবিক, অন্য কোথাও চুরি করতে পারত, রবীন্দ্র-জিনিস কেন নিল' মার্কা একটা আদিখ্যেতা চলছে, উদ্ভট! চোর কি ফিলজফার? সে সোনাদানা দেখে চুরি করবে, ঐতিহাসিক তাৎপর্য ওজন করে সিঁদকাঠি সামলাবে কেন? আর, সাধারণ গেরস্থর গোদরেজ ফাঁক করে দিতে তার চোখের পাতা পড়বে না, কিন্তু রবিবাবুর সিন্দুক হাতড়াবার বেলায় দরদ উপচে একূল ওকূল ভেসে যাবে, এ ক্যায়সা 'অ-গণতান্ত্রিক' দাবি? নিঃসহায় বিধবার সর্বস্ব লুঠ হওয়ার চেয়ে কি বেশি দুঃখজনক এই ঘটনা? এর মধ্যে হাঁ হাঁ করে সভ্যতার সংকট খুঁজে পাওয়াটা ভাবসম্প্রসারণের প্রাচীন হ্যাবিট মাত্র। ও রুপোর প্লেটে কেউ খেত না, ও বালুচরি কেউ পরত না।

এবং আসলি মনে রাখার, মেডেলটা চুরি মানে সম্মানটা চুরি নয়। জিন্দেগিতে কখনও যদি ওটা ডিসপ্লে না করা হত, কিছু এসে যেত? আপনি তো সত্যজিতের অস্কারটা দেখেননি। অমর্ত্যবাবুর নোবেলও না। তাঁদের প্রতি সম্মান এক কণা কমেছে? নোবেল কমিটিকে ফোন-টোন হয়েছে, জুতসই রেপ্লিকা এল বলে। আমাদের তো গদগদ দর্শন নিয়ে কথা, কৃপণ যেমন রোজ ঘড়ায় রাখা মোহররাশি দেখে আটখানা। অতএব কেয়া ক্ষতি? চোর ধরতে তো হবেই, হইহইও করতে হবে। কিন্তু অমন জিনিস-আঁকড়া হবেন না, চোর নিয়েছে গোল্লা-প্রতীক মাত্র, ১৯১৩ যেমন সুতীব্র জ্বলজ্বল ছিল, আছে। আদত বস্তুর 'অপরিসীম ঐতিহাসিক মূল্য' নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, ও কথাটার আসল মানে 'বাস্তব মূল্য ঘণ্টা'। বরং প্রায় রবিবাবুরই কায়দা খাটিয়ে, মনে করে নিন, 'নাইট' উপাধির মতো, বিশ্বায়ন/বাঙালির অধোগমন/কপিরাইট লুপ্তি গোছের একটা কারণে উনি নোবেলটা ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আরও টোটকা আছে। হাতুড়ে নিউমেরোলজিস্টের মতো বলুন, আনলাকি '১৩ সালের বদলে ভদ্রলোক যদি '১৪ বা '১৫-য় নিতেন, কোনও গোল থাকত না। অথবা পাড়ার জ্যোতিষীর কথায় গভীর খুসকি চুলকোতে থাকুন: বাঙালি আইকনদের সময়টা ভাল যাচ্ছে না, বুইলেন না? আমাদের ছেলেটার ফিল্ডিং করতে গিয়ে কী ডিস্ক-ফিস্ক উল্টে গেল, এখন ফার্স্ট টেস্টে তো অ্যাবসেন্ট। ইদিকে রবিবাবুর এই সব্বোনাশ। এবার বিজয়া-বউদিকে তড়িঘড়ি একটা ফোন লাগাতে হবে, অস্কারটা একা ফেলে বাথরুমে না যান!

২৮ এপ্রিল, ২০০৪

ভাল আছো, zানতি পারো না

লেখক হতে গেলে উত্তমকুমার-ছাঁট নাকি কম্পালসরি? আমরা বুদ্ধুরাম, আঁতকে উঠি, সে কী! লিখতে জানা যথেষ্ট না? প্রকৃত চালাকগণ খ্যাঁকখ্যাঁক কুটিপাটি, 'বলেন কী? সার্ফে ধোওয়া জামা না পরলে নোবেল পাবেন ভেবেছেন? আরে মহায়, ফর্সা না হলে টিভি-কমেন্টেটরের চাকরি অবধি দেয় না জানেন?' ফট করে আলট্রা-স্মার্ট মন্ত্র ব্রেনে ঝলসায়। কোণে কোণে মে একই বাতেলা ইথারে সাঁতরাচ্ছে, ওঃহো, তাই তো, মার্কেটিং-ই সব। আপনি ন্যাড়া ছাদে ডন-বৈঠক আর দেড়মণ ছোলা তড়পালে কিচ্ছু হবে না বস, বাইসেপে লোগো লাগাতে হবে, সিরিয়ালের মাঝখানে 'থাইল্যান্ড-এর চেয়েও বড়' বলে নিজের থাই-এর প্রোমো দেখাতে হবে। সিনেমা হোক ইয়া দিদিমা, হ্যারি পটার থেকে সেক্সি ডটার, ভেতরে সব ঢনঢন করুক, বিজ্ঞাপনটি লালে-নীলে বিগ-বাজেটে ঝলসাও, পাবলিক হামলে ঝিলমিল খাবে, ঠকেছে বোঝার আগেই তুমি নয়া ফ্ল্যাট ও চারচাকা হাঁকড়ে একেবারে ওয়া সুনীলবাবু।

তা হলে কি দিনকেও রাত বলে বিক্রি করা যাবে প্রভু, ছয়কে সাত? আরে আলবাত। এই দ্যাকো না, তুড়ি মেরে ইলেকশন জিতিয়ে দিচ্ছি। কাজের বেলায় কাঁচকলা, তো কেয়া? সারা জীবনে ভারতবর্ষ এক অক্ষর দেখিনি, বিরিয়ানি দিয়ে জলখাবার করিচি, এসকালেটর চড়ে জাঙিয়া কিনতে গেছি, সুইমিং পুলে একস্ট্রা ক্লোরিন না ঢুকলে চোখ দিয়ে জল পড়েনি, তা বলে কি ওই শালা মোটরগাড়ির পিছনে দৌড়নো গরিবগুর্বোর ঘুরছি-ঘুরব আন্দাজ লাগাতে পারিনে? এই তো প্রণয়ন করলুম মোক্ষম সুপারহিট লব্জ: ফিল গুড। সিস্কস্ট্রিন করে সাঁটিয়ে দিন, গাধাগুলো কাল থেকে ভাববে সব কে সব ভাল আছে। ভুখা চাষি আত্মহত্যা করেছে? পরোয়া কী? তার ছেলে হেভি ভাল আছে। ডায়েটিং করে তুখোড় স্লিম। দাঙ্গায় পুরুষগুলোকে কুপিয়েছি আর নারীগুলোকে হোলসেল রেপ? মহা আশ্চর্য, এ সপ্তাহে যে ধর্ষণ হয়নি, সেজন্য

মহিলাটি ভাল নেই? আরে হাতের পাঁচ, এ শালা নিরক্ষর পাবলিক। বেছে বেছে চাট্টি বলিরেখাদীর্ণ ফেস আনুন তো, ফোটোজেনিক। ন্যাকড়াঝোকড়া কাপড়, নাকে সিকনির ড্রপ, কিন্তু ফোকলা হাসিটি হতে হবে ইয়ে কান থেকে এক্কেবারে উয়ো কান। পেছনে মিউজিক লাগান এ আর রহমান টাইপ, ব্যস আপনার মাল তৈরি। ইলেকশনে মানুষের কোনও ভূমিকা নেই গাধাসোনা, ইটজ অল অ্যাবাউট ক্যাম্পেন। লাও, আর হাঁ করে থেকো না, এবার খোলো শ্যাম্পেন।

আ গেল যা, ট্যাক্সোটাকায় একশো মজা, তোর পাঁজর বেরনো দেহখানি কশকশ করে নিংড়ে পাঁচশো কোটি টঙ্কা দিয়ে ক্যামেরা ভাড়া কচ্চি ল্যামিনেশন ধচ্চি তো হয়েছে কী? দেশের ভোকাবুলারি পাল্টাতে কম খরচা? সদ্য প্রেমিক-প্রেমিকা চুমুর কোড-নেম দেয়। এবার বলবে, 'একটা ফিল-গুড হবে না কি?' উত্তম : এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে ফিল-গুড হত না কি বলো তো? সুচিত্রা : তুমিই ফিলো। এতবার নামকেত্তনে জিভ কামড়ে কামড়ে ফিল কলিন্স এফিডেফিটের জন্যে ধর্না দেবে। যত খাঁজ-খোঁচ এই সর্বপাপতাপহর টিপটপ মখমলে ঢেকে দেব।

বাগড়া? ধুর ধুর, পাবলিকের মেমোরি হচ্ছে কড়াইশুঁটি সাইজ। চাকরির জন্য বিহারি আর অসমিয়াদের মধ্যে খুনোখুনি হয়েছে, হ্যাঁ পড়পড় করে গাড়ি পুড়িয়েছি, মধ্যে বাই চান্স নিরীহ পাদরিও ছিল, ইতিহাস বইয়ে চ্যাপটার কে চ্যাপটার ছিঁড়ে বিচ্ছিরি হাতের লেখায় স্বরচিত গপ্‌পো ইনক্লুড। তো? এনি প্রবলেম? পৃথিবীর সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট বস্তু ইন্ডিয়া-পাকিস্তান সিরিজ 'টেন স্পোর্টস'কে চাঁটা মেরে তোর জন্য দূরদর্শনে ভাসিত করিনি? নিখরচায় আঁচাতে আঁচাতে লক্ষ্মণের সেঞ্চুরি দেখবে আর রাম ভজতে অ্যালার্জি? গাঁটের কড়ি খরচা করে তোকে বলছি ফিল গুড, এবার তুই কেন, তোর বাবা ভাল থাকবে। চোপ শালা! পইপই করে তখন থেকে বলছি না ভাল আছিস? দেব ত্রিশূল ফুটিয়ে? কিন্তু হা (হাসির আওয়াজ, আবার হাহাকারধ্বনিও)। প্রমাণ হল, বুমেরাং শুধু অস্ট্রেলিয়া না, এ মাটিতেও গজায়। প্রখর দারুণ অতি হাই-ভোল্টেজ সুয্যিমামু যখন 'ইন্ডিয়া শাইনিং'-এর একেবারে অন্য মানে ছড়াচ্ছেন খরখরিয়ে, একই সিনে স্বল্প বাঁ দিক ঘেঁষে ঘোর শ্বাস টানতে টানতে লীলা সটকাচ্ছেন এক সুদর্শন ভোম্বল, কপালে উল্কি-আঁকা নাম 'মিস্টার ফিল গুড', চন্দ্রবদনের পিছল ফেসিয়ালে গুঁড়ো চুন, ভুযো কালি।

ফিগু-বাবু জন্মেছিলেন বেশি দিন না, কিন্তু বেড়েছেন একেবারে চক্করবৃদ্ধি

হারে : সচ্ছল ফিগার, গাড়ল মগজ। রক্ত দেখলে ন্যাতা দিয়ে মুছে বলেন, 'পমেটম পড়েছিল'। দিব্যি চলছিল লঘু টুইস্ট, পায়ে নাইকি, হাতে নাই কী? বাহিরে কোঁচার পত্তনে ঠ্যাং জড়িয়ে এত দ্রুত যে পপাত চ পাঁকলিপ্ত হলেন, দোষ তাঁর নয়। যাঁরা বহু দাড়ি চুমরে চাঁদি চুলকে 'হাত ঘুরু ঘুরু ফিল গুড দেব' ফড়ফড়িয়ে ভেবেছেন স্রেফ শব্দব্রহ্মেই ফুটপাথে ব্যালকনি-ভ্রম লাগ লাগ, তাঁদের নিজস্ব মুদ্রাদোষে আজ বেচারি বিশ বাঁও ড্রেনে। খতিয়ে দেখুন, সোমত্ত আলুভাতেটি সহসা পিছনপানে কিক খেলেন কেন? আচমকা বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ভোটারে দেশ পিলপিল করছে এ ভাববার কারণ আছে? ধারাবাহিক ভাবে আমরা ভড়ং-এ ভুলি, মেলোড্রামা দেখে রোদনে ফুলি, জাত উসকে দিলেই দুচোখে ঠুলি। তবে? ভুল মুকুল তুলি এখন 'মিসটেক, মিসটেক' বলতে হচ্ছে ক্যান?

এট্টু তাকিয়ে দেখুন, আয়নার দিকেই সই, বুঝবেন মানুষ ভালও থাকে না, বাজেও থাকে না। সে স্রেফ থাকে। টিকে থাকে। সকালে উঠে দাঁত মাজে, রাতে জেলুসিল খেয়ে শুয়ে পড়ে। মরিনি, তাই বাদাম কিনলাম, এই গোছের। মাঝে মাঝে ব্যর্থ প্রেমের কথা ভেবে আবছা মনখারাপের ভান করে, সিরিয়াল শুরু হলে তাও থাকে না। আর গরিবদের তো ওসবের অবকাশ নেই। যে ইট ভাঙে সে খারাপ থাকবে কখন? সময়ই নেই। শুয়ে ভাবছে কী করে কাল একটু বেশি টাকা রোজগার করে বউকে কিছু দিয়ে বাকিটা ট্যাকে নিয়ে মদ খেতে যাবে। আর বড়লোকরা? ভাল থাকার টাইম পাবে! কী বলেন? মুনাফা কম শ্রমের ঘটনা? একে কনট্যাক্ট করো, ওকে ঠকাও, তাকে পথে আনো, বেচারারা মনের সুখে প্রাতঃকৃত্য অবধি করতে পারে না, মোবাইলে সাতটা ফোন এসে যায়। হ্যাঁ জানি জানি, দারিদ্র-দুঃখু-দুমপটাস নিয়ে দামড়া সরলীকরণ করতে নেই, সোজা বলতে চাইছি, আছে তো বাপ সবই, কিন্তু পদ্য লেখা টাইপ হাবিজাবি কাজ না থাকলে কেউ এসব নিয়ে খুঁচিয়ে ঘা করে না। আলাদা করে 'ফিল' করা সবাই ছেড়ে দিয়েছে। লম্বাটে, নির্বিকার অস্তিত্ব।

বাসে যেতে যেতে নেতাদের গাল দেয়, অফিসে বড়বাবুকে, কিন্তু ওই অবধি। মোটামুটি সকলে ভাবে, যের'ম চলছে, ওই গোছেরই চলবে। ন্যাজে আগুন না লাগলে কাউকে নড়ানো কঠিন। আলাদা করে 'আপনি কি আদৌ ভাল আছেন, ও দাদা' বোঝাতে বিরোধী পক্ষের ঘাম ছুটে যায়। আর বি জে পি এবার করল কী, দৌড়ে এসে কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিয়ে ফোন করে চিরকুট লিখে কোলেকাঁখে ঝাঁপিয়ে বলল, 'ভাল আছ, ভাল আছ, zনতি পারো না'। ব্যস,

ক্যাঁক করে লোক সচেতন হয়ে গেল, আরে, সত্যি ঘি দিয়ে ভাত খাচ্ছি কি? এট্টু ভেবে দেখি তো। আরে ভাইয়া ভাজপা, পাগলকে কেউ সাঁকো নাড়াতা হ্যায়?

পাগলা এবার দ্যাখে, হেঁটে কাঁটা ওপরে ছাঁটাই। ব্যস, কাঁটা লগা। পাছার কাপড় নেই কিন্তু সেলফোনে ফিলিম-ট্রেলর আছে। সে বেক্কাতালুতে পুঁটলির ওয়েট ফিরসে মালুম ও ব্যালেন্স করতঃ ভাবে, এরা খামখা আমার নামে মিছে বলল কেন? আর সব সয়ে গেছি, আমার ভাল থাকা তুলে কথা বলে কেমনে? সাঁকো নাড়িয়েই দেখি তবে। ব্যাকফায়ার বলে ব্যাকফায়ার, এখন অটলবাবুর ছবির তলায় সব্বাই লিখছে 'ফিলিং গুড?' ভোটের রেজাল্ট জেনে বুদ্ধবাবু আলিমুদ্দিনের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলছেন, 'আয়্যাম ফিলিং গুড'। হারলি তো হারলি, বিরোধীর হাতে মোক্ষম প্যারডি তুলে দিলি। মাঝখান থেকে দেশের সংখ্যালঘু, শিক্ষিত, অসাম্প্রদায়িক লোকগুলো এই গর্মির বাজারেও ফিলিং গুড।

ওই জন্যে নীতিকথা হল, নির্বাচনে জিততে গেলে কী করতে হয়? ভাল অ্যাড-এজেন্সি বাছতে হয়। দেশের ভাল করতে হবে না, সে বাড়াবাড়ি আশা হয়ে যাবে, মার্ডার সে তো চলবেই, ঘুষের সুটকেসও বিকোক, কিন্তু বস, পরের নির্বাচনে স্লোগানটা এট্টু সামলে। বরং নয়া নারা লাগান 'টেস্ট দ্য ঝান্ডা'। কিংবা বাজপেয়ীর (তখন) চুরাশি বছরের মুখখানি দিয়ে 'ইয়ে হি হ্যায় রাইট বয়েস বেবি'! আর যদি গরিবের সাজেশন কানে না ঢোকে, ফের এক গতে ফিলফিলানি শুরু করেন, টোটাল ঝাড়, জনগণ একেবারে ইতিহাসের গুমখানায় পাঠিয়ে দেবে, কণ্ঠে মেগানিনাদ : 'ফিল ইট, শাট ইট, ফরগেট ইট'!

১৬ মে, ২০০৪

ঠুলি মাথায় ভাবো জুতসই কোটেশন

উত্তমকুমার রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খেতে পারতেন না। গ্রেটা গার্বো মাজন কিনতে মুদির দোকানে যেতে ডরাতেন। হবেই, যে কোনও সেলিব্রিটিকেই খ্যাতির মূল্য দিতে হয়। ময়দানে বসে আনমনে ছোলা খেলাম আর ভেড়া গুনলাম, বৃষ্টিতে ছাতা-ছাড়া হেঁটে চুপ্পুড় ভিজে একগাল হাসি, এসব সাধারণভোগ্য অমৃত-আমোদের দরজা তাঁদের মুখের ওপর ঠাস করে বন্ধ। কিন্তু বাড়িতে তাঁরা কে হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে মুড়িলঙ্কা খাচ্ছেন কিংবা বাথরুমে অসিযুদ্ধ করছেন, কেউ দেখতে যায় না। মানে, যায়, কিন্তু পর্দাটর্দা ফেলে একটা ব্যক্তিগত জীবন যাপনের চেষ্টা করার অধিকার তাঁদের বিলক্ষণ আছে। অথচ শেষ ক'দিনের মেগাস্টার-স্টেটাস পাওয়া ধনঞ্জয়কে আমরা সেটুকুও দিলাম না। যে মুহূর্তে সে বুঝল, দুপুরে পোস্তর বড়া খেলে বিকেলে তা রেডিওয় খবর হয়ে যাচ্ছে, চিত হয়ে শুলে আলাদা প্যারাগ্রাফ, উপুড় হয়ে শুলে আলাদা, তখনই তার মধ্যে সেঁধিয়ে গেল এই সত্য, সেল-এ সে একা, ক্যামেরাও নেই, কেউ লুকিয়ে বসে নোট্‌সও নিচ্ছে না, কিন্তু আসলে সে হাজারটা সার্চলাইটের তলায় একেবারে হা-নগ্ন, তার প্রতিটি পেশির নড়াচড়া, আঙুল মটকানো থেকে নাক ঝাড়া, কালকে প্রথম পাতায় বেরোবে। বাসে লোকে ঝগড়া করবে তার রেডিও আছড়ে ফেলা নিয়ে, কিশোরকুমার আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের সিলেকশন নিয়ে। চরম স্টারদেরও যা হয় না, তার তা-ই হল। পায়চারি করছে আর ভাবছে, এই খবর হয়ে গেল, আড়মোড়া ভাঙছে, খবর, হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসছে আর, এই রে, কী লিখবে ওরা, 'বিষণ্ণ' না 'অনুতপ্ত'? পূর্ণিমা-র নাম ধরে ডাকবে? না, সে বোধহয় বড্ড বাংলা সিনেমা টাইপ। মরে যাবে সে, ভয়ে আকুল হয়ে মুচড়ে উঠছে পেট, কিন্তু না, এমন কিছু ঘটানো চলবে না, যাতে কাল 'ইমেজ' খারাপ হয়, গলার শির ফুলিয়ে খিস্তি করে ওঠা চলবে না, কাঁদতে কাঁদতে গরাদে মাথা ঠোকা চলবে না। নিজের মতো করে

হাঁউমাউয়ের মৌলিক অধিকার বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। কোনও খাঁচা তা করতে পারে না, কোনও অত্যাচারের যন্ত্র আমাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার, আর্তনাদ করার রিলিফটুকু থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। কিন্তু হায় মানুষ, জটিলতম জন্তু; হায় মিডিয়া, শকুনতম বস্তু। কোটি কোটি লোকের সামনে তো আর সিন ক্রিয়েট করা চলে না। ধনঞ্জয় বিনি শেকলের হাতকড়ায় বন্দি হয়ে গেল।

সত্যি বলতে কী, সে নিজেই নিজের ওপর নজর রাখতে শুরু করল, কী করছিস, অ্যাঁ, দেখিস ধনঞ্জয়, আমার নামটা ডোবাস না। উঁহু উঁহু, কাঁদে না বাবা, টিভি চ্যানেলরা দেখছে। মুখ শান্ত রাখ, অত বার বাথরুম যাস না। অর্থাৎ আমরা শুধু তাকে ফাঁসি দিলাম না, আগের দিনগুলোয় তাকে আতস কাচ বাগিয়ে শুইয়ে রাখলাম আমাদের ব্যবচ্ছেদ-টেবিলে। আর, নাগাড়ে পাহারায় রাখলাম স্বয়ং তাকেই। সে বুঝল, নিজের মতো নয়, নিজের গলা টিপে তাকে হতে হবে এমন এক ফাঁসির আসামির মতো, যার সম্পর্কে সবাই 'অ্যাঁ, এ যে অন্য রকম' বলে বিস্মিত হবে। এক 'ডিগনিফায়েড দণ্ডিত' হওয়ার স্ট্র্যাটেজি তাকে গ্রহণ করতে হল। ফাঁসির আসামির ভয়ে পায়খানা হয়ে যায়। শিল্পকে সে লাথি মারে। যে পৃথিবী তাকে গলায় দড়ি পাকিয়ে ঘাড় মটকে মারবে তার মুখে সে থুতু দেয়। ধনঞ্জয়কে কিন্তু ভজন শুনতে হল। রবীন্দ্রসঙ্গীত। হয়তো মনে হচ্ছে আছাড়িপিছাড়ি দিয়ে কাঁদি, পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে নখ দিয়ে করকর দেওয়াল আঁচড়াই, বলির জন্তুর মতো থরথর কাঁপতে কাঁপতে বমিতে মেঝে ভাসিয়ে মুখের রক্ত তুলে ক্ষমা চাই, কিন্তু তা হলে যে 'সাড়ে বারোটা : ধনঞ্জয় বমি করল। একটা: ক্ষমা চাইল। দুটো: আবার বমি'!

ভাবুন একদম শেষ রাতের কথা। আমাদের তো সত্যি বলতে কিচ্ছু এসে যায় না, তাতেই কেমন যেন লাগছে, মনে হচ্ছে, এই তো কয়েক ঘণ্টা আর। আর যার টুঁটি ছেঁড়া হবে, বেচারা লোকটার হাঁটু ভেঙে যাচ্ছে ভয়ে, মনে হচ্ছে বাপ-মা-ভাইয়ের নাম ধরে জোরে জোরে ডাকি, জামাকাপড় খুলে ফেলে ল্যাংটো হয়ে হাঁটু দুমড়ে একদম কোণায় গিয়ে নিজের আঙুলগুলো কামড়ে কামড়ে রক্ত বার করি, অন্তত চেঁচাই, সব হাল্লাক করে দিয়ে, গলা চিরে, জিভ ঝুলিয়ে, কষ দিয়ে থুতু গড়িয়ে, চিৎকার করি, মুখ দিয়ে যাতে নাড়িভুঁড়িগুলো বেরিয়ে আসে, সারা জেলখানাটা উত্তমখুত্তম হয়ে যায়, ওই চিৎকারের তোড় যাতে ঘড়ির কাঁটাটাকে দুমড়ে ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু করতে কী হল? ভাবতে হল জম্পেশ কোটেশন, 'পূর্ণিমার জীবন তো অমাবস্যা হয়ে গেল', কিশোরকুমারের জুতসই গান গাইতে গাইতে ফাঁসির মঞ্চের দিকে যেতে হল,

সকলকে বলতে হল 'ভাল থাকবেন', নাটা মল্লিক ক্ষমা চাইবার পর, মুখের ওপর যখন ঠুলির অন্ধকার, বলতে ইচ্ছে করছে 'ওরে হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চারা, আমাকে ছাড়, মারিস না, আমি আর করব না রে, আমাকে ছেড়ে দে, গলায় দড়ি দিস না', তখন, মরে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তেও, সে লাগামছাড়া অসভ্য হতে পারল না, সে তো জানে, কালকে হেডলাইন হবে, বলল, 'ভগবান আপনাদের সবাইকে ভাল রাখুন'। ফের কোটেশন। ফাঁসির মঞ্চে, মিডিয়ার চাপে, তাকে মৃত্যুমুহূর্ত অবধি 'পারফর্ম' করে যেতে হল। এত বড় অভিশাপ কোনও স্টারকে বহন করতে হয় না, কোনও মৃত্যুদণ্ডিতকে না। আমরা, মহান মিডিয়াসংকর জাতি, প্রায় মশা কামড়ালে চাপড় মারার সাবলীল অচেতনতায়, কাণ্ড সারলাম।

এ-ও প্রশ্ন, ধনঞ্জয় পোস্তবড়া খেল না লাউছেঁচকি, তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা কেন? উত্তর সোজা। আমরা আসলে পড়ছি, 'আর কয়েক ঘণ্টা পর পৃথিবী মুছে যাবে জেনেও, তার মুখ আর কখনও কোনও স্বাদ গ্রহণ করবে না জেনেও, এই জিভ, গলা, লালা, টাকরার আর কোনও মানে নেই জেনেও, সে। পোস্ত। খেল।' এই অনুপুঙ্খগুলি আমাদের কাছে আসছে তার মৃত্যুভয়ের পাঁচফোড়নে সাঁতলে। আমরা সেই দমবন্ধ হাঁ-করা ভয় দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে ডিটেলগুলো খাচ্ছি। একটা লোক দেখছে, তার সেল থেকে ওই য়োদ্দুর সরে গেল। ব্যস, আর কখনও সে রোদ্দুর দেখবে না। ঘটাং করে একটা তালার শব্দ। এ শব্দ আর শুনবে না। মুহূর্তগুলোকে খাবলে খাবলে হাঁকড়মাকড়ের এই মড়াকান্না-সময়ে সে কী করছে? কী খাচ্ছে? গলা দিয়ে নামছে? শুচ্ছে কেমন? হাঁটু মুড়ে, এইটুকু? নাক খুঁটছে? এইগুলো জানার মধ্যে যে গা-ছমছম ওরেবাবারে উপন্যাসটি আছে, তা আমাদের চোখগোল্লা আমোদ। হরর ফিল্ম যেমন। আর অবশ্যই, একটা লোকের তিলে তিলে মরে যাওয়া দেখার পেল্লায় আনন্দ। মৃত্যু নিংড়ে সপাটে সার্কাস। একটা লাইসেন্স-পাওয়া গণধোলাই। সকালে জগিং করতে গিয়ে চোরকে গাছের সঙ্গে বেঁধে মারতে মারতে মার্ডার করে আমাদের প্রবল তেষ্টা যদি বা মেটে, খুচখাচ গিল্ট পিছু নেয়। স্যান্ডউইচটা দুধ দিয়ে কোঁৎ করে নামাতে হয়। কিন্তু এই জিঘাংসাটা তো ছাপ্পা-পাওয়া, এ শালা নিশ্চিত ভিলেন, অতএব এর মরণটা চেটেপুটে খাওয়া যায় কোনও অপরাধবোধ ছাড়াই। বাসে অফিস-ফেরত: 'এফ এম শুনছে, জানেন তো', 'আজ গ্লুকোজ খেয়েছে, একদম ফিট', 'ছাড়ুন তো মশাই, কাল চারটে নাগাদ দাঁত খিঁচে ফিট হয়ে পড়ে যাবে, তখন আপনার ফিট বেরিয়ে যাবে, হ্যাহ্যা।'

কী মোচ্ছব, সিরিয়াল ছেড়ে, ক্লাবের ক্যারম ছেড়ে, রাতে বিছানানন্দ ছেড়ে বাঙালির শুধু এই এক চিন্তা। ফাঁসির আসামি কী খেল কখন শুল ক'বার ইয়ে করল।

আসলে আমাদের সমষ্টিগত ধর্ষকাম কড়ায়-গন্ডায় মেটানোর এমন সুযোগ জীবনে বেশিবার আসে না। আজেবাজে বকে তো লাভ নেই, আমরা সুযোগ পেলেই দাঙ্গায় হাত লাগাব, অমুক সম্প্রদায়কে শহর থেকে মেরে তাড়াব। গা সর্বক্ষণ বিষ ঝাড়তে কশকশ করছে। প্রত্যহ যে জানোয়ারগিরি করছি না, নেহাত নিজের আঁচ লেগে যাওয়ার ভয় আছে, তাই। ফাঁসি-হুজুগের মতো এমন নিরাপদ ও ন্যায়বিচারগন্ধী নীচতা কতটা স্বাস্থ্যকর বলুন তো? স্টেরয়েডের বাবা। উত্তেজনায় একেবারে সারা রাজ্যের চক্ষু ভাঁটা গাত্রে কাঁটা। রোজ রোজ তো ওয়ান-ডে হচ্ছে না, হলেও ফাইনালে ভারতের জিত নিশ্চিত নয়। তা হলে আমাদের রক্ত টগবগ ফুটবে কী নিয়ে? অনেকগুলো ঔচিত্যমথিত গোমড়া নাগরিকের বদলে রাষ্ট্র যদি ঝলমলে খুশিয়াল দাঁত-লকলকে নাগরিক পায়, উৎপাদন বেড়ে অ্যাক্কেরে আমেরিকা। অতএব রাষ্ট্রের দায়িত্ব, আমাদের এমন আনন্দ নিয়মিত জোগান দিয়ে যাওয়া। নেক্সট ধনঞ্জয়কে অপারেশন টেবিলে আনুন প্লিজ। ভোর সাড়ে চারটেয় তার চোঁয়া ঢেঁকুর দিয়ে আমাদের নীতি-ওথলানো দিন শুরু হোক।

১৭ অগস্ট, ২০০৪

কলকাতার রেনি ডে

সরকারের হেভি আনন্দ। কলকাতা নিখরচায় ভেনিস হয়ে গেল! সুভাষ চক্কোত্তি নির্ঘাত অচিরে ক'লক্ষ গন্ডোলা নামিয়ে দেবেন, যার ড্রাইভাররা সক্কলের সঙ্গে প্রচণ্ড খারাপ ব্যবহার করবে, খুচরো দেবে না, আর রিগিং-এ প্রাণপণ সাহায্য করবে। অবশ্য ভেনিস কেন, পুরী। দামড়া একখানি বাস গেলেই যা তিনতলা ঢেউ! পরনের খুশকি অবধি চুপ্পুড় ভিজে। মোবাইলবাজ যুবাযুবির এস্মার্টনেস পপাত চ। জলশক্তির ফোর্সড সাম্যবাদে সবাই ভেদাভেদ ভুলে স্লিপ খাচ্ছে। এমনিতেই কলকাতার রাস্তাঘাট এখন গ্র্যান্ড ক্যানিয়নকে নিলডাউন দেবে। যত্রতত্র পরকীয়ার লোভের মতো খোঁদল হাঁ করে আছে। আরও মুশকিল, পায়ে তো চোখ নেই। অন্ধ গোড়ালি হাঁটকে শক্ত অঙ্কের মতো আন্দাজ করতে করতে যাও, নঞর্থক হলেই হড়াস। পালে পালে লোক দুর্দশা দেখতে একগাল হাসি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এ পোজিশন নিচ্ছে ওভারব্রিজে, ও লো-অ্যাঙ্গলে। বাবুর টাইসুদ্ধু চোবানি দেখেও সুখ।

চাটুজ্জেরা গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট কিনেছেন কিন্তু সুইমিং পুল ফ্রি পাবেন বুঝতে পারেননি। এখন থালা-বাটি-গোপন প্রেমপত্র ঘরময় খলবল করে ভেসে বেড়াচ্ছে। বোসদের খুন্তি ভরচাজদের বাড়ি চলে গেছে, তাই নিয়ে পেল্লায় ঝগড়ার জন্য হাঁ করতেই, ও মা, ভরচাজকত্তা ফ্লোটিং তক্তপোশে বোসগিন্নির বেডরুমে যে! গুবলু মন দিয়ে জিওগ্রাফি বইয়ের পাতা ছিঁড়ে নৌকো বানাচ্ছিল, বড়দা এসে সাংঘাতিক বকাবকি করে গীতবিতান দিয়ে গেল। রাস্তায় একটা লোক রসিকতা চেঁচাতে চেঁচাতে যাচ্ছে, 'কী কাণ্ড বলুন তো! পকেটে পুঁটি ঢুকছে!' কে জানত অধিকতর শিব্রাম কাছেই মজুত, উত্তর এল, 'আর পার্সে ঢুকছে পারসে!'

ভি আই পি-র মধ্যিখানে গাছ পড়েছে। ব্যাটারা এমনিতে হেভি নিরীহ,

পড়া না পারা ছাত্রের মতো এক ঠ্যাঙে ঠায় খাড়া, সময় বুঝে লটকেছে ইচ্ছামৃত্যু। এবার লাও, ছ'মাইল জ্যাম। ক্রেন এসেছে গাছ তুলতে, সেই আজব বকযন্ত্র দেখতে যা চোখগোল্লা ভিড়, ক্রেনওলা ভাবছে টিকিট করবে। আর বাঙালি ব্যবসা জানে না! সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে নেমে গেছে পালে পালে ভ্যান, তক্তা, ঝুড়িওলা কুলি। কে উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্লাস্টিকের নীল গামলা চালিয়ে আনছে, দেখা গেল। আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকটা নৌকোর সিট নাগাড়ে ব্ল্যাক হচ্ছে, তবে দুরন্ত ভাটিয়ালি গাইলে রাইড ফ্রি।

দুশো বার প্রমাণ হচ্ছে, ঈশ্বর পুরুষতান্ত্রিক। একে তো রূপসীর লিপস্টিক ধুয়ে একসা, তার ওপর এমনিতে মিনিস্কার্ট পরার অধিকার স্রেফ মেয়েদের, এই সুযোগে হোলসেল পুরুষ সোল্লাসে থাই দেখিয়ে অফিস যাচ্ছেন। প্যান্ট গোটাতে গোটাতে এমন জায়গায় নিয়ে গেছেন, স্রেফ জাঙিয়াটুকু পরে এলেও ক্ষতি ছিল না। ধম্মোবাগীশের মন খুশ, অবলা জাতির তাবৎ ভাইটালস্ট্যাট আঁকবাঁকসহ ঝিকিয়ে ইল্লুস, কিন্তু অশালীনতা বলবে কার বাপ, জল ঢালছেন স্বয়ং ওপরওয়ালা!

সারা শহরের গোমড়াপনা আজ উধাও। **সব্বাই সক্কলের বন্ধু। অচেনা** লোককে হাত ধরতে অনুরোধ, সক্কলে মিলে একযোগে সরকারকে ঘাতক চার অক্ষর, মারুতি কিনলে যে সাবমেরিন হয়ে যাবে তার বিজ্ঞ কনফারেন্স; এক বৃদ্ধ খামখা নীল রেনকোট হাঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছেন কম্পাউন্ডের সামনে, আগুয়ানদের সাবধান করছেন, 'এখানটা নিচু আছে, দেখবেন!' বিনি-মাইনের কামারাদারির কাছে হেরে গর্তের মুখ এই এতটুকু। বাচ্চারা মনে হচ্ছে আর একটা পুজো ফাউ বাগিয়েছে! ছোট সাইজের পায়ে যতটা সম্ভব লাফাচ্ছে, দাপাচ্ছে, এর ওর গায়ে জল হাঁকড়াচ্ছে, ফ্রি সমুদ্র আচমকা সেল-এ পেয়ে গেছে তারা। অবশ্য গোমড়া-কাটিং মা'রা বকে ফাটিয়ে দিচ্ছেন, দু'চারটি থাবড়াও সবেগে। তখন আর কী, প্রিভিলেজ্‌ড গরিব বাচ্চাদের দিকে জুলজুল তাকাও আর গলাব্যথা করো, ইস, যদি অমন হতাম, ওদের মা-বাবা কেমন কিচ্ছু বলে না!

এর মধ্যে আবার প্যানিকমাস্টার জুটেছে এক। 'জলে জোঁক আছে, সাবধানে চলুন! আমার পায়ে তিনটে উঠেছিল!' ব্যস, সবাই সিনক্রোনাইজ্‌ড ছপছপ, তিন গজ যাও আর নিজ নিজ পা তুলে গলা বাড়িয়ে অবলোকন করো, এক ভদ্রলোক এমন বারকয়েক করে সাতিশয় মুগ্ধ: 'বাঃ, আমার পায়ের

পাতাটা বেড়ে ফর্সা হয়েছে তো! কী মিশেছে মহায় জলে, ডিটারজেন্ট পাউডার না কি?' মহায় মহা-খাপ্পা, আঙুল দেখালেন, 'অই দেখুন কী গুলেছে!' দুটি ছেলে গুটখা চিবিয়ে সবেগে থুতু ফেলছে, পাইকারি নাকঝাড়াঝাড়ি তো চলছেই, আর সেসব নোংরাদলা নেচে নেচে ভাসন্তি। আর আশ্চর্য, যত রাজ্যের ঘিনঘিনে থিকথিকে তরল আসছে যাচ্ছে অ্যাকিউরেট রামধনু রং ঝলকাতে ঝলকাতে! জলের কী মহিমা। না কি ওরাও বুঝেছে, শহরে পেল্লায় মজা নিয়ে আবির্ভূত এক রেনি-ডে!

৭৯ ডি-তে ঘোর অশান্তি। কলেজের ছেলে সেলফোনে বাসসুদ্ধু শুনিয়ে, 'হ্যাঁ রে গোপা, কলেজে পৌঁছচ্ছি। সুপার-ফাস্ট সাবমেরিনে যাচ্ছি।' মোচ্ছবের দিন, কে চিমটি কেটেছে, গোপা নয়, গোপিনী। কলেজ তো আজ আউট্রাম ঘাট, জলকেলির কেলাস! হাতাহাতি হয় আর কী! সে তুলনায় ২১৫-র অভ্যন্তর সতেরো গুণ আমোদের। হেদোর কাছে দুটো মাথার ডগায় লালবাত্তি-ওলা গাড়ি বনেট খুলে হাঁ। জ্যাম-থিতু বাসের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কোরাস, 'বোঝ ব্যাটা এবার, পাবলিকের কী হয় রোজ'। গাড়ির মধ্যে মন্ত্রী অবশ্য নেই, তাতে কী, মেকানিক আছে। ও-ই আর কী, প্রতীকী খিস্তি।

মেডিক্যাল কলেজের সামনে সত্যিই জলপুজো। কী নেই: ওয়াটারপোলো ম্যাচ, ওয়াটারব্যালে (কাঁটা লগা), সাঁতার-কেরদানি প্রদর্শন! বোয়ালের মতো ঘাই, শুশুকের মতো ফুর্তি, তিমির মতো মুখফোয়ারা। দুটো ছেলে আবার স্টান্ট লড়াচ্ছে, চলন্ত বাসের তলা দিয়ে সাঁতরে ওপারে গিয়ে ভুশ করে উজিয়ে উঠছে। কী হাততালি! ফুটপাথবাসী পরিবারের একটা বাচ্চা মার্ক স্পিৎজের মতোই দাবড়াচ্ছে, আর একটা খুব ছোট, হাত বাড়িয়ে আছে, হেসে খুন তার দাদু-বাবা-কাকা একটা করে কাগজের টুকরো, ছেঁড়া সুতো তাকে দিয়ে বলছে 'এই নাও জলের পোকা', 'এই নাও আর একটা জলের পোকা, হাহাহা'। বাচ্চাটা এত পোকা পেয়ে সৌভাগ্য কোথায় রাখবে বুঝতে পারছে না।

অফিসে এসে প্যান্টের ভাঁজ খুলতে খুলতেই উত্তেজিত কণ্ঠনালী। 'পঞ্চাননতলায় কেউ গাড়ির দরজা দিয়ে বেরোতে পারছে না জানেন, জানলা দিয়ে বেরোচ্ছে!' 'আরে কুমোরটুলিতে যে দু'ডজন দুগ্‌গা প্রিম্যাচিওর ভাসান হয়ে গেল, সে খবর রাখেন!' আজকে কাজ করলে তো ওভারটাইম পাওয়া উচিত। তাই তিনটেয় পৌঁছেই সাড়ে চারটেয় বেরিয়ে যাওয়ার তৈয়ারি।

মধ্যিখানটা গসিপ। যে বউরা আজকেও খিচুড়ি করে দেয়নি, তাদের নিন্দে করে পেত্নি ভাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একটু পরেই শুরু হয়ে গেল উদ্ভট গল্প বলার প্রতিযোগিতা। এ বলে শোভাবাজারে অক্টোপাস বেরিয়ে আটজনকে আট শুঁড়ে খাবলেছে, ও বলে কোলে মার্কেটে মাছ কিনলে দোকানি কানকো তুলে ঠিকানা বলে ছেড়ে দিচ্ছে, মক্কেল সোজা রান্নাঘরের কড়ায়! ফাটিয়ে দিলেন রতনদা। একগাল মিয়োনো মুড়ি রিল্যাক্স করে চিবোতে চিবোতে বললেন, 'গিন্নির গায়ে দেখে এলুম আঁশ বেরিয়েছে। আর ফিরছি না বাবা!'

১০ অক্টোবর, ২০০৪

পরের বিজয়া থেকে প্রণাম করব তোমায়

দশমীর দিন নাকি সকলের মা দুগ্‌গার কথা ভেবে কান্না পায়। আমার হাউহাউ কান্না পেত অ্যানুয়াল পরীক্ষার কথা ভেবে। ও বাবা গো কী হবে! ছুটিতে একটা বর্ণ পড়িনি। ভেকেশন টাস্ক এ-ই ডাঁই। শুধু অঙ্কই পাঁচশোটা। কী করে জমা দেব? নিজের মনকে চোখ ঠেরে যে পুজোর পর্দাটা টাঙানো ছিল, হট করে উঠে যেত। ঠিক যেমন ভাসানে যাওয়া দুর্গার হা-ন্যাড়া পেছন দিকটা দেখতে পেয়ে শক লাগে। তলপেট মুচড়ে উঠত। ব্যথা গিলতে গিলতে লাল কালির ডটপেন দিয়ে ১০৮ বার শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় লিখতাম। না, একবার লিখে ১০৭ বার ডিটো দিলে চলবে না, বাবা কান মুলে দিয়েছে। এরপর বাকি আছে গুরুজনদের ঠান্ডা ঠান্ডা পায়ে প্রণাম। তারপর হাবিজাবি মিষ্টি। একমাত্র ভুতুদিদের বাড়ি গেলে কুচো নিমকি পাওয়া যাবে। সঙ্গে মুড়ির মোয়া। ওদের বাড়ি বেড়াতে এসেছে শান্তনু। ক্লাস সিক্সে পড়ে, আমাদের সঙ্গে খ্যালে। সারা দিন গুলগল্প। আজ দুপুরে বলেছে ওর নাকি বিয়ে হয়ে গেছে। বউ ওদেরই গ্রামের মেয়ে। ও স্কুল পালিয়ে বাস কন্ডাক্টরি করে। বউকে খাওয়াতে হবে তো।

বাবা আমার সঙ্গে কোলাকুলি করল। গালে ফুটকি ফুটকি দাড়ি ঘষে দিল। কাতুকুতু লাগে, দারুণ। বোন আবার আমাকে প্রণাম করতে নারাজ। ঠিক করেই রেখেছিলাম, আশীর্বাদের বদলে ওকে এক গাঁট্টা কষাব। যা চ্যাঁ-ভ্যাঁ লাগাল! অসহ্য, এই মেয়েরা। মা যখন বাবাকে প্রণাম করে, আর বাবা মায়ের মাথায় হাত রাখে, এই সময় ওরা এমন একটা অদ্ভুত লজ্জা লজ্জা হাসে না, অপূর্ব লাগে। বিচ্ছিরি টিউবলাইটের আলোটা যেন এক ডোজ বেড়ে যায়। মনে হয়, বাব্বা, সারা বচ্ছর ঝগড়া করলে কী হবে, একটা মাধুর্য আছে, রিনরিন। দেখে খুব বিয়ে করতে শখ হত। আমার বউ বেশ আমাকে মুখ টিপে হেসে প্রণাম করবে। প্রায় পাঁচ মিনিট থাকত আমেজ। তার পরেই ফের ঝগড়া, ঘুগনিতে নুন বেশি হয়েছে।

একবার মাইমা নিয়ে গেল সিঁদুরখেলায়। সিঁড়ি দিয়ে স্টেজে ঠাকুরের অত কাছে গিয়ে আমি তো ধুকপুক। ঈশ্বর অনেক দূরের লোক না? ভয়ে ভয়ে দুর্গার পা ছুঁলাম। তারপর কাটা মোষ। ইঁদুর, পেঁচা। দেখি কেউ কিছু বলে না। সব বীভৎস করে সিঁদুর আর সন্দেশ লেপে মিষ্টি মুখটা নষ্ট করতে ব্যস্ত। সামনে পেয়ে অসুরের বুকে লাগালাম সপাটে এক ঘুঁষি। ও মা, আমার ওই প্যাংলা আস্ফালনেই ব্যাটার হাত থেকে খাঁড়া ঢন করে পড়ে গেল! ঘুঁষিপাকানো ফাঁকা মুঠোয় গুঁজে দেওয়ার যত চেষ্টা করি, কিছুতেই ফিট করে না। কী হবে! একে তো হাতের গাঁটে খুব লেগেছে, তার ওপর ভয়ে আধমরা। নিশ্চয়ই এমন পাপ দেবে, পরের জন্মে কেন্নো হব। মাইমা এসে খুব বকল, দু'বার করে প্রণাম করাল সবাইকে, বাহনদের, এমনকী অসুরকে। সিংহর একটা থাবা খুঁজে পেলাম না।

পুজো মানেই আমাদের বাড়িতে টুনি লাইটের মালা। রাত্তিরে ঘুম ভেঙে খড়খড়ি দিয়ে নারকোলগাছ দেখে একটুও ভয় করবে না। কঙ্কাটা আসতেই পারে না এত আলোয়। আজ থেকে ফের অন্ধকার। সিঁড়ির তলায় মুন্ডুহীন লম্বা-হাত ভূত শোধ নেবে। পুজোর ভোরগুলোয় আমি আর বোন দৌড়ে চলে যেতাম বারান্দায়। মোড়ের প্যান্ডেল থেকে গান ভেসে আসত, 'কার ঠাকুমা, কার ঠাকুমা'। আমরা হেসে খুন, হিহিহি, কী বলছে রে! তোর ঠাকুমা। না, তোর। বড় হয়ে জেনেছি 'ধন্নো কি আঁখো মে রাত কা সুর্মা, চাঁদ কা চুম্মা'। বিশ্বাস করিনি। দশমী মানে কাল থেকে আর সুদূর মাইকে কার ঠাকুমা নেই।

ভুতুদি-পতুদি ভীষণ ভাল, পতুদি বেশি। ওর বিয়ে হবে না, মা বলেছে। হার্টে ফুটো। আমাদের ডেকে নিয়ে গেল, তিলের নাড়ু বউনি করাবে। কচমচ খাচ্ছি, শান্তনুর মা-ও সামনে বসে, খুব রসিয়ে শুরু করলাম। জানো, আজ ও কী বলেছে পেছনের বারান্দায় গিয়ে? গল্পটা জমিয়ে রেখেছি বুঝে শান্তনুর মুখ আমসি হয়ে গেল। ওর মা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সে কী মার! বাটি থেকে নিমকি ছিটকে ঘরময়। চশমা উড়ে গেল। করো কী করো কী, ভুতুদির মা বুক দিয়ে সামলালেন। 'আজকের দিনে কেউ এভাবে...!' খুব তৃপ্তি পেয়েছিলাম, মনে আছে। গাল ফুলিয়ে সততার কুসুম-কুসুম আরাম উপভোগ করেছিলাম।

ক্রমে বিজয়ার আসল মজা নজরে এল। লরির সামনে পেছন দুলিয়ে নাচ, সিটি, বারান্দায় ঝুঁকে থাকা মেয়েদের চোখ মারা। লোফার হওয়ার লাইসেন্স। আমি চিরকালের ক্যাবলা, এসব পারতাম না। আড়ষ্ট একটেরে দাঁড়িয়ে,

ফুর্তিকে ঘেন্না করতাম। টিটকিরি বাঁধা। বান্ধবীর বাড়ি গেছি, তার বাবা-মা প্রণাম এক্সপেক্ট করে করে হদ্দ। কিন্তু সবে আঁতেল হয়েছি, প্রণামে বিশ্বাস করি না। প্রেমেও এদিকে বুক ফাটছে। আজকাল সুবিধে, চুপচাপ থাকি, লোকে ভাবে গভীর কিছু ভাবছে। প্যাঁক দেয় না। প্রত্যেক বিজয়ায় বন্ধুদের জমায়েত। আমি একই রসিকতা করি, 'ছেলেদের সঙ্গে তো কোলাকুলি হল, এবার মেয়েদের সঙ্গে হবে না?' সবাই খিলখিল। কিন্তু ওই অবধিই। সেই দশমীর অপেক্ষায় আছি, যেদিন সন্ধ্যা রায়ের মতো দেখতে একটি মেয়ে এসে বলবে, আমি রাজি। কোলাকুলি করো, পরের বিজয়া থেকে আমি প্রণাম করব তোমায়। লজ্জায় মরতে মরতে।

২৩ অক্টোবর, ২০০৪

অঃ

সত্যি, কী উর্বর জমানা! যেখানে দেখিছে ছাই, ছুটে যাচ্ছে ক্যাপিটাল। যার ও-পিঠ মিডিয়া। রাম সাহিত্যে সবেগে স্ল্যাং ঢুকিয়ে দিয়েছে, শ্যাম নাটকে বিলিয়েছে বিক্ষুব্ধ সিপিএম, যদু সিনেমায় অ্যায়সান বোর করেছে যে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড, মধু ভোরবেলা খেয়ে অনশনে বসেছে ক্ষমতার বিরুদ্ধে। মালিনীকে এসব কিছুই করতে হয়নি, সে সেক্সি, অতএব প্রতিবন্ধী শিশুদের সঙ্গে সোমবার আর বাংলা ব্যান্ডের সঙ্গে মঙ্গলবার ছবি তুললেই খ্যাতি আপসে আসবে, শুধু আঁচলটি জরা স্খলিত রেখো বেবি। চলো এদের বড় বড় মুন্ডু ছাপো, কোটেশন দাও যেন বেদের শ্লোক, পেজ থ্রি-তে পার্টিনেত্য ক্লোজ আপ নাও। কাজকম্ম কিস্যু নয়, মার্কেটিং হল আসল। দ্রিমিকি দ্রিমিকি গিমিক-ই বাজছে, যদি 'তিন' পারো, গ্লো-সাইনে ফলাব 'তিনশো'। অতএব আগাছা হাঁটকে চাট্টি ডাঁশা দেখে মিডিওকার খুঁটে, সাপ্টে পমেটম মাখিয়ে, পুরস্কার-হুল্লোড়-সেমিনার-চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী উদ্বোধন, পরিত্রাহি ঢক্কা। হা, কিছুতেই কিছু না। সাধ করে কেনা তুবড়ির মতো, প্রথমটা খানিক তেড়েফুঁড়ে হুশহুশিয়ে উঠলেও, অচিরে সেই ন্যাতানো ফুস। কাছে যাসনি, বার্স্ট করবে।

তাই ফিরিঙ্গি গোয়েন্দা লাগালেও নয়া বাঙালি 'ম্যান অব দ্য ইয়ার' (উওম্যান-ও চলবে) খুঁজে বার করা না-মুমকিন। বাঁধা আইকনদের বাঁধানো দাঁতের আলো ছিঁড়ে মাথা তুলতে দরকার তো দুটি অস্ত্র, প্রতিভা আর সাধনা। প্রথমটি থাকলে আছে নইলে নেই, আর দ্বিতীয়টি? রবীন্দ্রনাথ সাংঘাতিক নাম করেছেন জীবনানন্দ করেননি, কিন্তু নিজ শিল্পকে স্বর্গীয় উচ্চতায় নিয়ে যেতে দুজনেই দিনমজুরের অধিক খেটেছেন। নিজের পিছনে পুলিশ না লাগালে, স্তাবকদের এন্তার লেহন অগ্রাহ্য করে খসড়ার পর খসড়ায় কেটে কেটে পাণ্ডুলিপি রক্তাক্ত না করলে, সেই কলার-তোলা আত্মশক্তি আসে না, যাকে লোকে এক দিন না এক দিন প্রণতি জানিয়ে ঋণী হবে। অমর্ত্য সেন কলেজ

জীবন থেকে ঘাতক ব্যাধির সঙ্গে লড়ে পড়াশোনা করেছেন, উত্তমকুমার স্টুডিওয় লোডশেডিং হওয়ার পর একা অসহ্য গরমে বসে বসে গান প্র্যাকটিস করেছেন যাতে কালকে 'লিপ' নিখুঁত হয় (অন্যরা বাইরে বসে আড্ডা মারছিল), সত্যজিৎ 'পথের পাঁচালী' এডিট চলার সময় টানা দশ দিন ঘুমোননি। আর আমাদের এখনকার হাতে-গরম ফল-চাওয়া হ্যাহ্যাল্যাল্যা-র দল? নাট্যকার নাটক লেখা শেষ না হতেই ফোন করে, যদি জনপ্রিয় দৈনিকের চারের পাতায় অমুক কত্তাবাবা প্রবন্ধ লিখে দেন প্রথম শো-র পরেই, কবি অবিকল দাদাকবির নকল করে কাব্যিখসড়া তাঁকেই পড়তে দেয় যাতে বইটা বেরিয়ে যায় এই বইমেলাতেই, রাজনীতিক ডানেবাঁয়ে মস্তান পোষে আর বলে আমার ভয়ে সবাই স্বতঃস্ফূর্ত, নায়িকা ভাবে তার হয়ে তার টাইট টি-শার্ট অভিনয় করে দেবে, খেলোয়াড় বিজ্ঞাপনের ক্লোজ দিতে বত্রিশ পাটি বের করে কিন্তু ইনিংসে একত্রিশ পেরোয় না। আর সব্বাই, সব্বাই, চেষ্টা করে যাতে স্রেফ 'দুপয়সার সিদ্ধাই'য়ের ঝোলটুকু সাঁৎ কোলে টেনে লেপের তলায় সেঁধানো যায়, তুমি উত্তম তাই বলিয়া আমি অধম হইব না কেন, বিশেষত যদি তাতে অনেক দ্রুত ধমাধম ধমাকা বিরাজে? পপুলিস্ট যুগ নিজেই নিজের মাথায় মুষল মেরেছে। ফাঁকিবাজির জয়পতাকা বাঘের বাচ্চাকেও হেলেদুলে স্টেজে মেরে দেওয়ার মন্তর জোগায়, সাধনা থাকলে যে ওই বাড়ি-গাড়িই আখেরে দশগুণ হত, সেটা অবধি বুঝতে দেয় না। আর একটা জিনিস তো বাংলাকে কুরে ঘুরে জুড়ে খাচ্ছে নাছোড় ভাইরাসের প্রায়: স্পর্ধাহীনতা। দাদুর ঘুম না ভাঙে এমন টিপিটিপি হেঁটে, যা চলেছে, যা নিরাপদ, তা-ই বজায় রেখে তুতিয়ে-পাতিয়ে হোম-লোনে ভিড়ে যাওয়ার প্রবণতা, স্থিতাবস্থা একটুও না মুচড়ে, এমন মহাপুরুষ তৈরি হওয়া, যার শিং নেই নোখ নেই, পাঁচিল ভাঙার রোখ নেই।

কেন আমাদের এ স্থবিরতাবিলাস? কেন হাজামজা পুকুরে মিনি-পাটকেল ছুড়তেও অনীহা, যখন দরকার প্রমাণ সাইজের 'সুনামি'? কেন এক সময় কবি বলেছিলেন 'পুলিশ, কবিকে দেখে টুপিটা তুই খুলিস' আর এখন কবিরা পুলিশমন্ত্রীর পেছনে সেমিসার্কল রচে এ ওর পায়ে হোঁচট খেতে খেতে গলে পড়েন (আর যাঁরা তা পারলেন না, হিংসে টাকনা দিয়ে সান্ধ্য মদের আড্ডায় খেউড়ের জলসা বসান)? উত্তর মাই ফ্রেন্ড, সর্বক্ষণই চারপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। আমাশাঋদ্ধ শরীরে যেমন মাটন কষা সহ্য হয় না, এ ন্যাতরপ্যাতর সমাজে জন্মে কালাপাহাড়ের কলজে ধারণ অসম্ভব। এখানে ব্যাপ্ত রয়েছে পৃথিবীর সর্বাধিক বিষাক্ত আবহ: নির্বিকারতা। ইনডিফারেন্স। এর চেয়ে শত্রুতা

ভাল, টিটকিরি, সমালোচনা, বিক্ষোভ, মায় পিটুনি ভাল। প্রতিরোধ সামাল দেওয়া যায়, এই সুমহান নির্বেদের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে মরা সয় না। আগে কিন্তু রামমোহনকে থান ইট ছুঁড়ে মারা হয়েছে, ডিরোজিও যাতে না খেয়ে মরেন তার ব্যবস্থা হয়েছে, বিদ্যাসাগরের নামে কুৎসিত গান বাঁধা হয়েছে। অন্যও: সাহিত্যে অশ্লীলতা নিয়ে 'কল্লোল' গোষ্ঠী আর সুরেশ সমাজপতির তুলকালাম, 'চারুলতা' নিয়ে সত্যজিৎ-অশোক রুদ্রের গনগনে চিঠি-চালাচালি, ধুন্ধুমার! এখন? শুনছেন, ওই নাটকে ফি সংলাপে গালাগাল। অঃ, তাই বুঝি। অমুক গ্র্যামি পেয়েছে। অঃ। ওই লোকটা গানে আদিম চিৎকার পাগলের ফিসফিস ঢুকিয়েছে। অঃ। পলিউশন হু-হু বাড়ছে জেনেও মন্ত্রীবাবু ভোটব্যাঙ্ক আগলে চুপ, আপনার বাচ্চা জন্মেই হাঁপানিতে নীল। অঃ। জগিং-এর মোরামপথ গড়তে লাখ হদ্দ গরিবের ঝুপড়ি বুলডোজারে গুঁড়িয়ে পিষে ধুলো। অঃ। বাড়িতে লেনিনের বই পাওয়া গেছে বলে বামফ্রন্টের পুলিশ থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে পেটাচ্ছে। অঃ। বোম পড়ছে, রোম পুড়ছে, যম আসছে। অঃ। অঃ। অঃ। ই কী রে! এ তো দ্রিঘাংচুর কাকের বাড়া হইল। কিছু তো একটা রি-অ্যাকশন দিবি বাপ! একবার তো মুঠি শক্ত বা ঝুঁটি উত্তাল হবে!

এই বেধড়ক অশিক্ষিত ধান্দাবাজ অ-মেরুদণ্ডী জনপিণ্ড কখনও শেকলভাঙা আইকন বিয়োতে পারে? বরং বড় গ্রহ যেমন ছোট গ্রহকে টানে, তেমনি এই মূর্খ, স্রোতে ভিড়ে যাওয়া গা-বাঁচানো পাবলিকের বৃত্ত অন্যের আলাদা হওয়ার প্রবণতাকে নিঃশেষে শুষে নেয়, চট করে টুঁটি টিপে মারে। পিপ্‌ল গেট দ্য আইকন দে ডিজার্ভ। ইয়াং বেঙ্গল দেখছে গবাদি জনগণ শুধু ন্যাকা গ্যাদগ্যাদে সিরিয়াল আর গিনিপিগ-পিলপিল টেলিছবির আফিং-গোল্লা চুষে ঝিম। গো-হাড় ছুড়ে মারলেও সমাজ বোনলেস, ইউরেকা চেঁচিয়ে রাস্তায় ন্যাংটো ছুটলেও সবাই নির্বিকার অফিসমুখো। অগত্যা কী আর করা, চলো শপার্স স্টপে পপকর্ন খাই।

তাই আমাদের বামন নিয়েই চলতে হবে। অবতার বলে যাকে মাথায় তুলে নাচছ, বস্তুত সে সার্কাসের ভাঁড়। গোদা স্ল্যাপস্টিক চমৎকার, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। এ বছর তাই আমাদের ম্যান অব দ্য ইয়ার একটি ফাঁপা অবয়ব, উদাসীন চিমড়ে বাঙালির নায়ক। সামনের বছর ব্যাজার বঙ্গযাপনে এই চিহ্নেই ভোট দিন, হে সুপার-কোষ্ঠকঠিন!

৩১ ডিসেম্বর, ২০০৪

এ কী দ্বিলেমা

উরিম্মা, কী টনটনে টানা, কী প্রাণপণ পোড়েন! কোন দিকে যাব, কী মর্মে গলার শির ফুলিয়ে চিল্লাব, টিভি-তে চোখ রেখে হৃৎপিণ্ডটিকে হর সাইজ পিস পিস করে কি বেঁটে দিব প্রদেশে ও দেশে? এমন হয়। যে বউকে দেখলেই একগাল হাসি প্র্যাকটিস ছিল চিত্তময়, ডিভোর্সের পর তার মুখচিত্র দেখলেই যে ঘেন্না-মরোমরো হতে হবে, প্রায়ই গুলিয়ে যায়। পেত্থমে একটি পিয়ানোর মতো চওড়া হাসি, তার পরেই সাঁৎ মনে পড়ে গিয়ে মুখ সবেগে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরন। লাও ঠেলা, এখন আমি কোন দলে যেন? জিকোর কোচিং-এ জাপান টিম যখন ব্রাজিলের গোলে বল ঢুকিয়ে দেয়, তাঁর মুষ্টি স্বতঃই উত্তোলিত? না কি মাথায় হাত দিতে গিয়েই আচমকা মনে পড়ে, অ, আমি তো জিতছি! মুহুর্মুহু বেসিক প্রশ্ন এ মনুষ্যজীবনে: এই রে, মম জার্সি কোনটি? অতএব এসব ক্ষেত্রে ইংরেজি-বাংলা পাঞ্চ করে এটুকু আর্তি ভাল: এ কী দ্বিলেমা, কেন দিলে মা?

অ্যাদ্দিন অমুক সম্প্রদায়ের নামে যাচ্ছেতাই বলার জন্য ব্যবহৃত মোক্ষমতম অস্ত্র: জানেন, ওরা ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের ম্যাচের সময় পাকিস্তানকে সাপোর্ট করে? এমনই দেশদ্রোহী? (যেন খেলায় মানুষের যে কোনও দলকে সমর্থনের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া যায়!) আর এই গোটা হপ্তাটা দুটো ওয়ান-ডে জুড়ে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে বাঙালি কী চাইলেন? যেন ইন্ডিয়া টিম, নিজ ডিমের চেয়েও যে প্রিয়তর, শ্মশানে গিয়েও লাগাতার যার কুশলপ্রশ্ন চালিয়ে যেতে হয়, সেই মিষ্টুসোনা যেন, মুখ থুবড়ে, নিতম্ব তুলে, নাক ঘষটে, হাত-পা ছেতরে একেবারে পপাত চ হয়। স্লিপ ডিস্ক হলেও ক্ষতি নেই। কেন? অ্যাদ্দিন সচিনকে মারতে দেখলেই পুলকে হৃদয়ে রিংটোন, এখনও তাই। কিন্তু চকিতে অ্যালার্ম ক্রিংক্রিং, এই রে, সচিন এরকম খেললে তো হেভি জিতে যাওয়ার সম্ভাবনা। আর দ্রাবিড় পেটালে? সাড়ে-সাংঘাতিক! ক্যাপ্টেন হিসেবে না টিকে যায়। ওরে তুই ঠুকঠুকমাস্টার আবার কবে ওয়ান-ডে শিখলি রে, বাড়ি যা।

পাঠান-এর দুদ্দাড় স্লগামি দেখে রিফ্লেক্সে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছি, হেনকালে কটাস কামড়, ওঃহো, আজ তো আমি এদের গোহার চাইছি। ভুলে মেরেছি, দেখেছ? কী বেদনা! কী ভয়ানক আয়না-সংকট! আমি তবে কে?

উত্তম-সুচিত্রার লাস্ট সিনে অল্প হেঁটে স্বল্প ছুটে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াজড়ির পর বাঙালির সেরা নয়নসুখকর দৃশ্যটি কী? অবশ্যই এক বেহালানন্দনের স্টেপ আউট করে অমন শক্ত ডিউস বলটিকে সোওজা গ্যালারিতে ফেলন। তো তাকে বাদ দিবি অকৃতজ্ঞর দল, বাঙালির বেঁচে থাকার মানেটাকেই শিনবোনে এক লাথ মেরে পঙ্গু করে দিবি, আর তোদের ভাল চাইব? কোন প্রাণে টিভি খুলব আর? কে সেঞ্চুরি করলে মনে হবে বাড়িওয়ালাকে শুধোই কেমন আছেন? হ্যাঁ, যদ্দিন ছিল না ছিল না, সচিনকে ভালবেসেছি ছেলের মতো, জাডেজাকে ভাইপোর মতো, এমনকী সিধুকে সরলসোজা ধাঁইকিড়িকিড়ির জন্য হৃদয় দিয়েছি, কিন্তু বাপ, সব ওই প্রাক-লর্ডস যুগে। যবে থেকে আমাদের ছেলেটা ওই জঙ্গলের মধ্যে ডোরাকাটা রাজার মতো হাঁটা দিয়েছে, আর কারওর দিকে চোখ যায় না, মাইরি বলছি। প্রেমে পড়লে যেমন বাপ-মা মায় শ্বশুর থেকে আয়ান ঘোষ অবধি সব আউট অব ফোকাস, তেমনিই। ওই রূপ, ওই কলারতোলা তাকানি, অফের দিকে ওই পুরো মাখ্খন চৌকা, লেগের দিকেও এক-আধ বার চেষ্টা করা আড়ষ্ট পুল, আহা, যেন খুদের মুখে আধো-আধো আবৃত্তি। ভাই খেলাফেলা বুঝি না, এক একটা চার মারে, যেন ছেলের ফেল করার দুঃখু ভুলিয়ে দেয়। ছয় মারে, যেন পাড়ার মস্তানটার টোন কাটা মুখের ওপর একটা বিরাশি সিক্কা পড়ল। রেস্ট অব ইন্ডিয়ার বচ্চন আছে থাক, আমাদের শাহেনশা এই এক জনই।

ওরে গাড়ল, ছেলেটা যত বার নামে শুধু কি ও একা ব্যাট করে ভেবেছিস? একটা গোটা জাতের, একটা ফতুর, অপমানিত, আত্মবিশ্বাসহীন জাতের সবটুকু কলজে, সত্তা-নিংড়নো ছানা ওর সঙ্গে পিচে নামে রে। সাহেবরা ওর প্রশংসা করলে আমরা নিজেদের পিঠ চাপড়ে তুড়ুক লাফ দিই। ওর ক্র্যাম্প ধরলে আমরা সবাই কোরাসে উফ্ বলে ককিয়ে উঠি। আমাদের কী আছে বল? কিছু থুতু-গড়ানো রাস্তা, কিছু পাজির পা-ঝাড়া রাজনীতিবিদ, কিছু লবিবাজ কবি। হ্যাঁ, অমর্ত্য সেন নিয়ে নাচানাচি করেছি, কিন্তু ফ্র্যাংকলি, ওঁর কাণ্ডাকাণ্ড টোটাল মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ভারতের কাছে আমরা তো ল্যাদাড়ুস জাত। বন্ধ করে, আর পাশবালিশ জড়ায়। নর্দমায় গড়ানো মাতালের মতো, আমরাও নিজেদের গালাগাল ছাড়া

আর কিছুরই যোগ্য ভাবি না। বাসে উঠে কন্ডাক্টরের কৃপাপ্রত্যাশী হতগরিব বুড়োর মতো আমরা কেবলই ভেবলে গিয়ে হাসি। যদি কেউ ছুড়ে দেয় টুকরো রুটি। যদি কেউ ইন্টারভিউয়ে এক লাইন কলকাতার প্রশংসা করে। একজনই তো এসব ভিখিরিপনা ছিঁড়েখুঁড়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একজনই তো সারা দেশকে বাধ্য করেছিল শোর মচাতে। ওঃ, সেই টনটন না কোথায় ছক্কা হাঁকাচ্ছে আর গোটা ভারত গর্জে লাফিয়ে উঠছে—আমাদের জীবদ্দশায় নিজের জাতের জন্য এমন গব্ব-টনটন করে উঠেছে ক'বার, এই চড়াইমার্কা বুক?

বাঙালির ছেলে হয়ে ওই চলন? ওই উদ্ধত ময়ূরের মতো ঘাড় ঘোরানো? কাউকে তোয়াক্কা নেই! স্টিভ ওয় যে স্টিভ ওয়, থাক ব্যাটা পাঁচ মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে। গেলে, টস করবি। যে বাঙালি বাড়িতে কুটুম বেল দিলেই তড়িঘড়ি পাঁজরা ঢাকতে বেনিয়ান নামায়, সে জাতের হয়ে কিনা লর্ডসে খালি-গা দেখিয়ে জামা বনবন ঘুরিয়ে দিলে? কোত্থেকে এলি বাপ, আমাদের সবার মেরুদণ্ডহীনতা যেন একলা ঘুচিয়ে দেওয়ার দায় নিলি চওড়া কাঁধে। আমরা ধুলো চাটি, কত্তাবাবুর পা। আর তুই গাওস্করের চোখে চোখ রেখে কথা বলিস? বয়কট তোকে প্রিন্স অব কালকুট্টা বলে হ্যান্ডশেক করে যায়? আবিশ্ব হইহই ঘটে তোর স্পিরিট নিয়ে, সাহস নিয়ে, অন্যকে অনুপ্রাণিত করার প্রতিভা নিয়ে?

সেই ছেলে বাদ মানে তো সে বাদ নয় বাপ! আমরা বাদ। আমরা বাঙালি। বাস করি এই তীর্থে বরদ বঙ্গে। জাগি ও ঘুমোই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আর কবে নেক্সট সূর্যোদয় হবে, আদৌ হবে কি না, জানি না। শুনেছি ছিলেন এক রবীন্দ্রনাথ, তাপ্পর সত্যজিৎ। তা তাঁরা সব পুরাণের লোক। জিতা-জাগতা সভ্যতায় একজনই শের। সে সৌর(ভ)জগৎ বিহনে থাকি কেমনে? সৌরভ ছাড়া ভারতে কী বা কাম? সকল সম্পদ মম গঙ্গোপাধ্যায়াম। ভারত যদি তাকে বাদ দিয়ে ভারত হয়, আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। যে ছেলেটা কোলেকাঁখে দলটাকে এত বড় করল, তাকে ছেঁটে ফেলে আজ অস্ট্রেলিয়ান জাদুগরি চাখা হচ্ছে। মর অকৃতজ্ঞ পোড়ারমুখোর দল। হ্যাঁ জানি জানি, গূঢ় কোশ্চেন ধাইছে শনোশনো। তবে কি আমরা আগে বাঙালি, পরে ভারতীয়? শুধু বাঙালি, নো ভারতীয়? যা করছি, তা কি দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা? না কি নিজ গোষ্ঠীর প্রতি সুপার-আনুগত্যের প্রদর্শন? দেশপ্রেম কি প্রাদেশিকতারই সম্প্রসারিত

প্রোজেকশন? না কি একটা নেই-বস্তু, যার অনস্তিত্বের আঁশটে সত্যিকে জাতীয় পতাকা দিয়ে কোনওক্রমে ঢেকে রাখা হয়েছে?

জানি না অতশত। 'ভারত ভার্সাস বাংলা' এই ম্যাচে আমি কোন দিকে, পষ্ট জানি। দেশপ্রেম বলে আদৌ কিছু হয় কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ও ড্রাম আমরাও বাজিয়েছি, প্যারেড ভি, অঙ্ক খাতার পাতা ছিঁড়ে কত্ত ফ্ল্যাগ বানালাম ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ডাঁটো রচনাবই আর ফনফনে অপরাধবোধ ছুড়ে ফেলে সত্যি কথা চাও বাপা? নিজেকে ছাড়া ভালবাসি আমার ফ্যামিলিকে, আপিসের দোতলার ওই সুন্দুরী মেয়েটা লিফ্‌টে একসঙ্গে উঠলে মনে হয় এর জন্য প্রাণ দিতে পারি, আর দু-একটা বন্ধুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে রোববারের আড্ডায়। আর উত্তম, আর সৌরভ। ব্যস। সত্যি সত্যি আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী মানুষের জন্য প্রাণ কেঁদেককিয়ে চুপ্পুড়, এ জনমে হবে? একজন দক্ষিণ ভারতীয়র সঙ্গে আমার আসলে সম্পর্কটা কী? একজন গুয়াতেমালা-র নাগরিকের সঙ্গে যা, তা-ই তো? ন্যাকামি করে লাভ নেই। প্রাদেশিক বলো, আরও শক্ত বাংলা বলো। কেয়ার করি না। ভালবাসি স্রেফ এঁটুলির ন্যায় সংলগ্ন চারপাশটুকুকে। আমরা বলি, 'ওই শালারা এসে পঃবঙ্গটাকে একেবারে নষ্ট করে দিল।' আবার 'দেকেচো, বাঙালি হয়ে আমেরিকায় গিয়ে নিজের সাতমহলা অফিস গড়েচে!' এটুকুই।

স্ববিরোধওলা এই আবেগ, এ-ই আছে। বাকিটা খবরকাগজের এডিটোরিয়ালের জন্য তোলা থাক। সাধুভাষায় ঘনঘোর বুকনি। আমরা এরকম। সৌরভকে বাদ দিলে আর খেলা দেখার মানে হয় না। ওকে নাও, ইন্ডিয়ার রঙে এঁকেজুকে মুখময় উল্কি বাগাচ্ছি। ও বাদ, শ্রীলঙ্কা জেত তো বাবা। চলো বাঘের পো বাঙালিবাচ্চা, পাড়ায় পাড়ায় সাজাও জয়সূর্য-র পোস্টার!

৩০ অক্টোবর, ২০০৫

চলো ছোবল শানাই

ব্যাপারটা তো মেডিক্যাল। সঙ্কলের বুকের মধ্যে একটা বিষের থলে আছে। বেশ বড় সাইজ। ইদানীং, হ্যাঁ, এক্স এক্স এল তো বটেই। পয়জনও উথলে পড়ছে। গরম, ঝাল, তিতকুটে ঘেন্না। দলা দলা পিত্তি। থকথকে। ফুটছে। গ্লবগ্লব করে ভুড়ভুড়ি কাটছে, বাষ্প উঠছে, সবজে ধোঁয়া দাউদাউ। মুশকিল হল, এই গরল কোঁত পেড়ে বের করে না দিতে পারলে, নিয়মিত টিপেটুপে গেলে না দিতে পারলে, ছোবল মারবে তোমাকেই। তখন বিষাক্ত জ্বলুনিতে গা ফুটিফাটা, দাগড়া দাগড়া বিরক্তির জড়ুল গজিয়ে ত্বক বীভৎস। তাই ভলকে ভলকে উগরে দেওয়ার একটা জায়গা দরকার। একটা ছুতো। নইলে, কাউকে কামড়াতে না পারা নির্জন কেউটের মতো, যন্ত্রণায় মাটিতে ফণা আছড়াতে আছড়াতে থেঁতলে যেতে হবে। ফ্যাৎ করে ফেটে যাবে মুখ।

মুশকিল, জিন্দেগি অতি নিরামিষ, পানসে। গণধোলাই দূরস্থান, অন্তত নিজ বউকে ফি রাত চুলের গোড়া ধরে ধামসে পেটাব, শালার মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের জাঁতায় পড়ে তা-ও হয়ে ওঠে না। আর বউ হতভাগাগুলোকে তো বাচ্চা পিটিয়েই ক্ষান্ত থাকতে হয়, স্বামীকে বেশ ঠাটিয়ে চড়াবে, লাইসেন্সও নেই, খ্যামতাও কম। ওঃ, অন্তত একটা করে যুদ্ধ প্রতি প্রজন্মের পাওয়া উচিত। ওই ক'দিন দেশপ্রেমের মুখোশে কেমন ন্যাংটো ঘেন্নাটাকে প্রকাশ্যে প্যারেড করানো যায়। যত মারব, যত লাথাব, তত মেডেল, হুররে। সে শালার গ্লোরিয়াস দিন তো গেছেই, এখন ওয়ান-ডেও পচতে চলল। 'ওয়ার্ল্ড কাপ চাই না বস, জাস্ট পাকিস্তানকে কচলে দাও' গলা ফাটাব, মোটিভেশন কই? হপ্তায় তিনবার খেলা। আজ হারলে, কাল ফের চান্স। আরে, নিদেন জম্পেশ দাঙ্গা হ। একটা সম্প্রদায়কে বেশ কুচিয়ে কাটি। কোনও ভালবাসা, কোনও ধর্ম, কোনও অমৃত-আঠা মানুষকে এতটা ঐক্যবদ্ধ করতে পারে না, ঘেন্না যতটা পারে। সবাই মিলে ঝাঁক বেঁধে ঘেন্নার লকলকে ফণা উঁচিয়ে ধেয়ে যাওয়া একটা

গোষ্ঠীর দিকে, গলার শির ছিঁড়ে জয়স্লোগান, জিতব আমরা, মারব, শেষ করব হারামজাদাগুলোকে আজ—এ সমষ্টিপ্লেজারের তুলনা হয়? আদর্শবাদ-এ জারিয়ে একবার নিজেকে গুলে খাইয়ে দিতে পারলে, ঘেন্না এমন চমৎকার একটা ভালনাম পেয়ে যায়! ইন্দিরা মারা গেলে প্রতিবেশী শিখ ফ্যামিলিটাকে কেমন দোকানে পুরে পোড়ালুম। এদিকে আগের রাতেই তরকারি দিয়ে গেছে। কিন্তু তখন তো আর গোগি নয়, পারমিন্দরও নয়। শুধু পঞ্জাবি। আহা, সে দিন আর হবেনিকো?

কে বলে? ফের নিঃশর্ত হিস্টিরিয়ার লাইসেন্স রঙিন রিবনে মুড়ে হাতে তুলে দেছেন করুণাময় ভগবান। ভয়হীন, অবাধ, গলগল ঘেন্না ওগরানোর সুযোগ। ওবিসি-গুলোকে ডেলি যা দিচ্ছি না! বিষদাঁত সুলসুল করছিল, কোথায় দংশাব বুঝতে পারছিলুম না, এখন অনেকটা করে ডিপ দাগ বসিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। আরে সংরক্ষণ ভাল না মন্দ চুলোয় যাক, আসলি কথা, আমার কাঁচা দগদগে ঘেন্নাগুলোকে প্রকাশ্যে অলজ্জায় ফলাও করে দাবড়াচ্ছি, খিস্তিগুলো চাদ্দিকে থুকে দিতে পারছি দুর্ঘ্রাণ শ্লেষ্মার মতো। লাঠি দিয়ে একটা করে ফটাস বাড়ি মারছি কল্পিত অর্জুন সিংহ-এর মাথায়, যেন কলেজের লেঙ্গির একটা উত্তর হল। এবার নে, শালা সুন্দরী। পরেরটা নে, শালা জিওগ্রাফি টিচার। ক্লাস নাইনে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়েছিলি। কিন্তু গলা থেকে গদগদে গয়ের তোলার সময়, গন্ধজিভ উঁচিয়ে ওয়াক ছোড়ার সময় তা অবধারিত হয়ে যায় ওবিসি-বিরোধী মিসাইল। হাত তুলছি জেঠুর ধুতি ফর্দাফাই করতে, সহসা সে মুষ্টি হয়ে গেছে উপজাতির থুতনি ফাটানো আপার-কাট। সুবিধে। বের করতে তো হবে অন্তর্গত রক্তের ভিতরে ঘেন্নার প্রবাহ, অনবরত গরগর করা ঢেউ। চলো চলো, বমি করো। ওয়াক। থু। থোয়াক। হিসি উগরে দাও। সিকনি উগরে দাও। আর সব কিছুর ওপর বিছিয়ে দাও সর্বপাপতাপহর একটা ক্রুসেডের সতরঞ্চি, একটা মহৎ পোস্টার, একটা পতপতে ম্যানিফেস্টো!

হ্যাঁ, সব আন্দোলনেই ঘেন্না বর্ষানো যায়, কিন্তু এটা আলাদা। অনেক নিরাপদ। অনেক অপরাধবোধহীন। অনেক অনায়াসে গর্‌র্‌ করে বের করে দেওয়া যাবে হলদেটে শ্বদাঁত। 'ঠিক করছি তো?'—নিজেকে এই প্রশ্ন করার দায় এখানে শূন্য। লড়াইটা আসলে তো একটা স্বতঃসিদ্ধের পক্ষে। আরে ভাই, যত আঁতেল গল্পই হোক, সুচিত্রার তো উত্তমের সঙ্গেই বিয়ে হয়, রবি ঘোষের সঙ্গে নয়। সংখ্যাগুরু জানে, প্রশ্নাতীত ভাবে বিশ্বাস করে, আইন করো ফাইন

করো, ছোটলোক ইজ ছোটলোক। এমনিতেই তো ভদ্দরলোকদের পাশ ঘেঁষে ওরা বসছে ভাবলেই গা কেমন ঘিনঘিনিয়ে ওঠে। প্রোপোজ করলে কষ্টে হাসি চাপি। নাগাড়ে ডাকি সোনার চাঁদ, সোনার টুকরো। আমাদের সঙ্গেই পড়ে, হোস্টেলে থাকে, সিগারেটে কাউন্টারও দেয়, কিন্তু অনায়াসে জাত তুলে অপমান করি তাকে। কী রগড়! রগড়ানি! আরে, ওই একই হল, ওবিসি আর এস সি-এস টি। সব এক। সাব-স্ট্যান্ডার্ড। বাবা, কেলটে গায়ে জাতের লেবেল, তুলবে কী করে? মণ্ডল কমিশনের সময় মনে নেই, রাজ্যপালকে চিঠি দিতে গেলাম, পথে কী ঝিংকু প্যারডি: সোনার চাঁদ বদনি ধনি পড়ো তো দেখি! আর স্কিট? 'উই অলসো মেক স্টিল'-এর সুর গুনগুনিয়ে ওবিসিরূপী অভিনেতা তুলে নিল উচ্চবর্ণের ছেলের মানিব্যাগ, কোরাস: 'We also steal!' তালিয়াঁ! সত্যিই তো, চুরি করবে না কেন, নিচু জাত, ছোটলোক! কাজের লোকদের সম্পর্কে আমরা বলি না, 'ও যতই শাড়ি দাও, যতই মাথায় তোলো, ওরা শুধরোবে না'! 'ওরা'। গরিবরা, নোংরারা। বস্তিরা, ঝুপড়িরা। লোয়ার ক্লাসরা। কালো, থ্যাবড়া, তেলচপচপে চুল। জ্যালজ্যালে শার্ট। নিচু টেস্ট। 'স' 'স' করে কথা বলে। মেরিট নেই, গায়ে কেমন একটা গন্ধ ছাড়ে। আমাদের পাশে বসবে! হ্যাঁ, কয়েকটার টাকা আছে বটে, কিন্তু আদতে তো চাষা। ভুষো। লো। বংশটা তো আর ভুঁই ফুঁড়ে গজাবে না? কালচার?

এদের ঘেন্নার জবর ট্রেনিং মোটামুটি ন্যাংটো বয়স থেকেই পাই আমরা। গরিবকে মারার এক রকম লাইসেন্স সমাজে উড়ছেই। অ-ভদ্দরলোকরা তারই মাসতুতো ভাই। পুলিশে সুটবুট পরা ফর্সা-কাটিং লোককে ঘাড়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দেখলে ভিড় একটু থমকায়। 'লোয়ার ক্লাস'কে মারতে মারতে নিয়ে গেলে, তা আপসেই কতক বৈধতা পেয়ে যায়। ওরা তো ওসব করেই থাকে। অনার্য। ডাক্তাররা যেমন জুতো পালিশ করে প্রতিবাদ জানায়। একদিনের জন্য সবজি বিক্রি করে। অর্থাৎ ডাক্তারি উঁচু, এগুলো ইতর কাজ। কী অনায়াসে অপমান করা যায় মুচিকে, সবজি-বিক্রেতাকে! তাই এদের লাথ মারতে পায়ে বিশেষ হেলদোল জাগে না। দ্যাখো আমাদের মেল-এ মোবাইলে কেমন শনশন ছড়িয়ে যাচ্ছে চুটকি, চিঠি, শার্প মন্তব্য। তা হলে ক্রিকেট টিমে ধোনিকে বাদ দিয়ে ওবিসি ঢোকা রে, ওদের জন্য তিরিশ গজে বাউন্ডারি। চার মারলে ছয় ধরা হবে, ছয় মারলে আট, আর সেঞ্চুরি করতে লাগবে মাত্তর ষাট! আর হ্যাঁ, এক কাজ কর, ওদের পাইলট করে দে না, শালা দরদি নেতাগুলোকে পাঁজাকোলা করে ধরে সেই প্লেনে তুলে দে। আর, অর্জুন সিংহের গল ব্লাডার

অপারেশন হলে র‍্যাঁদা কাটারি হাতে ওটি-তে ঢুকিয়ে দে শালা একটা ওবিসি-কে!

সুযোগ দারুণ। বহুৎ বিতর্ক আসবে-যাবে, প্রতিবাদ, মিছিল। কিন্তু এ ঘেন্না-কুলকুচির শুচিমুহূর্ত রোজ আসবে না। অন্য আন্দোলনে খার ছুড়তে ছুড়তে গাঁতিয়ে তেড়ে যেতে, কাঁউকাঁউ করে অকথ্য খেউড় ছেটাতে নিজের ভেতরেও একটা সেন্সর কাজ করে। গরম প্রশ্নের আঁচ গায়ে লাগে। ফট করে অশ্লীল থুতু ওব্‌জানো যায় না। কিন্তু এটায় অনেক সহজে ঘেন্নার স্রোতটাকে কলকলিয়ে ছেড়ে দেওয়া যাচ্ছে আরামে। লজ্জা কী? এ তো ছোটলোকদের মাথায় না চড়তে দেওয়ার আন্দোলন। এ কাণ্ড তো কোনও রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে নয়, কোনও আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে নয়। একটা শ্রেণির বিরুদ্ধে। সে শালারা জন্ম থেকেই সবার পিছে সবার নীচে। এখন ফাঁক পেয়ে আমার পেছনে লাগিছে। এবে আমি দাপিয়ে পা ছুড়লে তা বাই ডেফিনিশন 'ন্যায্য লাথি'। এ লাথের একটা ঐতিহ্য আছে, বাপ-দাদার চর্চা-চর্যায়, সোফার কাপড়ে, গ্র্যান্ডফাদার ঘড়ির ঢং-এ তার সমর্থন আছে। আমি ঝাঁ শার্ট পরি, ধাঁ ইংরিজি বলি, ডিওডোর‍্যান্টে ম-ম। তা এদের খিস্তি করার জন্মগত অধিকার আমার নেই? এসো, এ স্বর্ণক্ষণ জাপটে ধরো। তাবৎ চুলকুনি ঘামাচি দাদের চিড়বিড়ানি গুটখার পিকের মতো থুকে দাও আজ। জমা জমাট গরল ঢেল্লে খরচা করে দাও। গবরমেন্ট, ক'বছর অন্তর ছোটলোকদের ঝাড় দেওয়ার এমন সুযোগ করে দিও বস, বিষের ব্যাগ বড্ড ভরভরন্ত।

২১ মে, ২০০৬

কেন চেয়ে আছো

পুরুষ যে প্রচণ্ড কর্ষণ করবে, তা প্রকৃতির অনাকাঙ্ক্ষিত তো নয়। বরং তাঁর উর্বরা হয়ে ওঠার, নিরন্তর শিহরিত থাকার শর্তও। কিন্তু সে-প্রক্রিয়ার মধ্যে যদি ক্রমাগত চোয়ালে চোয়াল চেপে নিষ্ঠুর মার, উপর্যুপর, টানা, লাবণ্যহীন সমানুভূতিহীন আমোদপ্রহার, উদ্‌গত অশ্রুর তোয়াক্কা না করে উল্টেপাল্টে ভোগ, আবার ভোগ, শুধু ভোগ, ফের ভোগ—স্নিগ্ধ প্রশ্রয়কে নিঃশর্ত সমর্পণ ভেবে নিয়ে, প্রেমল আশ্রয়কে ভেবে নিয়ে প্রত্যাঘাতের সম্ভাবনাহীন অনন্ত জুলুমবাগিচা—আরও আরও স্বেচ্ছাচারী স্ব-সর্বস্ব ভোগই ফণা তোলে, সে অকথ্য ধর্ষণ বই আর কী। আমাদের জন্মদাত্রী, সহচরী, আমাদের মা-বোন-বউ-প্রেমিকা-ললিতকলাবিধৌ পটীয়সী যে, বসুন্ধরা, পৃথিবী, ধরিত্রী, ধারয়িত্রী —তার সঙ্গে আমরা এ কাণ্ড করে চলেছি লাগাতার। নাগাড়ে। বারবার। অনুতাপহীন। 'কিস্যু এসে যায় না' ভঙ্গিতে। 'বেশ করছি, করব' অলজ্জ পেশিসহ।

সভ্যতার গোড়ায় তিনি নিজেই চেয়েছিলেন সঙ্গম। সন্দেহ নেই। ওই তো আমাদের পরম অজুহাত। আমরা সমূলে প্রোথিত করেছি অহং, তিনিও আক্রমণকে আকুল আশ্লেষে রঞ্জিত করে আলোকপুলকে আরও আকর্ষণ করেছেন আমাদের, স্বয়মাগতা যেভাবে ওষ্ঠে দংশনদাগ প্রার্থনা করে। উজাড় করে দিয়েছেন সত্তা। রত্নগর্ভা তিনি, বীজপ্রসূ, ক্রোড়কান্তা, গন্ধবতী। কিন্তু আমরা বুঝলাম না সে অলৌকিক প্রেম। সে নিবিড় আকাশফুলিয়া অঙ্গসঙ্গ। তাঁর মৌনকে আমরা ভেবে নিলাম ছেদহীন সম্মতির ধ্রুব লক্ষণ, তাঁর দৃষ্টির ছলছল বিজলীকে ভাবলাম উত্তাপহীন আত্মবলি, অবিশ্বাস্য উৎসর্গের মূল্য না বুঝে তাঁকে করলাম আটপৌরে নিংড়ানির কল।

যে ছিল স্পৃহাতুরা, আজ বালিশের তুলো কামড়ে পড়ে থাকে, আমরা নিজের ইচ্ছে তার ওপর পাথর পাথর চাপিয়ে দিয়ে বললাম, 'তোমাকে মারব,

সোনু? আলপিন ফুটিয়ে দেব, মোনু?' সে প্রত্যেক বার মৃদুকণ্ঠে বলল, হ্যাঁ। 'যদি তোমার ভাল লাগে, হ্যাঁ।' আমরা সে স্বরের পরতে পরতে থাকা শতাবধি 'না' শুনতে না পেয়ে শুধু বাহ্যিক 'হ্যাঁ'-র হ-টুকু ধরে, চন্দ্রবিন্দুটুকু আঁকড়ে, য-ফলাটুকু মুচড়ে, আ-কারটুকু ছেঁচড়ে, আমাদের ধর্ষকাম মিটিয়ে নিলাম তুমুল। যেমন হয়, তারপর থেকে ক্রমে নিয়ম হল উত্তরোত্তর চাবুক, এল মুখোশ, পুঙ্খ লাগানো তীব্র তীক্ষ্ণ শর, ছিপটি, মুষল, আলপনা তোলা শেকল, কাঁটা লাগানো দস্তানা। আর সে, যে একটি বার ঘুরে দাঁড়ালেই কেঁপে যাবে আমাদের আ-আলজিভ প্রাণ, একবার চোখ তুললেই দগ্ধ হবে আমাদের আশিরনখ, একবার অসহিষ্ণু অঙ্গ আন্দোলিত করলেই আমরা দৃপ্ত নষ্টামিসহ খসে পড়ব স্রেফ চ্যুত রোমের মতো, সে, চুপ করে থাকে, এক আধ বার আর না-পেরে 'মা গো' ককিয়ে ওঠা বাদ দিলে, সে বারবার বলে হ্যাঁ, আচ্ছা হ্যাঁ, প্রতিবেশীর কাছে সে যেচে কালশিটে লুকোয়, ফোনে বলে, ও আমায় মাথায় করে রেখেছে মা। ভাল আছি।

কেন? কেন এ আত্মঘাতী কূলপ্লাবী প্রেম? কেন উদ্যত নির্লজ্জ ভোজালি দেখে সে নিজেই এগিয়ে দেয় বারেবারে ননী তলপেট? আসলে মানিনী চায়, আমরা যাতে নিজেরা বুঝি। এক রাত্রের নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় যেন সহসা প্রতিদ্বন্দ্বীর ভল্লের মতো সেঁধিয়ে যায় আমাদের ভিতরে এই বোধ, কী করছি। যদি সে আমাদের ছেড়ে যায়, তখুনি তো আমরা জড়। অর্থহীন। নিরালোক। নেতি। আমরা এ কথা বুঝি, আন্দাজ করি, বিশ্বাস করি না। বন্ধু যদি বলে, এ কী করছিস তুই! তোরই ভিতকে খুঁড়ে দিচ্ছিস, তোরই ডানার প্রতিটি দৈব পালক মুড়ে দিচ্ছিস, নিজ পুরুষত্ব সেলাই করে পাকিয়ে ঘিচিমিচি করে জুড়ে দিচ্ছিস, এ তো বন্ধ্যাত্বের দিকে চলেছিস! আমরা পাত্তা দিই না। বলি, চুপ। জ্ঞান দিস না। ওর আঙুল মুচড়ে, ওর ওষ্ঠ ছিঁড়ে, ওর স্তন কর্তন করে, ওর যোনি কদর্য নখলগ্ন করে আমার অভ্যাস। ওরও। ওতেই স্বস্তি।

তাই আমরা কী অনায়াসে গাছ কুপিয়ে কাটি, বায়ুস্তরে সেঁকো বিষ বাড়াই আমাদের কারখানার গাড়ির বাড়ির আরামের নিদান দিতে, পুকুর বুজিয়ে তার ফুসফুসে চাপ চাপ মাটি ফেলি, ভাবি ওঃ, আনন্দ। আমরা আমাদের মা-কে খাই। কামড়াই। গর্ভস্থ ভ্রূণ হয়ে আমরা নাড়িতে খরখরে শ্বদাঁত বসাই। নাভিতে ঢুকিয়ে গেঁথে দিই ময়লা পা। জানি না কি, এ শুধু কৃতঘ্নতা নয়, আত্মঘাত? অ-মানুষিকতা? অশুচি কাজ? এ মুহূর্তটুকু এসি-র হাওয়া খাওয়ার জন্য, ফ্রিজের ঠান্ডা জল গলগল করে গলায় ঢালার জন্য, বহুতলে রইস আদমি

সেজে নাচার জন্য আমরা পরবর্তী প্রজন্মের পর প্রজন্মকে করে তুলছি বিকলাঙ্গ বিষনীল বিনিদ্র? তারা আউআউ রক্তবমি করতে করতে মচকে মরবে? আমার বিকৃত চোখের হাওয়া লেগে আমার সন্ততির মুখ পেঁচিয়ে উঠবে দুঃস্বপ্নের মতো, আমার কলজের ছাইধোঁয়ায় হাঁ করে হেঁচকি তুলতে তুলতে সে কুঁকড়ে কেন্নোর মতো গুটিয়ে হাপর টেনে গ্যাঁজলা তুলবে?

আমাদের এই অপুষ্পক শুখা হৃদয়, এই খসখসে লোভের আঙুল। আমাদের এই স্ব-হন্তারক অদূরদর্শী প্লেজার প্রিন্সিপ্‌ল। তবু তাঁর কী বিরতিরহিত প্রেম! কী গাঢ় অবগাহী! কী উথল ক্ষমা! হ্যাঁ অপার ক্ষমা। আবারও ক্ষমা। কিন্তু কত দিন? ক'কোটি বছর? শেষ আছে। সবের শেষ। শেষের সে দিন আঁধার গভীর, আর্তনাদ অসহ। আমরা কি এখনই সহসা আনমনে দেখব না তাঁর লতানে সজল চুল, তাঁর স্তনে জুঁইফুলের ঘ্রাণ কি আমাদের কাছে ভাসিত হয়ে উঠবে না রাতুল করতলের মতন? আমরা কি বুঝব না আমাদেরই ললিত সুচারু প্রেমে আবার বিছাবে নক্ষত্রবীথি, আবার আসবে লাবণ্যের বহতা প্রহর? নিরাময়, ত্রাণ? প্রতি প্রভাতে তিনি চোখ খুলে ভাবেন, আজ সেই দিন। ও বুঝবে। ওর আঙুলে আজ সেই জলছাপ ঘিরে নেবে আমাদের দিন। কিন্তু ফের রাত হয়। কর্কশ। অবসন্ন সন্ধ্যার মতো ধোঁয়াটে মন নিয়ে আমরা অঙ্কুশের ধার পরীক্ষা করি। বন্ধ করে দিই জানলা। পাল্লাগুলি পড়ে দুম দুম। বিছানা থেকে তুলে ওর মুখে গুঁজে দিই মোটা চাদর। মণিবন্ধ ধরে নিয়ে যাই আঘাতের ঘরে। সে চলে। টলে ও চলে। আর পারে না। চোখ চেপে বুজে ভাবে, সে তো চেয়েছিল, প্রাণপাত চেয়েছিল, দোঁহে মিলে রচে নিতে আলোঝর তিথি? আর পারে না। তার ব্যাকুল অধর শিথিল হয়ে আসে। তার পদতলে, হ্যাঁ, দেখা দিতে শুরু করেছে কাঁকর। তার চোখের কালোর ভেতরে, হ্যাঁ, দেওয়ালে বহু দিনের ছবি সরিয়ে নেওয়ার পর শূন্যতার মধ্যে আরও চৌকো শূন্যতার মতো, জল পুড়িয়ে নেমে আসে ভারী, কালো, খরখরে নুন। মরো।

৪ জুন, ২০০৬

একলা পুজো ফোকলা পুজো

একলা-ফোকলা দু'জন পুজো, অ্যাকচুয়ালি। কারণ নিজের মধ্যে তো সারাক্ষণ একটা ডায়লগ চলে। তোর কিস্যু হবে না, দেখে নিস! তুই হচ্ছিস গাধার গাধা। একটা লোককে দেখা তো, এর'ম লাথ-খাওয়া? শালা নালার ধারে মোচড়ানো প্লাস্টিক! প্রত্যেকটা মানুষ পুজোয় আনন্দ করছে, বন্ধুর বাড়ি আড্ডা মারছে, নিদেন বইয়ের স্টলে বসে রাস্তা দেখছে। কে খাটের ওপর চিৎপটাং হয়ে শুয়ে আছে, চোখে খ্যাংরাকাঠির মতো হাত রেখে? তোকে কেউ ভালবাসেও না, বাসবেও না। তুই মর। অমনি ফ্যাকফ্যাকে টিউবলাইটের আলোয় ন্যাড়া দেওয়ালে তরোয়ালের মতো লাফিয়ে ওঠে ঢাকের আওয়াজ, পাশের বাড়ির টিভিতে চণ্ডীপাঠ এক বার ফেড ইন এক বার ফেড আউট, অপমানের জ্বলুনির প্যাটার্নে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় আমার পা দেখা যাচ্ছে। চেটোয় ডটপেন দিয়ে থ্যাবড়া ফুল আঁকা। খুদে ভাইঝি। সেও বেরিয়েছে! সবাই বেরিয়েছে। সবাই। আমি, একটা নোংরা ন্যাতার মতো, ভিজে ছাতা অনেক দিন ধরে পড়ে থাকলে যে গুমসো গন্ধ বেরোয়, তার মতো, সানমাইকা পরিষ্কার করার পর যে একফোঁটা এঁটো রয়ে যায়, তার মতো, ঘিনঘিনে পড়ে আছি। আহা, নিশ্চিত ভাবে কলেজ স্কোয়ারের জলে ছায়া পড়েছে অপূর্ব আলোর, লাল-নীল কাঁপা কাঁপা চলন্ত উজ্জ্বল নকশা দেখেই অবাক হয়ে যাচ্ছে ভিড়েঠাসা বাচ্চা, মহম্মদ আলি পার্কের বাঁশ গলে ঢুকে পড়ছে ডোন্ট-কেয়ার লোফাররা, মুদিয়ালির সিংহ দেখে হাঁ করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন বৃদ্ধ আর ছোকরা ভলান্টিয়ার তাড়া দিয়ে বলছে ও দাদু হল, আর সবচেয়ে বড় কথা, মেয়ে, মেয়ে, সুন্দরী মেয়েরা স্বেচ্ছায়, হ্যাঁ, সানন্দে, উৎসুক হয়ে, তাদের বয়ফ্রেন্ডের হাত ধরে বেড়াচ্ছে। তুই মর।

এক হয়, হেঁটে আসা। কিন্তু তখন যদি ফোন বাজে? হ্যাঁঃ, ফোন তো বেজে উল্টে যাচ্ছে। সারা দিন কুকুরের মতো কান খাড়া করে বসে রইলি, ডায়াল

টোন আছে কি না চেক করা হয়ে গেছে তেত্তিরিশ বার, মধুক্ষরা স্বর দূরস্থান, হেঁড়ে গলাতেও কেউ বলে না, 'চলে আয়, আড্ডা হবে!' আচ্ছা, এত বড় দামড়া জীবনটায় তুই কী করলি, যে কেউ তোকে মিস করে না? ইস, ইয়েরা নিশ্চিত আজকে চাইনিজ খাচ্ছে। আর উয়োরা গেছে নর্থটা চষে ফেলতে। উফ্‌ফ্‌, কী স্বাস্থ্যবতী বান্ধবী সব অমুকদের! তোর সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিল। একটা ফোন করে উঠতে পারলি না পঞ্চমীর দিন? ওই লজ্জা ধুয়ে খা। আড়ষ্টের জাসু! ওদিকে লোকে ভাবছে বাব্বা, বাতেলায় রাজা-উজির মারছে, দুগ্গাপুজোয় ডাকলে হয়তো আমাদের গাঁইয়া ভাববে।

অথচ এমনি-ওমনি দিনে ল্যাঙলেঙিয়ে শুয়ে থাকতে, একটা উপন্যাস জড়িয়ে নিতে, কই তেমন তো খারাপ লাগে না। নিজেকে বেশ আলগোছে আর্টিস্ট মনে হয়, থোড়া হট্‌কে। কিন্তু একদম পাশ দিয়ে পুজোটা একশো রঙে বডি ছুপিয়ে জমজম করে বয়ে যাবে, সব্বাই পেটে-পিঠে ঝুমঝুমি বাগিয়ে 'ইয়ায়া' বলে কানে আঙুল দিয়ে ডুব দেবে জোয়ারে আর হুউশ করে উঠবে ফুসফুসময় আহ্লাদে হাঁপাতে হাঁপাতে, শুধু আমি আঁজলাটিও না ভিজিয়ে ঝোপের ধারে উচ্ছে চুষব—পেটে চাক্কু মুচড়ে দেয়। বেরো, বেরো রে গেঁতো। চৌকাঠের জাস্ট ও-পারেই জীবনের সেরা রঙিন ফুটকিগুলো টুইস্ট নাচছে, লাইফ ইজ কলিং, হোয়্যার আর ইউ?

বেরতেই, ধাক্কা। এ তো পুজো নয়, পাবলিক-পাতকো! ওরেশ্‌শালা, তাই তো! এরই তো ভালনাম পুজো! কাতারে কাতারে লোক ভিড়ে ডাইভ দিচ্ছে, পা মাড়াচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, থুতু ফেলছে, খ্যালখ্যাল করে হাসছে, চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে ফেলছে, 'এক্সিট' লেখা দিয়ে বোঁ করে প্যান্ডেলে ঢুকে যাচ্ছে আর বেরিয়ে পড়ছে 'এন্টার' দিয়ে। বেতো স্ত্রী আর হাঁটতে না পেরে পাড়ার রকে বসে স্বামীর খ্যাঁচানি খাচ্ছে। ফ্রক পরা মেয়ের হিসি পেয়ে গেছে, মা তাকে দামড়ে ঠোনা মারছে আর গেরস্থের বাড়ির গেটে পরিত্রাহি পেচ্ছাপ করিয়ে দিচ্ছে। খাওয়া! হাঘরের মতো চার হাত-পায়ে খাচ্ছে! তিরিশটা ফুচকা খেয়ে তিনশো বার এক্সট্রা তেঁতুলজল। কাঁউকাঁউ করে গিলছে, কষ বেয়ে রস পড়ছে, হেউহেউ করে ঢেঁকুর তুলছে, মুখভর্তি সস্তা হলদে বিরিয়ানি নিয়ে জোরে প্রেম করছে, হাঁয়ের মধ্যে আধগেলা মণ্ড। আমার হালকা ওয়াক ওঠে। গায়ে দাগড়া দাগড়া অ্যালার্জির মতো চনচন করে রাগের ফুসকুড়ি গজাতে থাকে। বাচ্চাগুলো লাগাতার ক্যাপ ফাটিয়ে চলেছে। ইচ্ছে করে কানের কাছটায় ফাটাচ্ছে। ফটাস ফটাস ফটাস ফটাস। মনে হয় নড়া ধরে ওই গ্যারেজের

কোণটায় টেনে নিয়ে গিয়ে ঠিক ওই রকম আওয়াজ করে পাছায় থাপ্পড় মারি। প্লিজ পোহাও, নবমীর নিশি, প্লিজ। দাঁত কশকশিয়ে আমি বলি। কথাগুলো ছিবড়ে চুইংগামের মতো টাকরায় লেগে থাকে। ঠায়।

তুই মাইরি পিওর গাড়ল। নেগেটিভ চশমা পরে বেরিয়েছিস কেন? আরে, আনন্দটা চেট্রে খা। হিউমারটা নে। চ লাইনে দাঁড়াই। নাহয় ক'লাখ লোক তোকে ঠেস্‌সে চিপে রাখবে দরজার ফাঁকে আঙুলের মতো, নাহয় ক'কোটি লোক গাঁইয়াপনা ছড়াবে উজবুকের কুলকুচির মতো, তবু হাজার মানুষের পায়ের ছন্দে পা মেলাবার মধ্যে, প্রত্যেকের ঘেমো কলার শুঁকতে শুঁকতে চলার মধ্যে, একটা ষাটের দশকের চৈতন্য আছে না! দ্যাখ, ভেতরটা ভরে যাবে। ঢুকে পড়। এখান দিয়ে? উঁহু উঁহু করেন কী, এ গেট বন্ধ, ওদিকে ঘুরে যান। আর সিকি মাইল হাঁটলেই গলি। পেয়েছি, এই তো বাঁ দিক। আঃ, কোলাপসিব্‌ল গেট দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন না? পরের গলি অবধি হাঁটুন। হ্যাট হ্যাট। আরে, এ কি লাল ছোপওলা ভেড়া না কি? অভিমান নেই? দেখি, ফিরে যাব। করেন কী দাদা, উল্টো দিকে হাঁটছেন কেন? এ লাইনে শুধু এদিকে স্রোত। কেন? এ কি আন্ডারওয়ার্ল্ড না সিপিএম, যে একবার ঢুকে পড়লে আর বেরতে পারব না? আরে ন্যাকামি পরে করবেন, চলুন চলুন, ঠ্যাল শালাকে। গুঁতিয়ে দে। এসছেন কেন, যদি মজা করবেন না?

গোড়ালির নলি খুলে গেছে। ঘরে শুয়ে থাকা যে কী ভাল! শালা, সবার রঙে রং মেলাচ্ছে! ইচ্ছে করে ট্র্যাপে ফেলল, বজ্জাত! নিতম্বের এল্‌টে তুলে মজা উশুল করে নিচ্ছে পাবলিক, এর চেয়ে অশ্লীল আর কী? আচ্ছা, চেঁচানি থামা। অনেস্টলি বল তো, তোর চিড়বিড়ানিটা আসলে কেন? আমি নজর করিনি, তুই এই বারোশো পাড়া দাবড়ে হেঁটে আতিপাঁতি কী খুঁজছিস? ঝাঁকড়া কিশোর আলাদা চিকেন-ড্রামস্টিক কিনে পথের নেড়িকে দিল, দেখেছিস? না। কুট্টি মেয়ে তর্জনী তুলে অসুরকে 'পপ্' বলছে, দেখেছিস? না। ঢাকের তালে তালে বুড়ো রিকশাওলা মাড়িসুদ্ধ হেসে প্রবল মাথা দোলাচ্ছে, দেখেছিস? না। তোর আঁখিপাখি শুধু, শুধুই সেই এক দিকে ধায়। নারী। যারা ডলফিনের মতো শান্ত। যারা হরিণের মতো চিত্রল। যারা চিতাবাঘিনীর মতো তুমুল। আর তাদের সঙ্কলের লতানো হাত বলিষ্ঠ বাহুর সঙ্গে জড়ানো দেখে তুই ভাবিসনি, মেয়েরা কি সব সময় ভুল ছেলে চুজ করবে? বুকে হাত দিয়ে বল, পুজোটায় তোর ভেতরটা কেন খাক হয়ে যায়। প্রেম চুঁইয়ে চুঁইয়ে তোর হৃদয়ে পিত্তি পড়ে গেছে, সেই জ্বালা পাকিয়ে ওঠে কি না? আর তুই সেই তিতকুটে গয়ের গোটা

পুজোর ওপর উগরে দিচ্ছিস কি না? আমার কাছে আর মিথ্যে চালাবি কী? আমি তো তুই-ই। কি? শুয়োরসোনা?

বাড়ি ফিরে, বিছনা। শুয়ে থাকা। ঘুলঘুলির গায়ে ঝুলের মতো। কষাটে, ল্যালা। চোখের ওপর হাত। মা কথা বলতে এলে, খেঁকিয়ে উঠি। বউদি। খ্যাঁক। রাতের দিকে পা সুড়সুড়িয়ে ওঠে। দেখি, ভাইঝি স্কেচপেনের গোছা নিয়ে বসেছে। পায়ের পাতায় লাল দিয়ে অ্যাত্তবড় ফুল হচ্ছে। ফট করে পাজামাটা হাঁটু অবধি তুলে দিই। বলি, সবুজ-ফবুজ সব বার কর। বাগান করে দে। সারা গা।

১ অক্টোবর, ২০০৬

ফিল্ম নয়, ফ্লিম

বাব্বাঃ, অ্যাদ্দিনে গাছপাকা আঁতেলদের এলিটতা থেকে কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালকে মুক্ত করা গেল। ফরাসি বিপ্লবের দিব্যি, শেষাবধি জনগণ জিতবেই। আমজনতার থ্যাবড়া পদচিহ্ন ঠেকাতে পারে হেন প্রান্তর ইতিহাসে জন্মায়নি। তুমি ছেলের নাম রাখবে তারকভস্কি, তার হিসির নাম রাখবে মেনস্ট্রিম, আর পুণ্য নভেম্বরে শুধু তোমার পকেট লকলকিয়ে গজাবে নধর একখান ডেলিগেট কার্ড, ও সব হাওয়া, বাওয়া। ওই শোনো নিশ্চিত বিউগিল: গণতন্ত্র পধার রহে হ্যা-য়। সব্বাই ডেলিগেট। আমি, আমার বাবা, ভাইপো, বাড়িওলা। বাড়িওলার ভাইপো, বাবা, অ্যালসেশিয়ান। অ্যালসেশিয়ানের বাবা। কী সোজা! ক্যাটালগ হাঁকড়াও, আর গলায় ছবিওলা বকলশ, আর তড়পানি! নন্দনে কী আছে দাদা? স্পেন? আর শিশির মঞ্চে? রাশিয়া? আর ওই বার্গম্যান লোকটা কে মশায়? অস্কার পেয়েছে? বউয়ের নাম কি, বার্গ-ওম্যান?

আর একটা বইমেলা এসেছে রে! পিকনিকস্থল! নেই কাজ-পত্তর? চলে আয় নন্দনচত্বর। পপকর্ন আছে, ফিশফ্রাই, বুড়ির মাথার পাকা চুল। খা, আর লাইন দে। দারুণ খেলা। বনগাঁ লোকাল-বনগাঁ লোকাল। অজগরের মতো লাইনের পেছনে দাঁড়িয়ে যা সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে, আর চলতে শুরু করলেই হইহই ঝাঁপিয়ে পড়, আর জোরসে গুঁতিয়ে দে, নির্মম ঠ্যাল, লাথ মার ডান দিকের শিনবোনে, আর চালিয়াত ইঁদুরের মতো খাঁজেখোঁজে সুটসাট সেঁধিয়ে যাক ঘাপটি মারা লোক, চলুক খেউড়, কে ফার্স্ট হবে পাঁইপাঁই দৌড়, টপকে চিপকে একটা সিটে পৌঁছো, নিজে পাছা ঠেকা, আর পাশের পাঁচটায় রাখ রুমাল ব্যাগ তোয়ালে জাঙিয়া ডিকশনারি, তারপর ফোন কর, 'হ্যাঁ, তুই কোথায়, এলগিন রোডে? তাড়াতাড়ি আয়, সেকেন্ড রো-র তিনটে ছেড়ে, পাশে টাকমাথা বুড়ো।' ওঃ, কম ফুর্তি? নাক-উঁচু ন্যাকাচন্দর ইন্টেলেকচুয়ালগুলোর নুন্নুড়ি নেড়ে নকড়াছকড়া। ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আর

বারোয়ারি ভাঁড়ের প্যান্ডেলে তফাত নেই। নন্দন তো নয়, অফিসটাইমের থার্টিফোর-বি। পিলপিল করে এস্‌সেচি হে। গেটের দায়িত্বে থাকা ভদ্রলোক লাল হয়ে চেঁচাচ্ছেন, 'শিক্ষিত সব! এরা প্রত্যেকে শিক্ষিত! একজনও অশিক্ষিত নয়!' সত্যিই, স্ট্যাম্পিড হয়ে গেলে তাঁর চাকরি গন। তারপর অবশ্য চেপটে যাওয়া লোকদের বক্ষ ফুলে চুয়াল্লিশ। ফোয়ারার পাশে খোঁচ-ওঠা বেদি: সংস্কৃতির শহিদ!

এবং মোবাইল। উরিব্বাপ! কোথা লাগে সন্ধিপুজোর ঢাক! বাজা রে, ভাই, জোরসে বাজা। অথচ বাইরে বড় করে লেখা, পইপই বলে দেওয়া: মোবাইল অফ মোবাইল অফ। কিন্তু বাঙালি যে বিজি! নাম দেখানো শেষ হতে না হতে 'ইয়ে মেরা দিল পেয়ার কা দিওয়ানা'। বাবা, ফরাসি ছবিতে শেষে আর. ডি মেরেছে? উঁহু, আপনার দু'ধারে দুই রাঘব-বোয়াল বেজে উঠেছে। নির্লজ্জ জোরসে আলাপ শুরু, 'হ্যাঁ, হল-এ আছি। একটা সিনেমা দেখছি। সি-নে-মা। হল-এ। হ্যাঁ। না, চাবি আমার কাছে নেই, ফুলকাকা নিয়ে গেছে। মালপোয়া মিটসেফে। রাখছি।' আর রাখা। মারে মোবাইল রাখে কে? পরিচালকের ব্রেন মুচড়ে বের করা সিকোয়েন্সটি অলরেডি ফালাফালা। কিছু লোক অবশ্য হেব্বি সচেতন। না, ফোন তারা কক্ষনও করে না, ধরেও না। শুধু প্রবল নীল আলো চাদ্দিকে ঝলসিয়ে সারাক্ষণ মেসেজ করে। ঝাড়া আধ ঘণ্টা মুন্ডু নিচু করে কাকে পত্তর পাঠিয়ে গেল কে জানে, আপনি ভুরু কুঁচকে তাকালে কী ছলছল অভিমান, অ মা, আপনমনে এট্টু চিঠিও লিখতে পারব না? অ্যাত্তখানি আলোর দিকে আঙুল দেখালে, খ্যাঁক! 'এগ্‌জিট' লেখাও তো জ্বলজ্বল কচ্চে। যা না, হাত দিয়ে ঢাক!

ওদিকে অনেকের এর মধ্যেই বোর লেগে গেছে। তারা অন্য হল-এ চান্স নেবে। ধড়াসধড়াস করে সিট ছেড়ে তো উঠল, কিন্তু বেরোয় কোথা দিয়ে? ওই তো ওই, পাশে দরজা রে। উঁহু উঁহু, সিনেমা শেষ হওয়ার আগে ওখান দিয়ে বেরোবার নিয়ম নেই। পেছনের দরজা দিয়ে যান। আরে রাখুন মশাই, নিয়ম। বই দেখতে এসেছি, এ কি ইস্কুলে ঢুকেছি না কি? চল, ছিটকিনি খুলে, পর্দা ফাঁক করে বেরিয়ে যাই। টর্চ হাতে লোক ছুটে আসতে আসতে তারা ধাঁ। পর্দা ফাঁক হয়ে আলো ঢুকে মানুষের সিনেমা দেখা নষ্ট হচ্ছে তার আমি কী করব? আমি তালকানার মতো ঢুকব-বেরোব-গোঁত্তা খাব, খিস্তি করব-ঢেঁকুর তুলব-নাক ডাকাব, ডেলিগেট হয়েছি বাবা, ডেলিগেট! তোর চোদ্দো পুরুষের মাথা কিনেছি রে তিনশো টাকায়। এবার অন্ধকারেই ঢুকব শিশির মঞ্চে। আর

পেল্লায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকব দরজার কাছটাতেই। উঁকি, ঝুঁকি। কী দেখাচ্ছে দাদা? গাড়ি না জলহস্তী? একটু আলোফালোওলা সিন এলেই, খসরখস, ফসরফস, 'দাদা, ফাঁকা?' ঢুকে যান। উফ, এই এক তাগড়া মজা। প্রত্যেকের পা কশকশ মাড়িয়ে, কোরাসে 'সরি' বলতে বলতে ভেতরে ঢুকে, থিতু। আঃ, আরাম। কতক্ষণ হয়েছে দাদা? আধ ঘণ্টা। গল্পটা আগে কী হয়েছে? কটমট। বলবেন না? না! না মানে? ই কী অসভ্যতা! কোথাকার হনু আপনি যে এট্টু গল্পটা বলে দিতে পারছেন না? ফেলো-ফিলিং নেই? ডেলিগেট হয়ে অন্য ডেলিগেটকে গল্প বলছে না! দেখেছ? এইসব লোক কার্ড পাচ্ছে। কারা দেয়!

টাইট টি-শার্ট ঢিলে জিন্স মুখে চোপা। হেডব্যান্ড সানগ্লাস পনিটেল। ফিল্ম স্কুল। অলিতে, গলিতে। তালতলা ছবি সংঘ, বেলতলা মুভি সমিতি। কোনও কথ্থা হবে না মাওয়াঁ, সমস্ত বুঝে উল্টে গেছি। নান্নি মোরেত্তির শেষে আমরাই তো ঝংকার-ক্ল্যাপটা স্টার্ট কল্লুম। চ চ 'হিরোশিমা মাই লাভ' শুরু হয়ে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ফেমাস ছবি। ও কী! শিট ম্যান, এগেন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট! নো নো, এটা দেখব না। পিঁক পিঁক পিঁইঁইঁ। দাঁড়া দাঁড়া মেসেজ। পিকলুটা নন্দন থ্রি গেছে রে। বাব্বা, সামনের মহিলা আবার বিরক্ত হচ্ছেন দ্যাখ। কেন মাসিমা, সিনেমা দেখব আর কতা বলব না? শুকনোশাকনা দেখে বিধবার মতো বেরিয়ে যাব? আবার মুখ দিয়ে শব্দ করলেন, চ্চুক। পারি না! চ, তালে তালে করি। চ্চুক চ্চুক চ্চুক চ্চুক। ঘাস বিচুলি ঘাস। চ্চুক চ্চুক চ্চুক। ব্যাপক, না? শালা সিরিয়াসলি বই দেখছে! দেব থুড়ে! ওই দাদু দুটো আবার কী বলছে শোন। 'বাবা রামদেবের ওই প্রাণায়ামটা করছেন? ওই যে শোঁওও ভুর্‌র্‌র্? আর পেটটা ঢুকিয়ে ওঁকৎ হোক্ক!' 'আরে ওসব ছাড়ুন, শীর্ষাসন ট্রাই করুন। মাথায় যা রক্ত চলকাবে না! দিনে বিশটা সুডোকু!' মাসিমা ফের খেপেছে। দাদা, প্লিইজ, চুপ করুন, এখানে একটা সিনেমা হচ্ছে। 'তো কী হয়েছে? এখন তো ডায়লগ হচ্ছে না! সিনসিনারি দেখাচ্ছে।' 'আর ডায়লগ হলেই বা কী? ফরেন বই, সাব-টাইটেল দিয়ে দিচ্ছে পড়ে নিন, ল্যাঠা চুকে গেল। আমি তো আর আপনার চোখে রুমাল বাঁধিনি।' হক কথা। মানুষের বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার হরণ করে কোন দিগ্‌গজ? ওঃ, আলতো নড়লেচড়লে ওঁয়াদের মননে ফোস্কা!

শেকড়-টেনশন কিন্তু একটিই। হেই ভগমান, এত যে সি এল খরচা করলুম, কফি খেয়ে খেয়ে [illegible]দ মেরে এক সপ্তা রগড়ারগড়ি, শেষরক্ষে হবে তো মা?

অ দাদা, এই যে দেখে বেরলেন, কিছু আছে? আর আপনি? অ্যাঁ, ওই 'সেক্স অ্যান্ড ফিলজফি'তেও নেই? ইরানের বই, মেয়েরা মাথার চুল অবধি ঢেকে রাখে! কী কাণ্ড বলুন দিকি! কিস দেখে এদিকে ছুটছি মিস দেখলেই চান্স নিচ্ছি, উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটনি, এ ডেডিকেশন ফ্লপ মেরে যাবে? কী বললেন? আছে! ওরে ভোলা, ওরে ভেলি, বেলাবেলি কোথা গেলি, আয় বাপ। রবীন্দ্র সদন সাতটা? ইন্টিমেসি, না ইন্টুমাসি, কী বললেন? অ্যায়, চারটে থেকে লাইন থাকে যেন। পৌনে চারটে থেকে। আড়াইটে। ভোর ছ'টা। কই তুমি ডাকছ না যে? আআআঃ, পয়সা উশুল। প্লুরো খুল্লম আর্ট, ফ্লিমের মতো ফ্লিম।

কী বললি? কথাটা 'ফিল্ম'? আ বে জিভে গিঁট্টু পাকিয়ে দিলে করতে পারবি, উশ্চারণ? সমষ্টির নাম শুনেছিস? গুষ্টি? ক্রাউড? মাস? নির্বোধভোগ্যা বসুন্ধরা বে। আমরা সর্বত্র, আমরা সবজান্তা, আমরা সর্বশক্তিমান। আমাদের জন্য ফেস্টিভ্যাল, আমাদের জায়গা রাখা লাইন, এমনকী অথরিটিও আমরা। মাইরি। আমরাই করছি। আমরাই করাচ্ছি। ফাট্টাফাট্টি ডবল রোল। দেখলি না, মাইকে ঘোষণার সময় আদ্ধেকের তুতলে কুঁতিয়ে ককিয়ে ইংরিজি? দেখলি না, 'পরিচালক আসছেন' বলে একগাল হাসি পুষে তন্বী মঞ্চে ঠায় দাঁড়িয়ে, ওদিকে তেনার কোটের ন্যাজটিরও দেখা নেই, অগত্যা নারী হাঁ বুজে ওয়েলকাম গিলে উইংসের দিকে হাত-পা নেড়ে ধাঁ? দেখলি না, বিদেশি পরিচালককে নিয়ে গটগটিয়ে স্টেজে উঠে বড়কত্তা গ্রান্ডারি ডিসকাশন বাগাতে গিয়ে ধ্যাধ্ধেড়ে ধ্যাড়ান্তি! সে কী কমেডি শো! সইতে না পেরে আমরাই তো নাগাড়ে হাততালি শুরু করলুম। কিছুতে থামি না! কীর'ম ইন্টারন্যাশনাল স্টাইল প্যাঁক, অ্যাঁ? শেষে আলোচনা শিকেয় তুলে, ফিলিম শুরু! অবশ্য এসব গপ্পো এই বেলা মানে মানে চেপে যাওয়া ভাল। নইলে পরের দানে আবার ডেলিগেট কার্ড দেবে না!

১৯ নভেম্বর, ২০০৬

যত মত, একটাই পথ

সাংবাদিক ১ : নন্দীগ্রামের নাম আপনারা ভৃঙ্গীগ্রাম করে দিচ্ছেন?

সাংবাদিক ২ : শুনলাম মেগা-মনিবের নতুন উপাধি 'উন্নততর স্তালিন'?

সাংবাদিক ৩ : আচ্ছা, বাংলা ভাষার অশিষ্ট শব্দের অভিধান-এ 'স'-র তলায় নাকি 'সিপিয়েম' ঢোকানো হচ্ছে?

মেজো মস্তান : সিপিয়েম স দিয়ে শুরু না কি? সি দিয়ে শুরু। শালা বানান জানে না, অভিধান লিখছে।

ক্যাডার ১ : কেউ কিস্যু জানে না, না স্যর?

সেজো মস্তান : কিস্যু না। কিস্যু না। রাজ্যপালটা কিস্যু জানে না। অসাংবিধানিক।

মেজো মস্তান : স্বরাষ্ট্রসচিবটা কিস্যু জানে না। আনইনফর্মড।

সেজো মস্তান : মেধা পটেকরটা কিস্যু জানে না, কুচুটে।

মেজো মস্তান : শুধু আমরা সব জানি, পার্টির পাঁড়-পণ্ডিত।

সাংবাদিক ২ : কিন্তু আপনাদের পার্টি যে এভাবে নিরস্ত্র মানুষকে পেটাল...

মেজো মস্তান : তা সিপিয়েম পেটাবে না তো কে পেটাবে? পি ডব্লিউ ডি?

ক্যাডার ২ : শুনুন, কিসুই তো দ্যাখেননি। অ্যায়সা ধোলাই দেব না, শহরের এসব শৌখিন ইন্টেলেকচুয়ালগুলোর প্যান্ট হলদে হয়ে যাবে। পকপক হচ্ছে, না, পকপক? মিছিল বেরোচ্ছে! পোস্টার দোলাচ্ছে! ইচ্ছে করলে ওই মিছিলের মধ্যে দু'কোটি লোক ঢুকিয়ে এক মিনিটে সব ম্যাসাকার করে দিতে পারি বুয়েচেন? জেনে রাখবেন, বেঁচে যে আছেন, জাস্ট সিপিয়েমের করুণা।

ক্যাডার ৩ : ঠাটিয়ে এগুলোর কানের গোড়ায় দুটো দেব স্যর?

সাংবাদিক ২ : দেবেন মানে! ক্যামেরা চলছে না?

ক্যাডার ২ : ক্যামেরা? দু'মিনিটে প্রমাণ করে দেব আমরা এখন দিঘায় ছুটি কাটাচ্ছি। না স্যর?

সেজো মস্তান : দিঘা নয়, তোরা পুরী। আর স্টেনগানওলারা বকখালি।

ক্যাডার ৪ : এই এই সাংবাদিকগুলো, তাড়াতাড়ি এদিকে জড়ো হ, রাজাসায়েব কোটেশন বলবেন।

মেগামনিব : হ্যাঁ, কী যেন, 'যত মত, একটাই পথ। জীবে প্রেম—সিপিয়েম।' কে বলেছেন? (চোখ নাচিয়ে) জীবনানন্দ।

সাংবাদিক ১ : না স্যর, এটা জীবনানন্দ বলেননি।

মেগামনিব : বলেননি? বলা উচিত ছিল। ইট ছুড়লে জীবনানন্দকে তো পাটকেল খেতেই হবে।

সাংবাদিক ১ : লোকে বলছে আপনারা যা করেছেন, কোথাও কখনও ঘটেনি।

মেগামনিব : হাঃ। এই হচ্ছে মিডিয়ার এঁটো খেয়ে ইতিহাস শেখা! তিয়েন-আন-মেন স্কোয়্যার ভুলে গেলেন? আহা কী দিয়েছিল রে ভাই! ট্যাঙ্কফ্যাঙ্ক দিয়ে নিরস্ত্র ছাত্রগুলোকে পিষে পুরো রেশমি কাবাব। এই মেজো, আমরা ট্যাঙ্ক নামালাম না কেন?

মেজো মস্তান : আনতে বলেছিলাম স্যর, ইংরিজি না বুঝে সব জলের ট্যাঙ্ক বয়ে এনেছে। কাজ দিচ্ছে অবশ্য, রক্ত ধুচ্ছে হেভি তোড়ে!

সেজো মস্তান : স্ল্যাং ডিকশনারির কথাটা মেগাদাকে বলুন।

সাংবাদিক ৩ : ইয়ে, বলা হচ্ছে এ জমানায় সেরা চার অক্ষর হল 'সিপিয়েম'।

মেগামনিব : তাই না কি? ডিকশনারিওলার নাম ঠিকানাটা দিন। এই ক্যাডারগুলো, কুইক, পাঁচ-ছ'জন মিলে ওর বাড়িটা পুরো সন্ত্রাসমুক্ত করে দিয়ে আয় তো!

ক্যাডার ৩ : স্যর, ফিলিম ফেস্টিভ্যালের ফোন। সোলানাস রেগে গেছেন। চারপাশে স্পাই দেওয়া হয়েছিল, তারা বাথরুমেও যেতে চাইছে ওঁর সঙ্গে।

মেগামনিব : ঠিক করছে। কমোডের ভেতর মাওবাদী ঢুকে নেই কে গ্যারান্টি দিল? বেশি ফটফট করলে আর্জেন্টিনা অবধি হিসি চেপে রাখতে বল।

সাংবাদিক ১ : কিন্তু স্যর, ফিলিম ফেস্টিভ্যাল তো ফাঁকা। ক্যাডাররা কচুরি খাচ্ছে। আসল লোকজন কেউ...

মেগামনিব : তাতে কার ক্ষতি? ঘি এনে দিলুম, তোদের পেটে সইল না। তো বঞ্চিত হয়ে মর। কী, ফেলু?

ফেলু : সে আর বলতে? শুনুন তোপসেগণ, সব গুলিয়ে ফেলবেন না। কোথাকার কোন গ্রামে ছলে বলে কৌশলে টেটিয়াগুলোকে মার্ডার করা হল,

তাই ভাল ভাল সিনেমা দেখব না, এটা কথা হল? হিটলারের অলিম্পিকে জেসি ওয়েন্স লাফায়নি? সে কি কোন গ্যাস চেম্বারে কোন গাড়লদের চোখ উল্টে গেল, এই ভেবে প্র্যাকটিস না করে মড়াকান্না কাঁদছিল? আর বিদিশির কথা বলে কী হবে? মুসোলিনির বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ পাস্তা খাননি?

মেগামনিব : এই রে, কোটেশনটা মনে পড়ল। 'বেড়াল হইতে কুকুর, তপন হইতে সুকুর, সবার চানের একই পুকুর—সিপিয়েম।' কে বলেছেন? (চোখ নাচিয়ে) রবীন্দ্রনাথ।

সাংবাদিক ২ : না স্যর, এটা রবীন্দ্রনাথ বলেননি।

মেগামনিব : বলেননি? বলা উচিত ছিল। অদ্দিন ধরে করলেন কী?

ক্যাডার ৩ : মেগাদা, এ মিছিলটায় নাকি বলছে হেভি লোক হয়েছিল। সব স্বতঃস্ফূর্ত।

মেগামনিব : হোহোহো। আমাদেরটায় সহস্রস্ফূর্ত হবে। চাড্ডি তৃণমূল আর আনন্দমার্গী জুটিয়ে এনে প্যাঁকপ্যাঁক করছে! এস এম এস করে মিছিল হয়? ভোর থেকে গাঁয়েগঞ্জে ট্রাক পাঠাতে হয়। ব্যস, তুড়ি মারলে তেত্রিশ কোটি দাঁড়িয়ে যায়। কী, টুপিওলা?

টুপিওলা মস্তান : আরে ছাড়ুন স্যর, ছুঁচোর কথা তুলে আর প্রসঙ্গ গন্ধ করবেন না। ছোঃ, ওটা মিছিল? আমাদের ইউরিনালে ওর চেয়ে বেশি লোক লাইন দেয়।

ক্যাডার ১ : বলেন কী, সব্বার ডায়াবিটিস?

টুপিওলা মস্তান : চোপ! আজকের মিছিল করব, পুরো ধর্মতলায় মুন্ডু তো সাগরে ন্যাজ। আর রবরবা কী! স্লোগানের কী জোশ! বিরোধীদের কী বেধড়ক খিস্তি! তা না, গবেটগুলো করেছে 'মৌনী মিছিল'! জন্মে শুনিনি রে, নিরামিষ মাংস!

সাংবাদিক ২ : কিন্তু সমস্ত বড় বড় সাহিত্য-সংস্কৃতির লোকরা শামিল হয়ে...

মেগামনিব : আরে ছাড় ছাড়! ক'জন? একশো জন? দুশো জন? আমরা হাত ঘোরাব আর পাঁচ লাখ কবি জন্মাবে। কী? পোষা কবি?

কবি : হেঁহেঁ, আপনার করুণা না পেলে কেউ কালচার করে খেতে পারে স্যর? আমি আর মিসেস তো তাই বলছিলাম, সব ফ্লপের ধাড়ি, আর্টপত্তর বিক্কিরি হয় না, বিদেশ যেতে পায় না, এখন এই করে পাবলিসিটি করে নিচ্ছে।

সেজো মস্তান : বাপের জন্মে একটা সামাজিক কাজ করেনি, এখন সব ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে শখের রাজনীতি ফলাচ্ছে।

সাংবাদিক ১ : এটা তো বরং বিরাট ব্যাপার স্যর, জীবনে যে রাজনীতি করেনি, সেও আজ পথে নামছে!

মেজো মস্তান : হোহো, সে আর ক'দিন? দু'দিন? দু'মাস? ভোট তো এখনও চার বচ্ছর। তদ্দিনে এই অ্যামেচাররা কোথায় থাকবে? কন্যে তখন লভ ছেড়ে বিয়ে করে পোয়াতি। আমরা কিন্তু কিচ্ছুটি ভুলব না! সব ব্যাটাকে ধরে ধরে ব্ল্যাকলিস্টেড করে, সব গ্রুপ-থিয়েটারবাজের কল শো ক্যানসেল করে, সিরিয়ালওলাগুলোর ভাত মেরে, কবিদের বই পুড়িয়ে, দে দনাদন! আর সাধারণ পাবলিক! আহারে, ছোনুমোনু। সব লিস্টি বানিয়ে পাড়ায় পাড়ায় কর্নার করব, বেরোলেই হ্যারাস করব। একঘরে করে ছাড়ব। রাত্তিরে বাড়ি ফেরার পথে দু'থাবড়া কষিয়ে বলব, কই রে, মিছিলতুতো ভাইবেরাদর ডাক, তোকে বাঁচাক! মনে রাখবি, নাটকওলার পুড়কি এক দিন, সিপিয়েমের তুর্কি হর দিন।

মেগামনিব : 'সংস্কৃতির সাতমহলে জ্বালাব লালবাতি। সিপিয়েম-এর পা না চাটলে, অকুস্থলে লাথি।' কে বলেছেন? কার্ল মার্কস!

সাংবাদিক ৩ : না স্যর, এটা মার্কস বলেননি।

মেগামনিব : বলেননি? বলা উচিত ছিল। দেখি যদি পরের এডিশনে শুধরে দেওয়া যায়।

সাংবাদিক ১ : তার মানে আপনারা ওপেনলি বলছেন...

মেজো মস্তান : এতে ক্লোজ্‌ড-এর কী আছে রে শূকর?

মেগামনিব : নো রাখঢাক। ওসব ঘোমটা-ফোমটা উড়ে গেছে। আমরা বলছি—ভাল করে ডিক্টেশন লিখে নে—আমরা বলছি, নন্দীগ্রামে এগজাম্পল সেট করে দিলাম, দেখে রেস্ট অব বেঙ্গল শুধরে যা। মুখ তুলেছিস কি জুতো ডলে দেব। মুখ খুলেছিস কি জিভ ছিঁড়ে নেব। হোলসেল সিপিয়েম হ। নয় তো পাঁকে গুঁজে যা। সিম্পল।

সাংবাদিক ১ : স্যর, এই যে স্টেটের মাথা হয়ে আপনি 'আমরা', 'ওরা' বলছেন, এ তো অসাংবিধানিক। তাইলে রাজ্যপালকে...

মেজো মস্তান : আঅাঃ! এতক্ষণ কী বোঝালাম? অন্য কেউ অসাংবিধানিক বললে খারাপ। আমরা অসাংবিধানিক বললে সেটা বিপ্লবী ম্যানিফেস্টো।

ক্যাডারগণ : আমরা সিপিয়েম বে। আমাদের হেঁচকিতেও সিম্ফনি।

সাংবাদিক ২ : তা হলে, মানে, কেউ যদি একটু নিউট্রাল হয়ে থাকার চেষ্টা...

মেগামনিব : উঁহু, কোনও চান্স দেব না। শোন কোটেশন। 'যে আমাদের পক্ষে নয়, সে আমাদের বিপক্ষে।' কে বলেছেন? সত্যজিৎ রায়।

সাংবাদিক ৩ : না স্যর, এটা জর্জ বুশ বলেছেন।

মেগামনিব : তাই না কি! ইয়ে, আমি নন্দনে চললাম, একটা ভাল সংগ্রামী ছবি আছে। বাই। কাল নয়া কোটেশন পড়ে আসব।

১৫ নভেম্বর, ২০০৭

'ও কিছু হবে না'

ড্রাইভারকে বললাম, 'কই সিট বেল্ট-টা বাঁধলেন না?' সে ঠোঁট মচকে বলল, 'ও তারাতলার মোড়ের পর বাঁধব। এখানে কেউ দ্যাখে না।' কিছুক্ষণ পর, দিব্যি লাল লাইট টপকে গাড়ি চালিয়ে দিল। হাঁ-হাঁ করে উঠলাম, 'এ কী, সিগন্যাল...!' সে বলল, 'আরে ধুর! সার্জেন নেই দেখেই চালিয়েছি। আপনি চুপ করে বসুন তো। অত ভয় করলে চলে?' গাড়ির ভেতর বন্ধুরা খ্যা-খ্যা হাসতে লাগল। একজন বলল, 'খামখা টেনশন করিস কেন? ওই জন্যে তোর আমাশা সারে না।' লাস্ট ট্রেন স্টেশনে ঢুকছে, আমিও। পড়িমরি স্প্রিন্ট টানছি, কাউন্টার বেশ দূরে, চেনা কাকু হাত টেনে ধরলেন। 'কী লেভেলে ভিতু হে! লাস্ট ট্রেনে টিকিট কাটছ? চেকাররা কি লেপ-কে কাঁদিয়ে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে?' দেঁতো হাসি হাসতে থাকলুম। ছি ছি ছি, আমি আইন মেনেছি। যে আইন মানে সে হাবলা। ডরপোক। যে আইন মানে না, সে ঠিকঠাক। স্মার্ট। আমরা সরকারকে, পুলিশকে অহরহ ধুইয়ে দিই। ছিঃ! ডিসিপ্লিন বজায় রাখতে পারে না, একটা মিনিমাম সিস্টেম নেই, দেখেছেন! আর নিজেরা দিনে ছেষট্টি বার রাস্তা পেরোই কোনও আইন না মেনে। চলমান গাড়িকে 'আ বে থাম' মুদ্রায় হাত দেখালেই হল। মেয়ো রোডের গাঁধী-স্ট্যাচুকে নিয়ে চুটকিও ফেঁদেছি: বেচারা নিয়ম মেনে রাস্তা পেরোতে গিয়ে আজও দাঁড়িয়ে! ফিটফাট বাঙালি রাস্তায় থকাথক পিক ফ্যালে, চোঁ-চাঁ হিসি করে, ওভারব্রিজের বখেড়াকে পাশ কাটিয়ে পা লম্বা করে ডিভাইডার ডিঙিয়ে যায়।

যতই হোর্ডিং বাগাও, গান বাজাও, জাঠা করে সচেতন করো, বাঙালি দোকান থেকে প্লাস্টিকের প্যাকেট চাইবেই, 'আরে দাদা, দিন না। কিচ্ছু হবে না।' ফস করে সে লাইনে সেঁধিয়ে যেতে চায়, ব্যাঙ্কের খুপরি থেকে কল্পতরু উৎসব অবধি সর্বত্র গোঁত্তা মেরে পরে এসে আগে যেতে চায়, বাসে উঠে সিগারেট ধরায়, নাটকে 'ছ-বছরের নীচে শিশুর প্রবেশ নিষেধ' লেখা সত্ত্বেও

বাচ্চা নিয়ে ঢোকার জন্য চেঁচামেচি করে, ওয়ান-ওয়ে রাস্তায় উল্টোবাগে বনবন সাইকেল চালায়, হাসপাতালে দুটো কার্ড নিয়ে গোলাম-চোর খেলে পেশেন্টের ঘরে চুয়াল্লিশ জন ভিজিটর মিলে গুলতানি পাকায়, হাতগাড়িতে নয় ভ্যাটে নয় জঞ্জাল সম্পূর্ণ বেজায়গায় ফ্যালে। দেরি করে যাওয়ার সময় সগর্বে বলে, 'আরে ছাড় তো, বাঙালির টাইম! ছ'টা বলেছে মানে সাড়ে ছ'টার আগে কিছুতেই শুরু হবে না।' যদি গিয়ে দ্যাখে গায়ক অলরেডি হাঁ করে গিটকিরি ছেড়েছে, কী তম্বি!

সংশোধন। এ অভ্যাস মোটেই বাঙালিতে সীমাবদ্ধ নয়। ভারতে সমস্ত মানুষ, জাতিধর্মনির্বিশেষে, আইন মানার ক্ষেত্রে পূর্ণ ন্যাকরচ্যাকর। দরিদ্র ভারতবাসী, প্রফেসর ভারতবাসী, কেরানি ভারতবাসী, ব্যবসায়ী ভারতবাসী, লোফার ভারতবাসী—এই একটি ব্যাপারে একেবারে নিক্তি মেপে সমান বদ, অভদ্র, জাত-অশিক্ষিত। আইন হচ্ছে চিনির মঠ, মট করে ভাঙো, কট করে সুবিধেটি খাও।

যতক্ষণ না অবশ্য, কোঁতকার ভয় এসে দুয়ারে দাঁড়াচ্ছে। ঠিকঠাক ছ'ফুট সাদা ধবধবে পুলিশ রাউন্ড মারিয়ে দিন, সব এমন নিখুঁত লেফ্ট-রাইট কদমতাল করবে যেন বাথরুমে জেব্রা ক্রসিং কেটে নিত্যি প্র্যাকটিস চলে। থুতু ফিরে যাবে আলটাকরার তলায়, কলার খোসা ঘামবে হাতের তালুতে যতক্ষণ না ডাস্টবিন হাঁ করে তাকে গিলছে, হেলমেট মাথায় সেঁটে বসবে খুলির জীবনদেবতার মতো, অটোয় অলৌকিক রিভার্স-মোশনে উঠে আসবে ডান দিকের শিক। আবার মোড় থেকে ছাউনি উঠে গেলেই, ভো-কাট্টা। এইখানেই, আসল ফোঁড়া। আইন মানব শুধু শাস্তির ভয়ে। শুধু কেবল ওনলি একমাত্র জরিমানা বা ওঠবোস বা জেলহাজতের ভয়ে। অন্য কোনও প্রণোদনা থেকেই নয়। কিন্তু কেন?

কেন কিছুতেই বুঝব না, আমি সিট-বেল্ট লাগালে, সরকার বা সরকারের বউয়ের কোনও উপকার হয় না? অ্যাক্সিডেন্ট হলে আমার মুখটা যাতে ফেটে চৌচির না হয়ে যায়, সেজন্যই ওই আইন? কী কারণে বুঝব না, আমি কেতা মেরে মোবাইলে কথা বলতে বলতে গাড়ি চালালে, পুলিশ বা সরকারের বিজগুড়ি-বিজগুড়ি র‍্যাশ বেরোয় না, শুধু আমার খুলিটা দুমড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে? আইন জিনিসটার ভেতরে একবারও উঁকি মারব না কেন? প্রতিটি পদে একটা ক্যালাস, আড়বোঝা জীবন যাপন করব কেন? না, এসব প্রাথমিক নিয়মাবলি আমাকে হ্যারাস করার জন্য বা আমার কাছ থেকে অযথা

পয়সা খেঁচার জন্য তৈরি করা হয়নি। আমাকে দেখতে হবে, (এক) আমি নিজে যেন ভাল থাকি, আর (দুই) অন্যে যেন আমার জন্য অসুবিধেয় না পড়ে। এই দুটি চিন্তাধরন শিখলেই, আমি সভ্য মানুষ হব, এবং আইনের থিম আর আমার সুর মোটামুটি একই গতে বাজবে।

এইখানে অবশ্য প্রান্তবর্তী ডালে ডানা মুড়ে বসে বিপ্লবের গল্প। মানে, ক্যাবলা ল্যালা কাছাখোলা মানুষজন আর অপদার্থ শয়তান মতলববাজ প্রশাসন মিলে যে ঝঞ্ঝাট আর বিদ্বেষ পয়দা হয়, তার গিটুঁবাজি। পুলিশের কাছে অকারণে হুজ্জোত সইতে সইতে, উদাসীন প্রশাসনের চৌকাঠে মাথা ঠুকতে ঠুকতে, উপদেশদাতাদের নিজেদের ন্যাংটামি দেখতে দেখতে আমাদের এমন চিড়বিড়ানি গজিয়েছে যে, 'ও, ওই শালারা বলছে? মানব না, যা!' ভাল কথা শুনলেও আমরা খিঁচিয়ে উঠি, 'চান কর' বললে ঘাড় গোঁজ করে সেধে নোংরা থাকি। সাহিত্যিক এমনও বুনেছেন : কর্তৃপক্ষের প্রতি বিবমিষাই আমাদের এই সর্বস্তরে নিয়ম-ভাঙার দিকে নিয়ে গেছে। আইন না-মানার গোঁ আসলে পবিত্র সাবোতাজ। সেসব নাটুকেপনা ও সস্তা বিদ্রোহের গল্প নাহয় থাক, আসলি সুতোটি ঠিকই, অথরিটি আমাদের অ্যায়সা রেটে থাবড়ায়, যে আমরা তার অভয়হস্তেও রামচিমটি কাটতে পারলে বাঁচি। সঙ্গে অবশ্যই আছে, সিংহভাগে জাঁকিয়ে: আইন না-মানার পরম সুবিধে। ফাঁকিবাজি। না-বোঝার আরাম। মস্তি-বাচক অশিক্ষা।

সেই জন্যেই বাঘের খাঁচার সামনে গিয়েও মনে হয়, আরে ধুর, ওসব তো কত কিছুই লেখা থাকে, হ্যান করিবেন না ত্যান করিবেন না, ছাড় তো! ফোরগ্রাউন্ডে গরাদ চলে আসছে, ভেতরে ঢুকিয়ে একখান খচাৎ স্ন্যাপ মেরে দিই। কী আবার হবে? এই আর এক অমোঘ ধ্রুব-টিউন। কিচ্ছু হবে না। আরে চ তো খাড়া মালগাড়ির তলা দিয়ে গুঁড়ি মেরে, কিচ্ছু হবে না। আরে নে তো এখান দিয়ে ইউ-টার্ন, কিচ্ছু হবে না। নিয়তিবাদ। আমার কিছু হবে না, ভগবান আমাকে বাঁচাবেন। আমার সময় এখনও আসেনি। অ্যাক্সিডেন্ট হয় অন্য লোকের। আমার কাজ কাগজে ছবি দেখে 'ইইস' বলা। এই দৈব কনফিডেন্স, প্লাস আইনের গায়ে লাথ মারার দৈনন্দিন অভ্যাস, সব মিলিয়ে অতঃপর ছানাপোনার সামনে ছাতি ফুলিয়ে একখান হাত খাঁচার ভেতর দেওন। ব্যস! আরে ভাই, বাঘ। সে কি তোর দুব্‌লা খেঁকুরে কনস্টেবল মাত্তর? দিনের পর দিন মাস্‌লে জং ধরিয়েও সে অরণ্যদেবের বাবার মতো মুভ করতে পারে, জঙ্গলের প্রাচীন প্রবাদ। অতএব জাম্প কাট ও ঘ্যাচাং। আইন না-মানার

হাতে-গরম ফিরতি-দংশন। প্রায়-ঈশপীয় (এট্টু বেশি হরর-সহ) আখ্যানের নীতিবাক্যটি কী?

সরল। বাঘ অর নো বাঘ, যা লেখা আছে তা পড়ুন। মানুন। সেটা হয় বেসিক ভদ্রতা, বা সর্বস্বীকৃত নীতি, দুনিয়ার সভ্য সমাজের নিয়ম অনুযায়ী লেখা। যে কোনও অনুশাসন মাত্রই আপনার সাতজন্মের শত্তুর নয়। পোলিও খাওয়ালে আপনার শিশুরই লাভ। 'অতশত বুঝি না শুধু ছ্যারছেরিয়ে জীবন বাঁচি'-র মধ্যে কোনও স্বতঃস্ফূর্ত মহিমা নেই। একটা গ্যাদগেদে লাল-পড়া গাধামি আছে। ভোঁতা অসভ্যতা আছে। আর বিপ্লব করতে হলে প্লিজ দল গঠন করুন। জল তুলে কল খুলে রাখবেন না। লেভেল ক্রসিং-এর কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে হিরো সাজবেন না। কোনও ডিসিপ্লিন ধারণ করার আধার আপনার নেই—এই চূড়ান্ত ফাঁপামি আর শিথিলপনাকে সিস্টেম-বিরোধিতার কোলে দোলদোলাবেন না। নিজের অনাচারকে গা-জোয়ারি মহত্ত্ব দেওয়ার মধ্যে গৌরব নেই। স্রেফ বজ্জাতি আছে। মনে রাখুন, আপনার যেমন খুশি রাস্তা পার হওয়ার ফাঁট থাকলে, গাড়িরও আপনাকে যেমন খুশি পিষে দেওয়ার অধিকার আছে। অন্যের কাছে দায়বোধ আশা করব, আর নিজে যথেচ্ছাচার চালাব, হয় না। এটা জঙ্গল নয়। বনে থাকে বাঘ। কোণে থাকে ক্যামেরা। পাহারা এড়িয়ে আই সি ইউ-তে উঁকি মেরে আসা ভালবাসা দেখানো নয়। রাস্তাঘাটে প্যারাবোলা মেনে লম্বা হিসি করা স্বাধীন স্টেটমেন্ট নয়। নোংরামি। মূর্খতা। মূর্খ ভারতবাসী কারও ভাই নয়।

২৩ ডিসেম্বর, ২০০৭

জিদান বাড়ি আছিইইস!

খুব বোকা ছাড়া সব্বাই জানে, সীমার মধ্যেই অসীমকে ঠুসে নিতে হয়। নইলে টেরিফিক হ্যাপা। আমাদের আবার বিশ্বকাপ কী? প্রচুর মুখ্যু তখন থেকে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, ঘানা ঘানা। আরে! ঘানা পারলে আমরা পারব? ওদের এক একটা থাই দেখেছিস? তুই তোর মেজকাকা সুদ্ধু ঢুকে যাবি। পিংখাড়ু বাঙালি, মাটন রোলে কামড় দিতে না-দিতে তলপেটে আমাশা চিড়িক মারে, তুই যাবি ওই বৃষস্কন্ধদের সঙ্গে পাঙ্গা নিতে? জার্মানি ইয়া ঢিশুঁয়া গোলা মারছে, আর হরিদাস পাল ডাইভ দিয়ে বাঁচাচ্ছে? তার চেয়ে ভাল কথা বলছি বস, চিরকাল যা করে আসছিস, তা-ই কর। হ্যাঁ, নিজের বউয়ের মধ্যেই অ্যাঞ্জেলিনা জোলি, নিজের প্ল্যান্টিক শটে ফ্রান্সিসকোলি। পাড়া-বিশ্বকাপ। খেয়েছে, এখন আবার কেউ ফ্রান্সিসকোলি-র নামই জানে না। আসলে এই লেখাটা একটু পুরনো দিন নিয়ে। সিপিয়া কালারে চোবানো। যখন টিভি দেখতে বড়লোক পড়শির বাড়ি দল বেঁধে যেতে হত। যখন সারা দুপুর ধরে ভুরু কুঁচকে টি-শার্টের পেছনে স্কেচপেন দিয়ে লিখতে হত ইয়াব্বড় '10', অর্থাৎ, মারাদোনা। আর হ্যাঁ, নাম-পাতাপাতি। এ তো তোমার আদিদাস-এর অ্যাড নয়, হেথা 'জিদান বাড়ি আছিইইস!' চিল্লে গলা চিরে ফেললেও পাঁচিলের ওপার হতে 'যা—ই' বলে পাঁচুই আসবে। অতএব 'উবু দশ-কুড়ি' টাইপ প্রিল্যুড হিসেবে, মাঠে নেমে টিম করার সময় বাতলে নিলেই হল, আজ আমি জিকো, ও লিনেকার। ওদের ক্যাপ্টেন ততক্ষণে প্লাতিনি হয়ে, গেঞ্জি ঝুলিয়ে পোজ দিয়ে দিয়েছে। যাকে বলে, সীমার মাঝে ইয়ে।

সত্যি, দিন ছিল। বারপোস্ট হত দুটো ইটের টুকরো বা স্রেফ হাওয়াই চটির ঢিপি। উঁচু দিয়ে বল গেলে ক্রসবারকে চুমু খেয়ে উড়ে গেল না গাঁক করে জালে ঢুকে গেল, প্রখর কল্পনা ও হাতাহাতিসাপেক্ষ। মাঠের ধারে রায়কাকু

অ্যালসেশিয়ান নিয়ে বেড়াতে এলে খেলা থেমে থাকত দশ মিনিট। ফুটবলের পাম্প ফুরিয়ে গেলে, সাইকেলের দোকানে গুটিগুটি। ঝাঁকড়াচুলোটা থাকলে ভাল, মাগনায় করে দেবে। ভুঁড়িওলাটা থাকলে, দশ পয়সা। তখন বিশ্বায়ন হয়নি তো, নেট-এ সার্চ দিলেই বেকহ্যামের ব্রণর সংখ্যা ও ব্যাসার্ধ জানা যেত না। চোখ ভয়ঙ্কর গোল করে আমরা খেলার ম্যাগাজিনে ভিনগ্রহের ভগবানদের কথা পড়তাম। গ্যারিঞ্চা পৃথিবীর সব্বাইকে একশোবার নাচিয়ে ছিটকে ফ্যালে, ভাভা এমন একটা শট মারে যা উড়তে উড়তে ঝরা পাতার মতো আচমকা গোঁত খেয়ে পড়ে এক্কেবারে নিজের ম্যানের মাথায়, রুমেনিগে ভাঙা হাতে ঢাউস ব্যান্ডেজ নিয়ে নেমে যটা খুশি গোল শোধ করে খেলা ঘুরিয়ে দেয়। এসব ছিল আমাদের ইন্দ্রজাল কমিক্‌সেরই পার্ট টু। পাড়ার বাচ্চা জন্মেই নাগাড়ে বাঁ পায়ে লাথায় বলে তক্ষুনি নাম পেয়ে যেত 'কেম্পেস'। যেবার মাকানাকি আর শিলাচি উঠেছিল, কেরোসিনের টিন হাতে কেউ যাচ্ছে দেখলেই লোকে চেঁচাত, 'ফাঁকা না কি?' সে একগাল হাসি নিয়ে নির্ঘাত জবাব দিত, 'তেল আচি!' এইভাবে আমরা উথল সমুদ্দুরকে নিজস্ব কুয়োর মধ্যে নিংড়েগুঁজড়ে ফিট করে নিয়েছিলুম। পাড়ার মাঠে বিকেল হতেই একটা অলৌকিক, না, ঠিক কনে-দেখা-আলো নয়, পেলে-দেখা-আলো নেমে আসত।

পেলে ছিলেন বেতালের ভাই। পুরো টিমকে সাতবার কাটিয়ে ফাঁকা গোললাইনে ওয়েট করতেন। কোনও বাঙালিশাবক ছিল না, যে ওয়াল ম্যাগাজিনে 'ব্রাজিলের ছেলে কালোমানিক পেলে' লেখেনি। সেই পেলে যেবার সশরীরে কলকাতায় এলেন, মা রে! ওই আমাদের হাতের নাগালে প্রথম বিশ্বকাপের টুকরো! তিন মাস আগে থেকে তাবৎ শিশু দুলে দুলে এডসন অ্যারান্টেস ডি নেসিমেন্টো মুখস্থ করছে, বড়রা বাসি মুখে খবরকাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে ছবি দেখছেন, 'পেলে কী ভাবে গোল করেন/৮৪' (মানে এর আগে ৮৩টা বেরিয়ে গেছে)। ৩৮ নম্বরটায় উনি হয়তো ডিফেন্ডারের শিনবোনে ওয়াল খেলছেন, আর ৯২-তে বারে লাগিয়ে রিবাউন্ড করে নিচ্ছেন। অবশ্য খেলার দিন দেখা গেল, ও হরি, ভদ্রলোক বিশেষ নড়াচড়ার মধ্যে নাই। দুষ্টু লোকে বলল, 'ধুর, এটা পেলে না কি? শান্তিগোপাল!' আদ্ধেকে বলল, 'ইঃ, দুটো পা ক'লাখ টাকা দিয়ে ইনসিওর করা জানিস? তোদের এই ঘিনঘিনে কাদামাঠে আছাড় খেয়ে ভাঙুক আর কোম্পানি

উল্টে মানহানির মোকদ্দমা ঠুকে দিক!' বাকি আদ্ধেকের অবশ্য অন্য পলিসি। পেলে বুট দিয়ে বলটা এক গজ ঠেললেই, 'দেখলি দেখলি, জাত চিনিয়ে দিল!' এর মধ্যে আবার মোহনবাগানের গোলকিপার ঝাঁপিয়ে পেলের পা থেকে বল তুলে নিলেন। যায় কোথায়! পরের দিন পাড়ার গোলকিপার এসে প্রথমেই বলে দিল, 'আমি শিবাজি ব্যানার্জি'। এই প্রথম লেভ ইয়াসিনের চাকরি গেল।

ইয়াসিন হওয়া অবিশ্যি সোজা না। বাড়ি থেকে কালো গেঞ্জি পরে আসতে হয়। উনি নাকি ব্ল্যাক পরেই খেলতেন। একবার পেলের হেড বাঁচাতে প্রথমে ভুল করে ডান দিকে ডাইভ দিয়ে, তক্ষুনি শূন্যে ইয়া মোচড় মেরে বাঁ দিকে উড়ে গেছিলেন। ভাবা যায়! কিন্তু ঝামেলা, পাড়া-বিশ্বকাপে তো গোলি সারাক্ষণ গোলি নয়। রোটেশন পদ্ধতিতে সে তো স্ট্রাইকারও হবে! ফলে লেভই বলো গর্ডন ব্যাংকসই বলো, 'কী রে, অ্যাই, দুগোল তো হয়ে গেল, এবার তুই গোলি হ, আমি উঠব', খ্যাচখ্যাচ। দেবদূত হয়ে এলেন কলম্বিয়া-র হিগুইতা। ওয়াঃ, কী খেলা রে ভাই! পোঁ-পোঁ এগিয়ে সব্বাইকে কাটিয়ে গোল দিয়ে বসেন আর কী। ব্যস, আমাদের মাঠেও ভেদাভেদ ঘুচে একসা। গোলি নিজের গোল ছেড়ে উল্টো দিকের বক্সেই তাণ্ডব। ফল যা হওয়ার তাই। হিগুইতাও পাকামো মারতে গিয়ে ডাহা গোল খেয়ে ভিলেন। আমাদেরও গোলকি সেন্টার অবধি উঠতে পারবে, ব্যস।

আঁতেল আবার থাকবে না? ফি সন্ধে খেলার শেষে গোল হয়ে বসে আমরা গেঁড়েবন্ধুদের লেকচার শুনে হাঁ বন্ধ করতে পারতুম না। সুদীপ দত্ত বলল, ওদের স্ট্যান্ডার্ডে যাবে ইন্ডিয়া? জানিস, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলরা যেখান থেকে সেন্টার করে, ওয়ার্ল্ড কাপে সেই অবধি পেনাল্টি বক্স কাটা? মানে, ওরা পেনাল্টি মারে কদ্দুর থেকে? না, আমাদের যেখানে মাঝমাঠ! শুনে তো আক্কেল গুড়ুম। শুভদ্যুতি বলল, দু'চক্ষে দেখতে পারি না গাড়লগুলোর পেলে পেলে আদিখ্যেতা। জর্জ বেস্টের নাম শুনেছিস? তোদের পেলেকে বলে বলে নাচাবে। নেহাৎ মদ খেয়ে নিজেকে নষ্ট করল, তাই। শুনে ধাঁ, ওয়ার্ল্ড কাপেও তা হলে সত্যজিৎ-ঋত্বিক আছে! উদ্ভট চ্যালাগিরিও ছিল। পাওলো রোসি ড্রাগ-ঝামেলায় জড়ালেন। তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আবার লম্বু সুজিতদা আধ শিশি কাফ সিরাপ গিলে খেলতে নামবে কে জানত! বোকারা বলবে, অয়ি, তবে এই বিশ্বকাপ-সিজন কভু ফুরাত কেন? আরে ভাই, পুজো কি সম্বচ্ছর থাকে? না থাকতে আছে? অষ্টমীতে ম্যাগিহাতা পরতে হয়,

তারপর ফের নিজের গায়ের গন্ধওলা রংচটা কিন্তু বড্ড প্রিয় শার্ট। তাই বিশ্বকাপের মাসখানেক যেতে না যেতে মাঠভর্তি ফের সুরজিৎ সেনগুপ্ত, মিহির বোস, গৌতম সরকার। হ্যাঁ, শ্যাম থাপা তো গুচ্ছের। ব্যাটারা সোজা বল পেলেও ব্যাকভলি করবেই। তারপর শিরদাঁড়া ছড়ে যা কাণ্ড! লাল ওষুধ আনতে পিকিংদের বাড়ি যাওয়ার কাড়াকাড়ি। কিন্তু, সে অন্য গল্প।

২ জুলাই, ২০০৬

বাইপাস করাব, তবু

আসল যুক্তিটি, মানে আবেগটি, মানে গোঁয়ার গর্বিত গর্জনটি, তুখোড় অসাম্যবাদী, পরিষ্কার কলার-তোলা: বইমেলাকে অন্য মেলার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলোনি বাপ! বই হচ্ছে কুলীন, তাই এ মেলা পাবে অন্যায় সুবিধে, উদ্দাম ছাড়। দূষণ হচ্ছে? হোক। অসুস্থ হচ্ছ? হও। এখানে তো আর ভ্যানিটি ব্যাগ/নারকোল ঝ্যাঁটা ঝুলছে না, হেথা পৃথিবীর তাবড় ব্রেননিঃসৃত দুর্দান্ত ধারণাধারা ধুইয়ে দিচ্ছে সত্তা, গিন্নি পড়ছে দত্তা দেরিদা শুঁকছে কত্তা, মাইকে অনবরত বাজছে কণিকা, তো উড়ুক না ধুলোর কণিকা! আইন-ফাইন আবার কী? লজ্জা করে না ভাবতে, নীচ নশ্বর মালপত্তর আর জ্ঞানের গোঁসাই গ্রন্থ একই সমানসমান চিহ্নের ডাঁয়েবাঁয়ে! মহায়, এখানে নাগরদোলাবাজি না, কলচর হয়। সংস্কৃতি। সে সুপার-শুচি, পাঁড়-পবিত্র। ভাগ্য সাহসীর, আম্পায়ার অস্ট্রেলিয়ার, আর আইন বইমেলার সহায়। তার কাছে কৈফিয়ত দাবি? ছ্যাঃ! আমরা না বাঙালি?

বাঙালির এই মহত্তম বখেড়া : জন্মেছ কি সবে জঠর থেকে ন্যাড়ামুন্ডিটি বের করেছ, এঘাড়ে পাঁচ কিলো ওঘাড়ে পাঁচ কিলো সংস্কৃতি ফলাবার দায় ঝপাঝপ সেঁটে গেল। বুকে সংস্কৃতির আঁচিল, গলায় ডেলিগেট তিল। এবার চিড়িয়াখানা গিয়ে জিরাফ দেখার ইচ্ছেয় হৃদয় ফেটে যাক, মুখে বলতে হবে: চ, জোড়াসাঁকোয় কপাল ঠুকে আলু করে আসি। বাঙালি ওরাল পরীক্ষা ছাড়া কবিতার ইঞ্চি মাড়ায় না, 'পথের পাঁচালি' সিনেমাতেই দেখে স্টোরিটা জেনে নিলে আবার বইটা পড়তে হবে কেন বুঝতে পারে না, সারা দিনে অক্ষর-গেলন বলতে টিভির পর্দায় ব্রেকিং নিউজের স্ট্রিপ আর কেচ্ছাভর্তি চকচকে ম্যাগাজিন—এদিকে বইমেলার গায়ে টোলটি পড়লে তার হৃদয় তক্ষুনি গর্ত হয়ে পাতকো। আরে! ইম্যানুয়েল কান্ট শুনলে যুবসমাজ ভাবে পর্নো কথা বলছে, তার আবার গ্রন্থ নিয়ে এত হচরপচর কীসের? না, যা-ই

বলো আর তা-ই করো, বইমেলা নাহয় বিষাইবে বায়ু, ফুসফুস করিবে কালো, তবুও তাহাকে ক্ষমা করিব গো, বাসিব জড়ায়ে ভাল। স্যাক্রিফাইস করিব, আজ, এবং কালও!

মেলা-কত্তাদের যুক্তি শুনলে মনে হবে, কে বলে বাংলা কমেডিয়ান কম পড়িতেছে? এ যেন, কেম্পাম্মা (যিনি সায়ানাইড দিয়ে প্রচুর মহিলাকে খুন করে সদ্য গ্রেফতার) বলছেন, ধর্মাবতার, এবারটা ছেড়ে দিন, আর কখনও মহিলা মারব না, ধরে ধরে শুধু পুরুষদের মারব। অবিকল সেই থিমে: 'অ, ময়দানে দূষণ হলে অসুবিধে? বেশ তো, তাইলে পার্ক সার্কাস দূষিত করছি।' বেচারা সুভাষ দত্ত। একবার একটা কথা বলে হিট পেয়ে গেলে, বোধহয় রিপিট চলে না। নইলে, যে লোক গাদা যুক্তি দিয়ে ধোঁয়া-ধুলোর অত্যাচার থেকে ময়দানকে ফ্রি করলেন, এবার একই অপরাধ সামান্য জিওগ্রাফি বদলে করা হচ্ছে বলে, সাইডলাইন? আরে ভাই, সে-ই ধুলো উড়বে, সে-ই ধোঁয়া ভকভক, সে-ই ফুসফুস কালচে, বাচ্চা-বুড়ো মিলে হোঁয়া-হোঁয়া হাঁপ, কোরাসে নাকের জল মোছা। সান্ত্বনা কী? না, ক-জায়গার বদলে খ-জায়গায় দূষিত হয়েছি। হুররে!

আর জ্যাম? পার্ক সার্কাসের দিকটা এমনিতেই যেতে বুক ধড়ফড়ায়, অসহ্য গাড়িজট, তুমুল হর্নাহর্নি। বইমেলা হয়ে আরও কয়েকশো গাড়ি ওখানে নেত্য শুরু করলে জায়গাটা তো হদ্দ নরক হবেই—গ্যারান্টি—চেন-এফেক্টে গোটা শহর জড়ভরত হয়ে যায় কি না, দেখার। গিল্ড কী বলছে? ও পুলিশ ঠিক সামলে নেবে। কী করে? কেন, পুজোয় যেমন সামলায়। কীসে আর কীসে! স্নেকে আর আশীবিষে! একে তো পুজোয় সব ছুটি। স্কুল-কলেজ-অফিস-কাছারি, কিছু যেতে হয় না। তা ছাড়া মানুষ তখন উতরোল উৎসবমুখী, 'অসুবিধে'র সংজ্ঞাটাই আলাদা। আর, পুলিশ সে সময় অবস্থা সামাল দিতে গোটা শহরের ডিজাইন হাপিস করে দেয়: এখানে নো এন্ট্রি, ওখানে বাঁশ দিয়ে ঘেরা, সেখানে অটোরুট বাতিল, ট্রাফিক ঘুরিয়ে ভুলভুলাইয়া, রাস্তায় ছ'শো স্বেচ্ছাসেবী। প্রশ্ন: বইমেলা কে এমন হনু, যার জন্য তাবৎ খোল-নলচে হাঁচড়েপাঁচড়ে এত সব করতে হবে? 'বই ওগো বই' মর্মে চক্ষু-ডবডবে বক্তৃতা দিলে যতই ইগো ফুলে প্যাপিরাস হোক, বইমেলা তো আর সত্যি সত্যি পুজোর মতো অপরিহার্য, অবিচ্ছেদ্য পার্বণ নয়, যে না থাকলে বাংলার আত্মাটাই তুবড়ে যাবে!

যিনি 'কেন, আমার কাছে তো পুজোর চেয়ে বইমেলা দামি' ভাবছেন,

তাঁকে বলি, এক, আপনি নিতান্ত এ-ই টুকুন দ্বীপের অধিবাসী, অত ছোট্ট গোষ্ঠীর খাতিরে কলকাতা তছনছ করা যাবে না। আর দুই, শহর আটকে পুজোও কিন্তু খুব চমৎকার নাগরিক অভ্যাস নয়। বরং আমাদের ভুরুফুরু কুঁচকে জোরে ভাবা উচিত, পুজো যতই মেগা-উৎসব হোক, তাতে কেন মারকাটারি এতোল-বেতোল চলবে। এবং একটা ঝামেলা মেনে নিতেই হচ্ছে বলে, আর একটা মেনে নিয়ে কষ্টের ডোজ বাড়াব—এ কি কাজের কথা?

ভুল বুঝবেন না, বইমেলার মতো তুরীয় আনন্দময় ঘটনা শহরের মধ্যিখানে করতে পারলে ভাল হত, আলবাত। কিন্তু সে তো অনেক কিছুই করতে পারলে ভাল হত, যেমন গাঁতিয়ে দুশো ডেসিবেলে গান শুনতে শুনতে অফিসে কাজ, বা সিনেমা হল-এ ছবি দেখতে দেখতে পায়ের ওপর পা তুলে সিগারেট ফোঁকা, কিংবা বন্ধুর বউ সেক্সি হলেই হামলে হামি। কিন্তু আমরা এগুলো করি না। কেন? কারণ অন্যের অসুবিধের কথাটা ভেবে দেখতে হবেই। উহাই সভ্যতার প্রাথমিক শর্ত। বইমেলা নিয়ে আদিখ্যেতা এই সীমাটা লঙ্ঘন করে যাচ্ছে।

সমস্যার কথা পাড়লেই উত্তরের যা বহর, প্রায় বেতালের টিসুম! স্কুলে যাওয়া-আসার অসহ্য অসুবিধে হবে। 'টাইমিং বদলে দিন।' গাড়ি রাখার জায়গা পাওয়া যাবে না। 'গাড়ি আনবেন না।' ই কী রে? এ কি বিমানবসু-পনা হচ্ছে না কি? এবার কেউ যদি বলে, আমি হাসপাতাল যেতে পারব না, জ্যামের চোটে ওই এলাকার দুটো বড় হাসপাতাল একেবারে অগম্য হয়ে যাবে, তাকে অনায়াসে এই কর্তৃপক্ষ বলবেন, 'ওই কটা দিন অসুস্থ হবেন না, তা হলেই মিটে গেল।' ভাবা যায়? স্কুল-কলেজের সময় বদলে দেবে! কেন? না, একটা মেলা হচ্ছে, যাতে বই বিক্রি হবে! ট্রাফিক তছনছ করে দেবে। লোককে সোনামুখ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়িতে বসে পচতে হবে, কাজকম্ম শিকেয় তুলে। কেন? না, একটা মেলা হচ্ছে। শরীরে অনেক বেশি ধুলোধোঁয়া বয়ে হাপরের মতো শ্বাস টানতে হবে। কেন? না, বাঙালি সংস্কৃতি করছে! একটা ন্যূনতম নাগরিক ভদ্রতা থাকলে এ কথা উচ্চারণ করা যায়? পারস্পরিক সৌজন্য, যার ওপর সু-রুচি নির্ভর করে, খলবলে হুজুগের চেয়ে স্বাভাবিক শ্লীল জীবনকে গুরুত্ব দেওয়া, যা সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির চিহ্ন—কোনও দিনই কি এই মেলোড্রামা-হাঁউমাউ স্থূলভাগে ল্যান্ড করবে না?

তাও যদি বলা হত, বইমেলা উঠে যাবে, আর হবে না। বলা হয়েছে, সরে একটু সাইডে যা ভাই, অনেকটা ফাঁকা রয়েছে, দূষণ কিছু কমবে, আর

যান-চলাচলে অসুবিধেও ঘুচবে। তারপর কর না, প্রাণ ভরে বড় আর সুন্দর আর মননশীল মেলা। না, তা হবে না। কেন? বাইপাসে কেউ আসে না। আরে! তা হলে তো বোঝাই যাচ্ছে, বাঙালি বইকে কত্ত ভালবাসে। তার জন্য জীবন দেবে, কিন্তু কিছুতেই ঠেঙিয়ে অতটা যাবে না। কী? না, রাতে ফেরত-গাড়ি পেতে বড্ড অসুবিধে। হাঁটতে হাঁটতে গাঁটে বিষব্যথা। জীবনমুখীম্যানের অতখানি শিরদাঁড়া টাটিয়ে গিটার বয়ে নিয়ে যেতে ভোকাল কর্ড শুকনো। কর্পো-কেরানির টুক করে দু'ঘণ্টা বুক ফেয়ার মেরে দিয়ে ফের অফিস ফেরার সিন হাওয়া। হে কালচারোলা, প্যারাডক্সটা বুঝুন—'বইমেলার জন্য বাঙালি সব অসুবিধে ভুগতেই প্রস্তুত' এই অজুহাতে মেলা শহরের মধ্যিখানে করা হচ্ছে, কারণ সেখান থেকে সরালেই বাঙালি আর বইমেলা যাবে না, 'অসুবিধে হচ্ছে' কেঁদে!

অবশ্য শুধু ল্যাদাড়ুস আলস্য নয়, নির্বুদ্ধিতাও আছে। এই যে বক্তব্য: মেলা ভাই কাছাকাছি হোক, ফুসফুস আমার শেষ হয়ে যাক, হৃৎপিণ্ড শুকিয়ে দড়া হয়ে আসুক, নাহয় বাইপাস করাব, তবু বাইপাসে যাব না—এ আচাভুয়াগিরি শুধু গেঁটেবাত থেকে উৎপন্ন নয়। এর মূলে আছে: দূষণ চোখে দেখা যায় না বলে, সে অপ্রত্যক্ষ বলে, তাকে নিয়ে মাথা না-ঘামানোর তীব্র অশিক্ষা। পা টনটন এক দিনে সেরে যাবে কিন্তু আহত পরিবেশ যুগ যুগ ধরে ছোবল মারবে—এই কথা কিছুতে না-বোঝার গেধো অসমঝদারি। আর সঙ্গে, গোটা শহর দাঁত ছরকুটে পড়ে পড়ুকগে, আমি যেন সহজে বই ঘাঁটতে পাই, এই তুঙ্গ অভদ্রতা।

আসলে, সংস্কৃতি নিয়ে আলগোছে বাতেলা আর সংস্কৃতি ভালবাসা পৃথক জিনিস। শীতের রাতে বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হবে বলে যে জাত বইমেলা যায় না, সে জাত বইমেলা ডিজার্ভ করে না।

১৩ জানুয়ারি, ২০০৮

ওরে ভোঁদড় ফিরে চা

আলিপুর চিড়িয়াখানার আড়াইশো-বছরী মহাকচ্ছপের উইল—

না না, অভিযোগ করছিনে। আরে, ওসব আমাদের মনে আসেও না। আমরা হচ্ছি দেখনবিলাসী। রোদ্দুরের পর রোদ্দুর, জোছনার পর জোছনা আমাদের নাকের ডগায় গুঁড়ো হয়ে পড়ে, ফের মিলিয়ে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে যেদিন মুঘলরা ব্যবসার চাবিকাঠিটি তুলে দিল সেদিনও গাজর চিবুয়েচি, ইন্দোনেশিয়ার শিল্পপতিকে নিয়ে তোদের বুদ্ধদেব যেদিন নাচানাচি করল, সেদিনও গাজর চিবুয়েচি। চোখের সামনে সিরাজ নবাব থেকে বিরিয়ানির দোকান হল। তারপর ওই দাড়িওলা ছেলেটি, আহাহা কী যেন নাম, ভুলে যাচ্ছি, তার নোবল চাকতি পাওয়াও দেখলাম, চুরি যাওয়াও দেখলাম। কার কাছে খাপ খুলবি? শর্টে বলি, তোদের ঠাকুদ্দার ঠাকুদ্দা যখন মুখময় লালা ঝরিয়ে হামা টানছে আর পিঁপড়ে তুলে খাবলা করে মুখে দিচ্ছে, তখন থেকে আমি আছি। বুঝছিস, যার চোখের সামনে দিয়ে ইতিহাস টেক্সটের আড়াই হাজার এডিশন প্রবাহিত হয়, ঘোড়ার খুরের অভিজাত শব্দ থেকে অটোরিকশার ফিচলে বাতকম্ম অবধি সমস্ত যার অক্টেভ নেড়েঘেঁটে বোঝা হয়ে গেছে, তার প্রজ্ঞা কোন লেভেলে? আন্দাজ করতেও হেঁচকি খাবি।

প্রবলেম হল, তোদের দেখলেই আমার খিঁতখিঁত করে এক রকম হাসি পায়। এমন একটা কোলকুঁজো কনফিউজ্‌ড জাত ভগমানের রাজত্বে চলেফিরে বেড়াচ্ছে! তার আবার পাছায় দুটো পকেট আর হাঁটুর তলায় চারটে! এমনিতে উপদেশ-টুপদেশের ছাব্বিশ স্কোয়ার মাইলের মধ্যেও আমরা নেই। কখনও শুনেছিস কোনও মহা-কাছুয়া কলাম লিখেছে? অথচ একটি বার মুখ ফাঁক করে অটোবায়োগ্রাফি ঝাড়লে, মোটামুটি তিন শতাব্দীর কেচ্ছা লেপেজুপে যে বেস্টসেলারটি বিয়োব, তোদের কোন নোবেলওলা জন্মেছে, পাঙ্গা নেবে?

কিন্তু না, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাত তো, আমাদের খলবল করলে চলে না। স্ট্রেট কর্মসূচি: স্রেফ ড্যাবডেবিয়ে দেখে যাও। যেমন খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বিজ্ঞ বাপ খুদে ছেলের ক্যাপফাটানো যুদ্ধ দ্যাখে। কিন্তু সাবধান, ফ্যাক করে হেসে দিলে চলবেনি। আমাদের খোলের তলার দিকটা পাঁজরার সঙ্গে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে সিল করা, বেশি হাসলেই চিড়, ব্যস, ইনফেকশন। তবে তোদের বালখিল্যপনা যা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে, ভয় করে, আমার ক্ষেত্রে না অনুরূপ কেলো হয়ে যায়। তখন সেকেন্ড মজন্তালী সরকার।

খাঁচার চারপাশে যারা ভিড় করে, আমার ঝিমুনি দেখে টোন কাটে, বয়স বুঝে অবাক মানে, তাদের সবার সঙ্গে আমার নিরন্তর আইসপাইস। ওথলানো মজা: যেন ছদ্মবেশী রাজা সন্ধেবাজারে থলে হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমাকে হাবা ভেবে তোরা নিজেদের মধ্যে আকথা-কুকথা চালাস, গপ্পো মারিস: কাগজের হেডলাইন থেকে পাড়ার বউদির কেচ্ছা। ভেতর ভেতর আমি যে সমস্তটা শুষে রাখছি মেপে দেখছি, গোটা জগৎটা পড়ে নিচ্ছি কথাবার্তাগুলোর কমাদাঁড়ি অবধি তাড়া করে, তোরা অজান্তে একটা সুপার-প্রাণীর কাছে নিজেদের গিনিপিগ করে দিচ্ছিস অনবরত, তোদের ব্রেন থেকে হরমোন, কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে সেতারচেতনা, সমস্তটা নিখুঁত বসে যাচ্ছে আমার বেঢপ কপালটুকুর মধ্যিখানে, সে তো তোদের সায়েন্স-ফিকশনেরও বাইরে। অথচ এই আমি হয়তো তখন তোদের মেনিমুখোপনাকে ওজন করে চলেছি লক্ষ্মণ সেনের কাঁপুনির সঙ্গে, দুপুর রোদে পিঠ দিয়ে গোষ্ঠ পালের ট্যাক্‌ল খেয়ে ভাইচুং কটুকরো হত ভেবে একটু মুচকি দিলুম, সন্ধেবেলা ভুষি চোষার সময় চট করে মাতঙ্গিনী হাজরা আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যাস্তাখ্যাস্তা শাড়ির একটা তুলনামূলক আলোচনা ভেঁজে, খোলের মধ্যে গুড নাইট। ব্যাপারটা কিন্তু তোদের আন্দাজ করা উচিত ছিল। শ্যামাপোকা এক দিন বাঁচে, কিস্যু বোঝে না। কুকুর বারো বছর বাঁচে, বল ছুড়ে দিলে ফেরত আনে। তোরা প্রায় নব্বুই-একশো। তাতেই চাড্ডি আইনস্টাইন নামিয়ে দিয়েছিস। তো এই জলবৎ ঐকিক নিয়মটা পারলিনি, যে তিনশো বচ্ছর করে নাগাড়ে বাঁচছি, তাইলে আমাদের তোর চেয়ে তিনগুণা বুদ্ধি? কোথায় এ উপলব্ধি বাগিয়ে ডেলি জোড়হাতে ভক্ত হনুমানের মতো বসে থাকবি, যে স্যর, আপনে সক্রেটিসের বাবা, গায়ত্রী স্পিভাকের মা, কিছু নলেজ দিন, তা না আমাদের নামে মশার ধূপ প্রতিষ্ঠা বই কিস্যু করলিনি?

দেখে এত মায়া হয়, শত চেষ্টাতেও আর মুখ না খুলে থাকতে পারলাম না। জানি, লাভ নেই। আদ্ধেক কথা বুঝলেও মনোযোগ দিবি না, বাকি আদ্ধেক মনোযোগ দিলেও বুঝবি না। খ্যাখ্যা করে বড়জোর গন্ধওলা মুখে ভকভক করে অশিক্ষার গ্যাঁজলা তুলবি। তবু সোজাসাপটা বলি কি দাদুভাইরা, দিদুবোনেরা, এই যে তু-তু ডাক শুনলেই ন্যাজ তুলে ল্যাল্‌লেলিয়ে ডিসকাউন্টের পেছনে দৌড়চ্ছিস, প্রেমালাপ ভর্তি তড়বড়িয়ে শুধু কে কত ই এম আই দিচ্ছে তার কেচ্ছা, একবার ভেবে দেখেছিস, তাড়া-খাওয়া ছুঁচোর চেয়ে আলাদা তোরা কীসে? বাসে জানলার ধারের সিট নিয়ে চুলোচুলি করিস, সে তো অভ্যাসে, সত্যি গাছফাছ দেখে কখনও তোদের মনে হয়, এই আশ্চর্য রোদ্দুর কেন রোজ অদ্দূর থেকে এসে অনবরত সব কিছুকে ঝিকিয়ে তুলছে? কেন বৃষ্টি ঠিক টাইমে স্টেনলেস স্টিলের মতো চকচকে করে দিয়ে যাচ্ছে পিচপথখানি? ভেবে দেখেছিস, মোটামুটি লো-ভোল্টেজের একটা সফ্‌ট চাঁদ যে ফিট করা আছে হর রাত্তির, বসন্তের হাওয়া পেত্যেক বছর ডিউটি মেনে ফালাফালা করে দিয়ে যাচ্ছে তোর হার্ট, সমুদ্দুর সেই জুরাসিক যুগ থেকে আজ অবধি একটি বারের জন্যেও যন্তর অফ না করে ঠিক পাঠিয়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের পর আবার ঢেউ, এগুলো তোরই ভাল্লাগার জন্য কি না? ছুটিতে সুইজারল্যান্ড দিঘা কিচ্ছু যেতে হবে না রে, তুই যেখানে যেমন থাকিস, জগিং করিস আর সোফায় আধশোয়া, তোর কাছে সেধে গিয়ে ফোকলা বাচ্চার মতো নিঃশর্ত এ-কান থেকে ও-কান হেসে উঠবে বেঁচে থাকার আনন্দ। শুধু একবার থির হয়ে তাড়া না করে চেয়ে দেখতে হবে বাপ, তাকে কোলে নিতে হবে। বাগুইহাটির মোড়ে দাঁড়িয়েও পা থেকে মাথা অবধি হঠাৎ অমৃতের স্নান সেরে ফেলা যায়। কাঁটা দিয়ে উঠবে ঘাড় থেকে মেরুদাঁড়ার বেস। তার জন্য বাজেট দেখে ছোট গাড়ি কিনতে হয় না, শুধু ওরে ভোঁদড় ফিরে চা। ভোঁদড় বললাম বলে রাগ করলিনি তো? আচ্ছা রোস, একটা গল্প বলি।

তখন ছেলেটার কত হবে, দশ বা বারো। মাইরি বলছি, তখনও তকতকে গাল, একটা দাড়িও গজায়নি। একদিন, বেশ সকাল। একটা চাকরের সঙ্গে বেশ ক'টা ছোকরা এসছে চিড়িয়াখানা দেখতে, চ্যাঁওভ্যাঁও লাগিয়ে রেখেছে। আমি বোধহয় আনমনে একটা শুভঙ্করী কষছিলাম বা বিরক্ত হয়ে ভাবছিলাম বৈষ্ণব পদাবলিতে এত ইয়ের আধিক্য কেন। হঠাৎ চমকে দেখি, আমার খাঁচার সামনে একটা একলা ছেলে, মাথায় কী সুন্দর একটা টুপি আর গায়ে দামি সিল্কের

ফতুয়া, অপূর্ব টিকলো নাক আর আয়ত চোখ প্রায় জালে ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে কী সব বলছে। অবাক কাণ্ড। বাঘ-টাগ না দেখে আমার কাছে? এট্টু এগিয়ে গেলাম। ছোঁড়া বলছেটা কী? শুনি, একটা দু'লাইনের কবিতা বলছে :

ওগো কাছিম, ওগো কাছিম, হে মন্থরতর
সতত মোরে শতধা স্রোতে স্থিতধী তুমি করো।

আমি, মশায়রা, যাকে বলে, স্তম্ভিত। চোখে অটোমেটিক জল এল। এ কে রে? এই বয়সে এমন ছন্দ, ফাটাফাটি অনুপ্রাস, শব্দ বানাবার ঐশ্বরিক প্রতিভা, এসব না। এসব বহুত আসবে-যাবে। কিন্তু এ কী করে এক মুহূর্তে আমার, কী বলব, 'কচ্ছপতা'টাকে নিখুঁত ধরে ফেলল? কী করে বুঝল, আমার চলা যায় না বলা? তার চেয়ে বড় কথা, আমার এই ধীরতা, এই হাঁকপাঁক না করে চুপটি করে থাকা, তারিয়ে তারিয়ে জীবনের প্রতিটি কণা স্লো-মোশনে চেখে দেখা, এ যে আমার দুর্বলতা নয়, বরং উল্টে আমার জোরের জায়গা, এ যে কাঙ্ক্ষণীয়, শিক্ষণীয়, তা কী করে বুঝল? মনে হল, (জীবনে ওই এক বারই), এই মানুষের ছা-টাকে একটা চুম দিয়ে আসি। জানতাম, অনেক দূর যাবে। জানতাম, এই শিক্ষা ওর জীবনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুঁজি হবে। জানতাম না, তোরা কেউ এক বর্ণও তার কাছ থেকে নিবিনি। উল্টে, হড়বড়িয়ে, এ ওকে মাড়িয়ে, কনুই গুঁতিয়ে শুধু 'দাও দাও' বলে হ্যাহ্যাল্যাল্যা করে ছুটবি, এক্ষুনি চাই, আরও চাই, না অপেক্ষা করব না, উঁহু ধৈর্য ধরব না, বলে উঠতেপড়তে নাকেমুখে শুধু লোভের আর অশান্তির কালো ছাপ নিয়ে হুমড়ি খাবি, তারপর কাঁড়ি কাঁড়ি স্ট্রেস-ট্যাবলেট গিলবি ডিনারের আগে।

মাইরি, তোদের এত চুলকুনি কীসের রে? শালা, সিনেমা হলের এক্‌জিট-এর দিকেও এমন করে ছুটিস যেন প্রত্যেকের পায়খানা চেপেছে! চ্যাঙাব্যাঙাদের দেখবি, সারা দিন চক্কর কাটছে, এই ব্যান্ড নিয়ে বেড়াল চান করাতে গেল। আরে, প্রফেসর কি কিতকিত খ্যালে? আর তপস্যারত ঋষি তো একেবারে স্ট্যাটিক। আমাদের দেখে শেখ। চরৈবেতি বা চড়ুইভাতির চক্করে যাসনি বাপ, বারান্দায় দু'দণ্ড সুস্থির হয়ে বোস। কলিগকে হিংসে কাল করবি, আজ এট্টু তাকিয়ে থাক। চুপ। তারপর ঝিমো। চার দিন ছুটি নিয়ে শুয়ে থাক। খোল থেকে বেরোবিনি। আস্তে আস্তে দেখবি, ঠিক দেখবি, কানে কী বাজছে। যে থিম-মিউজিক দিয়েছে বেঁধে বিশ্বতানে, তারই ছেঁড়া পিস। অপেক্ষা কর, পুরোটা আসবে। 'ডু ইট নাউ'কে মার নাতি। ঈশপম্যান আমাদের 'স্লো বাট

স্টেডি টুকু ধরেছিলেন, পরে গুলিয়ে ফেলেছেন। 'উইন্‌স দ্য রেস' কী রে, রেসে আমরা দৌড়ুব কেন? ওসব ফাঁপা খরগোশের কাজ। আমরা ওয়াক-ওভার দিয়ে, মনে মনে হাসব। এলিয়ে বসে থাকব। অলস মস্তিষ্ক হল ঈশ্বরের ফ্যাক্টরি। তাতে দিনরাত জ্ঞান জ্বাল দেওয়া হয়, আনরঙা চিন্তা নকশা তোলে, কল্পনার উড়াল বাজপাখির চেয়ে উপর যায়, বারবার ছেনে তথ্য থেকে সত্যের শাঁসটুকু ধলা ফকফকা হয়ে বেরিয়ে আসে। এ লেখা পড়ছিস যখন, আমি মরেছি নিয্যস। বড়দাদুর এই কথাটুকু তোদের উইল করে দিয়ে গেলাম বাপ, চুপ হ। কাজ করে সময় নষ্ট করিসনি। তোদের জন্য এই গ্রহে আনন্দের পাত পড়ছে ডেলি। বুফে। পেট ভরে যদৃচ্ছ খা, আর থিতু হয়ে তার সোয়াদগুলো মনে মনে বুনে চল। ব্যস, তরে যাবি। কাছিমবাপের দিব্যি।

২৬ মার্চ, ২০০৬

রবিবাসরীয়

গুরুচণ্ডালিকা

উত্তীয় ॥ গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি রং ফরসা
রাশি রাশি ভারা ভারা
নারী নিয়ে গেল কারা
আমি একা গোবেচারা ভয়তরসা
এবারে ধরিতে হবে গাঁজা-চরসা।

শ্যামা ॥ উফ, দিনরাত এর এই হিদ্ হিদ্ হিদিক্কারে আমার পাঁজঞ্জুরিতে তিড়িতঙ্ক লাগে। কত কায়দা করে ব্যাটাকে মার্ডার করালুম, তা এখন মরিয়া প্রমাণ করিছে যে মরে নাই। যাকগে, গানটা প্র্যাকটিস করি।

(গান) আধেক আঁকা আধেক বাঁকা
আধেক মায়ারঙ্গ ঢাকা
ফিগারখানি ঘ্যামা
আমার নাম শ্যামা
উত্তীয়কে ফাঁসিয়ে দিয়ে বজ্রসেনের টুঁটি
যেই ধরেছি, নীতির বশে পলায় ব্যাটা ছুটি।

অমিত রায় ॥ হাহা, ছোট বজ্র পড়ে অ আ
শেখেনি সে বড় হওয়া।

(পা টিপিয়া টিপিয়া বজ্রসেনের প্রবেশ)

বজ্র ॥ ইয়ে, শ্যামুয়া, আমাদের যে দিন গেছে—

শ্যামা ॥ হ্যাঁ, ঢং কোরো না, একেবারেই, সম্পূর্ণ, টোট্যালি গেছে।

বজ্র ॥ কিন্তু আমি যে জানতাম রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে!

শ্যামা ॥ মনেরে আজ ক'বি রে
ফিজিক্সের উপমা দিয়া
ভোলানো যায় ভবীরে?

অমিত ॥ একজ্যাক্টলি। এই ম্যাজিক-ফিজিক বন্দনায় চাই নিবারণ চক্কোত্তির কলম। তিনি বৈষ্ণব পদাবলির ঠাটে লিখবেন:

শ্যামা রে, মরণ তোঁহারই নাম
মেঘবরণ তুঝ, মেঘ অধরপুট
কতগুলো দুল বাবা, নাকে কানে কত ফুটো
ডিস্কো নাচত রিঝ, তা তা থৈ হৃদি টুট'
অনুখন বিসরিছ কাম।

গোরা ॥ বহুক্ষণ ধরে দেখছি পারভার্টযুগল
ছিঁড়েখুঁড়ে এঁটো করছে জ্ঞানবৃক্ষফল!
অবিরল চেটে খাচ্ছে লিবরল্ সুধা
কড়া শাস্তি প্রয়োজন। কী বলো, রঘুদা?

রঘুপতি ॥ শ্রান্ত নীল মেঘছায়া, শান্ত বনস্থলী
এই বেলা মেয়েটিরে দিয়ে দিই বলি!

অমিত ॥ দ্যাখো শ্যামা, আমি না ওই দিকটায় আছি। এঁয়াদের যা টকটকে আঁখি, আমি চুপ করে ওই কচুবনে লুকিয়ে থাকি।

শ্যামা ॥ ওরে ভয় নাই, নাই নীতিভীতিবন্ধন
ওরে পাপ নাই, পাপ শুধু মিছে ছলনা
ওরে শাপ নাই, নাই প্যাঁচামুখো ক্রন্দন
নিতি-নব-প্রীতি-রীতি-গীতি গাহি ললনা।

গোরা ॥ আরে, এর কথা শুনলে তো রসাতলে যাবে সমাজ! কেউ নেবে না পৈতে, কেউ পড়বে না নমাজ। সবাই মিলে মার, মার, অ্যাটাক—

(সন্দীপ ও দলবলের বিভিন্ন বৃক্ষ হইতে লম্ফ দিয়া অবতরণ)

সন্দীপ ॥ কে কাকে মারে দেখাচ্ছি। অমূল্য ওদিকটা কভার কর, অখিল, কঙ্কালীতলার কাছটা গার্ড দাও। আস্পদ্দা কম নয়, স্বাধীনতার গেরিলাদের সামনে ভাল ফিগারের মা-বোনের গায়ে হাত তোলা! এই লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে আইরিশম্যান, এটাকে আগে বাঁধ। ব্যাটাকে বিদেশি বস্ত্রের সঙ্গেই পোড়াব। দড়িগাছা কার কাছে রে, ওরে বেলো—

বাল্মীকি ॥ আমি কিন্তু রঘুদাকে কিছু বলতে পারব না, কালীতুতো ভাই।

রঘু ॥ বলো হো হো, শ্যামা মায়ের জয়!

কোরাস ॥ জয়জয়জয়জয়জয়জয়!

দুর্যোধন ॥ কে লভিল জয় হেথা? জয়ী শুধু আমি! জয়, জয় চেয়েছিনু—

বাল্মীকি ॥ গোস্বামী চাও নাই?

দুর্যো ॥ অ্যাঁ?

সন্দীপ ॥ সাইলে—ন্স! কী রে, বাঁধ।

বাল্মীকি ॥ বাঁধিব কী, নিজেই কেমন লুজ হইয়া গেছি, হায় ভিতরে কোন গ্রন্থি খসিল গো, এ কী ডিপ্রেশন হৃদয়ে বসিল গো।

(সহসা) মা সন্দীপ প্রতিষ্ঠাং
ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ রিফর্মশিবিরাদেকমবধীঃ সমাজমোহিতম্।
কী বলিনু আমি! এ কী সুললিত বাণী রে!
কিছুটা সুগম্ভীর, বাকিটা কী ফানি রে!

সন্দীপ ॥ আরে ধুত্তোর। পাগলের গুষ্টি। চলো শ্যামা ওই দিকটায় যাই।

শ্যামা ॥ আপনি কী হ্যান্ডসাম। আমি কিন্তু খুব খারাপ, জানেন? অন্যায়ের আখড়া।

সন্দীপ ॥ মেয়েরা ঝড়ের মতো অন্যায় করতে পারে, সে অন্যায় ভয়ঙ্কর সুন্দর। যে আগুন ঘরকে পোড়ায়, বাহিরকে জ্বালায়, তুমি সেই আগুনের সুন্দরী দেবতা। তুমি আমায় নষ্ট হবার দুর্জয় তেজ দাও।

শ্যামা ॥ কী অপূর্ব।

সন্দীপ ॥ শুধু অপূর্ব নয়, দেশাত্মবোধক। এবার তোমায় কীর'ম প্রোপোজ করব দ্যাখো, এতেও দেশনেতার নাম আছে।

(আবৃত্তি) মনে করো, যেন অনেক ঘুরে
তোমায় নিয়ে যাচ্ছি ব্যারাকপুরে
তুমি যাচ্ছ মার্সিডিজে চড়ে
শ্যামবাজারে পাঁচমাথারই মোড়ে
নেতাজী তাঁর থিতু ঘোড়ার 'পরে
তোমার পানে মিটমিটিয়ে হাসে
রাস্তা থেকে হিংসে উড়ে উড়ে
লাগছে তব রূপের আশেপাশে।

অমল ॥ মার্সিডিজ কেমন দেখতে হয়? শ্যামবাজার কোনখানে? থিতু ঘোড়া পা চুলকোয় কী করে? অঁ সন্দীপদাঁ, আমায় কবেঁ ব্যারাকপুর নিয়ে যাবেঁ? আমি ভাল হবার পরের দিনেই তোঁ?

সন্দীপ ॥ কী আপদ!

অমলের পিসেমশায় ॥ টার্মিনাল রোগী, তার এত কৌতূহল!

বুক ভর্তি কুইজ কনটেস্ট, চোখ ভর্তি জল
কোথায় যাচ্ছ কেন যাচ্ছ কোন রাজ্যে বাড়ি
মাইনে পাচ্ছ উপরি খাচ্ছ রাতে সাঁটছ তাড়ি
কথা ফাঁদবে নাকে কাঁদবে ছাড়বে না কক্ষনো
জ্যান্ত একটি গায়ে সাঁটা বাচ্চা পৃষ্ঠব্রণ!

অমল ॥ আঁমার কবে ব্রণ হঁবে? ওপাড়ার ব্রণওলা বিশেদা কেমন রোজ রাত্রে টলতে টলতে ফেরার সময় মাথা তুলে দেখতে পায় লাল বাড়ির বারান্দায় টবের গাছের ছায়ার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সিড়িঙ্গে হাবিদি, আর কোথাও এতটুকু হাওয়া নেই, যেন একটা রাক্ষস শ্বাস বন্ধ করে আলজিভ বের করে গুমে গুমে মরছে, আর দূরে চায়ের দোকানে বিবিধ ভারতী বন্ধ হয়ে ঝাঁপ পড়ে গেল, যেন একটা ক্লান্ত মকর বুজিয়ে নিলে তার ক্ষুধার্ত চোয়াল, আর নস্করদের বাড়ির অ্যালসেশিয়ান শুধু ঘাউঘাউ করে ডেকে চলেছে তারে মেলে দেওয়া একলা শাড়ির দিকে চেয়ে, যেন মরুভূমির মানুষ তপ্ত বালি মুঠো করে মরীচিকার দিকে টেনে নিচ্ছে তৃষিত শরীরের হামাগুড়ি, সেই মন-কেমন আমার ঘুমের ভেতর দিয়ে বুকে এসে লাগে।

অমিত ॥ ওঃ, কী পেছনপাকা ছেলে বলো তো? কচুবনের মশাগুলোও যেন এর বুকনির চেয়ে ছিল ভাল!

ঠাকুরদা ॥ হাহা, বীরপুরুষের শিভালরি যে গায়ে বেশ ডুমো ডুমো হয়ে ফুটে বেরিয়েছে, এবার গেছোবাবার কাছে একটি ট্যানা চাও, মুখ না মুছে বেহাত সঙ্গিনীটিকে মুখ দেখাবে কী করে?

অমিত ॥ বেশি ফড়ফড়িও না, মাইকেল জ্যাকসনের মতো বাচ্চার দল নিয়ে ঘোরো, লজ্জা নেই?

ঠাকুরদা ॥ নিঠুর হে, এই বলেছ ভাল। তোমার দেওয়া চার-অক্ষরে হৃদয়টি চমকাল। আরও আরও বলো, সে বেদনদানে বুকের তার হবে টাইট করে বাঁধা, তোমরা মিড় দেবে নিষ্ঠুর করে, তাঁর বজ্রচরণ বাজবে আমার দুখের 'পরে।

অমিত ॥ ওরে থামো হে থামো। ঘাট হয়েছে। বুড়ো বয়সে সং সেজেছ কেন? উষ্ণীষ, মালা, হাতে বাঁশি, এসব কী?

ঠাকুরদা ॥ আজ যে আমার রাজা আসবেন!

অমল ॥ ওগো 'গো অ্যাজ ইউ লাইক'-এর টেকো লোক, রাজা কি আমার জন্য এইটুকুনি খামে ছোট্ট চিঠি পাঠিয়েছেন?

ঠাকুরদা ॥ না বাবা, তাঁর ই-মেল তো আসে আকাশের রঙে, বাতাসের লীলায়।

অমল ॥ ফের বাজে বকছে, চিঠি আনেনি, ভ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ! (*সবেগে রোদন*)

ঠাকুরদা ॥ অমন করে না ভাই, তোমায় দেখে আমার বুকের মধ্যেটা উথলে উঠছে!

রোগীর বন্ধু ॥ আর আমার পুনর্বার ভ্রাতৃশোক উপস্থিত হচ্ছে। মরবার সময় তার ঠিক তোর মতো চেহারা হয়ে এসেছিল—

অমল ॥ অ্যাঁ!

রোগীর বন্ধু ॥ হ্যাঁ রে ছোঁড়া, ওই রকম তার চোখ বসে গিয়েছিল, গালের মাংস ঝুলে পড়েছিল, হাত-পা সরু হয়ে গিয়েছিল, ঠোঁট সাদা, চোখের চামড়া হলদে—

অমল ॥ পিসে, আমার এমন চেহারা হয়েছে? তোমরা তো কেউ বলোনি! (*ঝড়ের মতো ছুটিয়া চারুলতার প্রবেশ*)

চারু ॥ ঠাকুরপো, তোমার এ কী চেহারা হয়েছে ঠাকুরপো! বিরহে যে বেঁটে, ছোট, ফ্যাকাশে, মরকুটে হয়ে গেছ গো!

(*পিছন পিছন সবেগে ভূপতি*)

ভূপ ॥ আরে আরে এ-অমল সে-অমল নয়। কিছু মনে করবেন না দাদারা। মানিকবাবু শেষ সিনে হাত বাড়িয়ে স্টিল করে দিলেন, সেই থেকে স্পন্ডেলাইটিস বাড়তে বাড়তে ব্রেনে অ্যাফেক্ট করেছে। এখন যেখানে অমল দেখছে সেখানেই...ওগো এ একটা বাচ্চা ছেলে, কী মুশকিল।

ঠাকুরদা ॥ আমার রাজা স্পন্ডিব্যথার বৈদ্য পাঠিয়ে দেবেন, ভয় নেই মা।

সন্দীপ ॥ আপনার রাজা কি ব্রিটিশ না কি? অল-পাওয়ারফুল ইমেজ?

শ্যামা ॥ রাজা হেভি হ্যান্ডসাম, না?

ঠাকুরদা ॥ ও কথা বোলো না, রানি রাতের পর রাত লোডশেডিং-এ তাঁকে দেখতে না পেয়ে একেবারে অতিষ্ঠ হয়েছিলেন। শেষে দেখে বুঝলেন, সুন্দর বললে তাঁকে ছোট করা হয়।

শ্যামা ॥ তার মানে? রাজা কি কিম্ভূত?
অমিত ॥ সে কি উত্তরাধুনিক?
(গান গাহিতে গাহিতে রাজার প্রবেশ)
রাজা ॥ আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালবাসায় ভোলাব
আমি গান দিয়ে দ্বার খুলব না গো
রিমোট কন্ট্রোল ঝোলাব।
শ্যামা ॥ অ। এর ফিলজফি না আউড়ে উপায় কী? এ তো আগলি।
রাজা ॥ কী বললি রে পাগলি!
অমল ॥ রাঁজা দেখতে পাঁচ্ছি না, ভিড় সরাঁও!
রাজা ॥ এ সর্বক্ষণ নাকে কাঁদে কেন, মেয়েদের মতন?
(যোদ্ধবেশে কুরূপা চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)
চিত্রা ॥ মেয়েরা কাঁদুনে বলে গাল পাড়ছ কে হে?
একটি তীর ফুঁড়ে দেব তব কেঁদো দেহে?
দেখি তুমি কাঁদো কি না।
রাজা ॥ দ্যাও বাপু ক্ষমা
কে হে তুমি দুর্বিনীতা, ব্যাটাছেলেসমা?
চিত্রা ॥ নহি মাতা নহি কন্যা
নহি বধূ সুন্দরী রূপসী
খাটিব মজুরসম,
বিশ দিন রহিব উপোসী
তুলিব সিনেমানাট্য,
অবিশ্রান্ত স্পেসে যাব উড়ি
এ বিভঙ্গে সাদা নার্স,
অন্য রঙ্গে প্রমত্ত খেলুড়ি
পুরুষে যা কিছু পারে,
একটি আধটি কর্ম ছাড়া সবই
কিছু কাঠি ঊর্ধ্বে পারি,
তবু দেখি দুর্বলতা-ছবি
'নারী' তকমা বিভূষিত,
কেন ড্যাকরা, বিজেপি-সমান?

অমিত ॥ মাসিমা, হাই প্রেসার,
নারীবাদ সামান্য কমান।

রাজা ॥ পুরুষের কাছে ভদ্রতার দাবি করতে পারে সেই মেয়েরাই, যারা মেয়েদের স্বভাব ছাড়েনি। মেয়েরা বাঁচে পুরুষের চোখের আলোয় মুখের স্তবে। আমরা বাঁচি ঈশ্বরের প্রসাদে।

চিত্রা ॥ উঁহু, শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি পুরুষ
নারীও গড়েছে তোরে কল্পনার বুরুশ
কৌশলে বুলায়ে। তব নেয়াপাতি ভুঁড়ি
ব্রীড়ানতনেত্রপাতে স্রেফ গেছে উড়ি
'শালপ্রাংশু মহাভুজ' বিহারিছ শ্লোকে
একটি ললিত চড়ে সিধে করব তোকে!

রাজা ॥ ছ্যা ছ্যা, চিরকাল জেনে এনু মেয়ে হবে সব
স্পর্শক্লেশসকাতর শিরীষপেলব
অরুণলাবণ্যলেখাবৃততনুমন
সে বদলে এ যে দেখি সাক্ষাৎ ফুলন!
নাঃ, এখানে আর একদণ্ড নয়। শ্যামা, ঘোড়ায় উঠে আয়।

চিত্রা ॥ কেন কেন, আমি কম কীসে? ও তো কুষ্টি কালো।

শ্যামা ॥ কালো? তা সে যতই কালো হোক
সেক্সি বলে চেনে গাঁয়ের লোক।

রাজা ॥ ওই দেখ শোভাযাত্রা করে চলেছে মনপাংশুর দল। নারীর হাতে মরে ওরা বেঁচেছে। ওহে টম-বয়, সজারু-শিকার নয়, পুরুষ নিয়ে গেন্ডুয়া খেলাই নারীর প্রকৃত মৃগয়া। শোনো ওদের গান—

মনপাংশুর দল (শোভনলাল, বিহারী, নিখিলেশ, শ্রীবিলাস, উত্তীয়, কিশোর) ॥
আমরা হলাম উদাস-চাওয়া
লেঙ্গি-খাওয়ার দল
মোদের আসা-যাওয়া শূন্য হাওয়া
নেইকো ফলাফল
মোরা কী দোষ করেছি বল
সত্যি করে বল, আমায় করিসনে মা ছল
আমরা কেন তোদের মেলায়
পাইনে দিতে স্টল।

চিত্রা ॥ উফ, পুরুষ চেয়েছিনু, মেলাংকলিক পেডেন্ডো চাইনি। প্রেম নয়, এরা জানে হাব্বারফ্লুয়াস ইনফ্যাচুফুয়েশন।

বিশুপাগল ॥ মন খারাপ করিসনি, পাংশুর দল। নারীর দাঁতের শুরুতে হাসি, অন্তিমে কামড়। ওদের কাছে তোরা মানুষই না, হয়তো ৪৭ফ, কিংবা ৬৯ঙ।

উত্তীয় ॥ আপনি কী করে জানলেন?

বিশুপাগল ॥ আমায় যে বিশ্বসংসারের সব জানতেই হবে ভাই, আমি যে পাগলা। সকালে কোদাল চালাতে হবে, রাত্রে ফাটাফাটি গান লিখতে হবে, বিকেলটা যাবে অনবদ্য উপমার ওপর, সন্ধেবেলা আঁকাবাঁকা কথায় সিস্টেমের প্রতি রেজিস্ট্যান্স গড়ে দিতে হবে মদের আসরে। এক গ্লাস জল খাওয়ার সময় নেই ভাই।

প্রকৃতি ॥ জল চাই তো শুধু গাল ফুলিয়ে গমগমে গলায় দুবার 'জলো দাও' বলুন। সুর লাগলে ভাল।

রাজপুত্র, সদাগর ॥ হাহাহা, খামখা জলকে 'জলো' বলবে কেন?

ছক্কা ॥ কেন আবার কী? নিয়ম। জানো না, দাঁত চেপে চোখ ঘুরিয়ে জলকে 'জলো' বললে তবে জলের মহিমে বোঝা যায়?

পাঞ্জা ॥ শুধু তাই নয়, 'দিন'কে বলবে 'দিনো', 'এক'কে বলবে 'অ্যাকো', মনকে ডাকবে 'মোনো'।

রাজপুত্র ॥ আর স্টিরিও?

সদাগর ॥ হ্যাহ্যাহিহিহোহো!

ছক্কা ॥ এ কী ব্যাপার, লজ্জা নেই তোমাদের? হাসি! তোমাদের উৎপত্তি কোথা থেকে?

রাজপুত্র ॥ পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টির গোড়াতেই তেজ ধুনতে যেই কুলোয় করে লংকা ঝাড়ছেন, একটা লোহিত গুঁড়ো গেল তাঁর গলায় ঢুকে। তিনি জেনারেটরের মতো আওয়াজ করে কেশে ফেললেন, 'খক্কর'! সেই বিশ্ব-দাপানি কাশি থেকেই আমাদের উৎপত্তি। আদিকবির মন্ত্রটা একবার ধরো তো ভাই!

(গান) খক্কর
নেবে না কি টক্কর?
ধরি চেপে কলার
কেড়ে নিই ডলার
মুখে গুঁজে দিই লোহালক্কড়!

মেহের আলি ॥ সব ঝুট হ্যায়—সব ঝুট হ্যায়—তফাৎ যাও!
রাজপুত্র ॥ কী, আমাদের আদিকবির মন্ত্র ঝুট হ্যায়? নেবে না কি টক্কর?
মেহের আলি ॥ আরে না না, ইয়ে সব বকওয়াস ছোড়কে ব্রিগেড চলো, সেখানে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা আসছেন বক্তৃতা দিতে। সব কো বুলায়া হ্যায়।
অমল ॥ সত্যি! কে আসছেন? রবিদাদু?
বিশুপাগল ॥ এই রে, আমাকে ক্যাডার রাখবেন মনে হয়।
চারু ॥ আমার স্পন্ডি সারিয়ে দেবেন নিশ্চয়।
রঘু ॥ নির্ঘাৎ বলি চালু করবেন ফের।
বাল্মীকি ॥ আমি পাব পাবলিশার।
বজ্রসেন ॥ (কিড়মিড়াইয়া) এবার ফুলপ্রুফ মেনোগ্যামি এবং হাতে হাতে আদায়!

২

(বিপ্রদাস এসরাজ লইয়া গান করিতেছে)

বিপ্রদাস ॥ প্যানর প্যানর প্যানর প্যানর
ব্যথার কুসুম হয়ে উঠুক ফুটি
মম ঘ্যানর ঘ্যানর।

কুমু ॥ দাদা, তোমার বার্লিতে নেবুর রস দেবে না?
কালুদা ॥ তোমার দাদার বার্লির প্রয়োজন ফুরিয়েচে দিদি। ব্যথার গান গাইছেন অভ্যাসের বশে, যেমন খোঁড়া ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠে ভাবে, তার 'নেই-পা'টা চুলকোচ্ছে বুঝি। সমাহিত ঝিলের জল আর উচ্ছ্বসিত সাগরের ঢেউয়ের যেমন জাত এক কিন্তু ধাত আলাদা, ওঁর সেই বার্লি খাওয়া আদি অকৃত্রিম জিভটাই আজ চায় শেষ পাতে লালচে আলুর দম।
কুমু ॥ বলে কী দাদা!
বিপ্র ॥ হ্যাঁ কুমু, জগদীশ্বরের কৃপায় আজ সকালে ডজনখানেক লুচি সাঁটানো গেল। ইতিউতি চেয়ে কিছু কুলপিও মেরে দিলুম। ততক্ষণে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি শুরু হয়েচে। সার্সিটায় নামছে বড় বড় ফোঁটা, যেন প্রিয়ার মসৃণ কপোলে মানভঙ্গের শুভসূচনা। রগরগে কালিয়াটুকু কোলে নিয়ে আস্তে আস্তে জানলার কাছটিতে এসে বসা গেল।
কালুদা ॥ রগরগানিতে কালিয়ার দোসরটির কথা বললে না?
বিপ্র ॥ ও হ্যাঁ, রাগ করতে পাবিনে বোন, স্বাস্থ্যবতী দেখে এক বিধবা অসহায়

মেয়েকে বাড়িতে এনে রেখেচি। সিডাক্‌টিভ বললেও অত্যুক্তি হবে না। বিনোদ, বিনু!

(বিনোদিনীর প্রবেশ)

কুমু ॥ এ কী এ! এ যে ঐশ্বর্য রাই! ওরে বাস রে, যে দিকেই যাও, ওর দিকে না তাকিয়ে থাকার জো নেই। এ যেন বিধাতার এক বিকট চিৎকার! তা ভাই চোখের বালি, আমার দাদাকে এমন নিঃশেষে লুটে নিলে?

বিনোদ ॥ লুটতে হয়নি ভাই, যিনি বিকিয়ে দেবার পণ করে পসরা সাজিয়ে বসে আছেন, তাঁকে গ্রহণ করেই ঋণী করতে হয়। হাল ছেড়ে দেওয়া মিনমিনে ভাব দেখেই বুঝেছি, হয় সালফারের রোগ, নয় নিরুদ্ধ ভোগ। যে বাতাস ছিল দীর্ঘশ্বাসে ফুসকায়িত, তাকে অমনি অন্দরের অলিন্দে বইয়ে দিতেই এক ঝাপটায় তোমাদের মায়ের ভারী সাতনরী হার এসে পড়লে আমার পায়ের কাছটিতে।

কুমু ॥ দাদা, তুমি এই রাক্কুসিকে উপহার দিয়েছ মায়ের হার-দুলের সেট! সলমন তোমায় মেরে পাট করে দেবে।

বিনোদ ॥ বিবেকও।

বিপ্র ॥ ওদের মারের মুখের ওপর দিয়েই রোজ তোমাকে দুল এনে দেব।

অক্ষয় ॥ ব্রাভো, কী দুঃসহ স্পর্ধা! এই ডিটারমিনেশন থাকলে ক্যান্টার করে ফেলা যেত। অধিক বলব কী, অমন পরীর মতো শালীরা ফড়ফড় করে উড়ে বেড়ালে, আর আমি 'শালীবাহন' আখ্যা আদায় করতে ধড়ফড় করে মলুম!

শশাঙ্ক ॥ সে কী হে! আমার তো দুই বোন নিয়ে লোপালুপি। বউ ছিল শয্যাশায়ী, শালী ছিল ক্ষণস্থায়ী। ব্যস, এক কক্ষে বোন লয়ে, অন্য কক্ষে দিদি, দুজনারে বাঁটি দিনু ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি হৃদি!

ফটিক ॥ উরেব্বাস, শশাদা, এ-কূল ও-কূল দু'কূল ভাসিয়ে ফুর্তি! ইদিকে আমাদের তো এক বাঁও মেলে না, দুই বাঁও মেলে-এ-এ না!

শশাঙ্ক ॥ অ্যাই, একটি ঝাড়ব, মারের সাগর পাড়ি দিয়ে বিশ বাঁও জলে গিয়ে পড়বি।

ফটিক ॥ খেয়েচে, আমার ছুটি হয়েছে মা, আমি বাড়ি যাচ্ছি।

কুমু ॥ ছি ছি, এরা তো দীপক রাগিণীর উপর বাসনধোয়া জল ঢেলে দিলে। আমি কোথায় যাই?

কাবুলিওয়ালা ॥ খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি যাবিস?

(ছুটিতে ছুটিতে নন্দিনীর প্রবেশ)

নন্দিনী ॥ রঞ্জন! তোমরা আমার রঞ্জনকে কেউ দেখেছ?

কাবুলি ॥ হামি রঞ্জনকে মারবে।

নন্দিন ॥ ও কী, কাবলে আমার, কেন অমনধারা ভয় দেখাচ্ছ? তোমার দাড়ি তো মনে হচ্ছে ফল্‌স। আর ওই ঝুলিতে কী?

কাবুলি ॥ হাঁতি।

(নন্দিনী জালে ধাক্কা দেয়)

নন্দিন ॥ ওগো শুনছ, হাতি দেখবে এসো।

নেপথ্যে রাজা ॥ যাও যাও, বিরক্ত কোরো না। ওঃ, বকে বকে হাড় জ্বালিয়ে দিলে! তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না।

অক্ষয় ॥ (স্বগত) আরে, গলা কী বিচিত্র। হট করে মনে হয়: শম্ভু মিত্র।

নন্দিন ॥ আজ আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি। চলো তুমি আমি বেড়িয়ে আসি।

রাজা ॥ হ্যাঁ, আর সোনাগুলো তৈরি করবে তোমার বাবা।

নন্দিন ॥ ও কী ও! বাপ তুলছ কেন?

(পিস্তলসহ এলা, অতীন, উপেনের প্রবেশ)

এলা ॥ এবার হাত তুলবে। হ্যান্ডস আপ! দেশলক্ষ্মী তাঁর বরাদ্দ নেবেন। সোজা হাতে কিংবা বাঁকা পথে সন্তানের সাবস্ক্রিপশন পৌঁছবেই তাঁর গোড়ালির কাছটিতে। অস্ত্র, সত্বর কেড়ে নাও সকলের জিনিসপত্তর। কাকাবাবুর যেমন সস্ত্র, আমার তেমনি অস্ত্র। নিঃসঙ্কোচে ওকে সব দেবেন।

উপেন ॥ শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, বাবুরা লইল কেড়ে। এবার খেপেছে প্রোলেতারিয়েত, হা রে রে রে রে রে!

এলা ॥ আর ওই জালের ওপাশে কে? মানুষ না টেপ-রেকর্ডার? অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে তো চলবে না বস।

রাজা ॥ প্রিয়ে, না দেখার নিবিড় মিলনকে নষ্ট কোরো না।

উপেন ॥ হে আঁধার ঘরের স্যর, শুনেছেন তো আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ অতীব—

রাজা ॥ তবু টাকা নাহি দিব।

এলা ॥ অ্যাঃ, ভিখারী আমার ভিখারী! দেবে না মানে? আমরা কলকাতা ট্যুরে যাব। মনে আছে অস্ত্র?

অস্ত্র ॥ নেই আবার? সায়েন্স সিটির আলোয় রাঙা মায়াবী বাইপাস, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার...আরিব্বাস!

এলা ॥ কী হল?

অন্তু ॥ (বিনোদিনীকে দেখিয়া) এ কী দেখতে রে! যে ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারী নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে, এর দেহ যে সেই সুঠাম চোদ্দো মাত্রায় বাঁধা।

এলা ॥ অন্তু! সেবার চট্টগ্রামেও এর'ম হয়েছিল! তুমি কী চাও?

অন্তু ॥ সিনেমায় গিয়ে যৌনতা খুঁজি
চাকরিতে খুঁজি মাইনা
ডান দেখে ভাবি বামে যাওয়া ভাল,
বামে গিয়ে ফিরি ডাইনা
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

বিনোদ ॥ ওঃ, কত ছেলে অভিশাপের মতো আমার পিছনে ফিরেছে, কিন্তু তুমি এলে যেন নগ্ন আগুন, সৃষ্টিকর্তার তুমি অট্টহাসি, তুমি ছাড়া পৃথিবী ন্যাড়া মাথার মতো শূন্য।

এলা ॥ সাবধান অন্তু, ও কিন্তু তোমার অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছে।

অন্তু ॥ আহা, সে নিক। দেখেছ, এর বাঁ দিকটাও কী ফোটোজেনিক! একেবারে ভোঁ ধরে যাচ্ছে। এলা, এলী, এলে, নাহয় যাব জেলে। কিন্তু আমি একে ছাড়ছিনে।

এলা ॥ তার মানে? আমার কী হবে?

অন্তু ॥ (পিস্তল তাক করিয়া) তোমার ঘুমের ওষুধ আছে আমার কাছে।

এলা ॥ অ্যাঁ! অন্তু, তুমি কি জন্তু!

(সখীগণের প্রবেশ, গান ও নৃত্য)

কোরাস ॥ ডাকাতের বিদ্যা করেছিল শিক্ষা
ছিঁচকে চোরের লোভ করেনি সমীক্ষা
খাইবে গুলি
ফট করি ফাটি যাবে কোমল খুলি।

মেহের আলি ॥ এইয়ো! ব্রিগেড কা টাইম হুয়া কি নেহি?

বিনোদ ॥ ওহো, চলো চলো সব। কী গো বিপ্র, আমার সঙ্গে যাবে, না এসরাজ নিয়ে ঠোঁট ফোলাবে?

বিপ্র ॥ যাব সোনা, চলে যাব, কিছু শুধাব না
না করি সংশয় কিছু, না করি ভাবনা

দেবী, তুমি মোর প্রিয়া। সম্মোহিত হিয়া
দিবারাত্র বলে শুধু, 'ম্যায়নে পেয়ার কিয়া'।

৩

(ব্রিগেড। অনির্বচনীয় ভিড়। অনর্গল হিস্টিরিয়া)

উদ্বোধনী সঙ্গীত ॥ সদন তোমার আঁতেলভরা,
বদনখানি ম্লান
মোদের ফেলে কোথায় গেলে
টেগোরসন্তান
(আজ) রাতের পাখি গায় একাকী
জীবনমুখী গান।

(রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় প্রবৃত্ত হওন, কিন্তু মাইকের সুতীব্র প্যাঁ প্যাঁ করণ)

সকলে ॥ সাউন্ডের লোককে পুঁতে ফ্যাল! গুরুদে—ব, শুনতে পাচ্ছি না, কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না।

সন্ন্যাসী ॥ উনি বোধহয় বলছেন, অসতো মা সদ্‌গময়।

রাজনীতিবিদ ॥ না না, উনি বলছেন রবীন্দ্রনাথের বিকল্প হতে পারেন শুধু এক উন্নততর রবীন্দ্রনাথ।

পোস্টমডার্ন ॥ আরে না, উনি বলছেন, তোমার থিওরি যারে দাও, তারে বুঝিবারে দাও শকতি।

(সহসা মাইক ঠিক হওন। পিন-পতন স্তব্ধতা)

রবীন্দ্রনাথ ॥ বলেছিলুম,
মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ
কিন্তু মানুষ কী করছে রে বাপ!

(ললাটে করাঘাত, পতন ও মূর্ছা)

৪ মে, ২০০৩

দলে দলে যোগ দিন

ঘোষক : বন্ধুগণ ক্যাওস করবেন না, আপনাদের পোচণ্ড পোতিবাদ আমাদের সম্পদ, ওই বাঁ দিকটায় এক্ষুনি এসে পৌঁছল হাল্লা থেকে উটের মিছিল, আপনাদের চিৎকারে কিম্ভূত বন্ধুরা ঘাবড়ে যাচ্ছে কী ডাকছে রে ভাই ঘ্যাঁকো ঘ্যাঁকো, অ্যাকাডেমির সামনে জায়গা ছাড়ুন, ওখানটায় মহাপ্রস্থানের মিছিলে দ্রৌপদী পড়বেন, পার্ক স্ট্রিটের মোড় থেকে ভেরীর সিগন্যাল, তার মানে লেনিন-স্তালিনের নেতৃত্বে ছ'মাস ধরে সাইবেরিয়া থেকে হাঁটুন্তি কমরেডদের মেহনতি জুতোর সমষ্টিগত ফোসকায় দিগন্ত ছলোছলো, এই এই সব্বোনাশ চাষিভাই পিঁপড়ে মারবেন না উনি আমাদের কমরেড, সমাবেশে এসেছেন!

চাষিভাই : মারবে না মানে, পাছায় কামড়াস্‌সে!

ইনচার্জ : আরে! আপনি মিছিল ব্লক করে দাঁড়িয়ে আছেন তো করবেন কী? জানেন ওঁদের মিছিল মোস্ট প্রাচীন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড?

পিঁপড়ে ১ : একেবারে দু'চোয়ালে নড়া চেপে ঝুলে পড়ব, শালা! আমাদের লিডারকে মেরে দিল! কমরেড, একস্ট্রা চিনি না দিলে কিন্তু উস্তম-খুস্তম হয়ে যাবে।

পিঁপড়ে ২ : তখন বুলেটপ্রুফ ধুতি পরেও পার পাবে না!

টিভি অ্যাঙ্কর : যত্ন করে শহিদ পিপীলিকার ক্লোজ নাও, জলদি।

ক্যামেরাম্যান : আঃ, চাষি, নিতম্ব নাড়াচ্ছেন কেন? আউট অব ফোকাস হয়ে যাচ্ছে যে!

চাষি : দাঁড়া দেখাচ্ছি! ও মজদুরভাই, উদ্ভট হাতুড়িটা নিয়ে এদিকে একবার আসেন তো!

দুর্যোধন : এটা হাতুড়ি নয় রে ব্যাটা, গদা! আর আমি মজুর না, দুর্যোধন।

অ্যাঙ্কর : আপনি মিছিলে গেছেন না কি কখনও?

দুর্যো : আরে আমরা একশোটা ভাই মিলে কোথাও গেলেই তো একটা মিছিল! নেমন্তন্নবাড়ি যেতাম, রথচলাচল স্টপ। তা ছাড়া পাঁচ-পাকা আসবে বউটাকে নিয়ে, ধপাধপ পড়বে, দেখতে এলাম।

জন হেনরি : এই হচ্ছে আসলি হাতুড়ি। কম্পিটিশন লড়বি না কি? চ, এখেন থেকে দর্জিপাড়া অবধি রেললাইন পুঁতে ফেলি!

দুর্যো : গাড়ল আর কাকে বলে। মিছিলে এসেছিস খাটতে? তার চেয়ে পাঁচ টাকার ভেলপুরি কেন, গাছের ছায়ায় বসে ক'দান পাশা খেলি। তুই হারলে তোর বউ আমার।

নারীবাদী : দামড়া গতরে একেবারে একশো মোমবাতির ছ্যাঁকা দিয়ে দেব, ড্যাকরা কোথাকার! বউ কি তোর লুডোর ঘুঁটি না কি?

জন হেনরি : হাহাহা, ই কী রে, জমজমে দুপুরবেলায় হাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে লাখ লাখ ফিমেল! জেলেপাড়ার সং বোধহয়।

দুর্যো : না কি নীলষষ্ঠী?

নারী : স্লাইটেস্ট সচেতনতা নেই, সাদা-কালো নির্বিশেষে! নারীদের প্রতি ভায়োলেন্সের বিরুদ্ধে মোমবাতি-মিছিল হয় জানিসনে?

জন হেনরি : খুব সাইন্টিফিক থিংকিং। মোমবাতি গলে গলে ফুরিয়ে গেলেই মিছিল শেষ, না?

নারী : জার্মেন গ্রিয়ের-এর দিব্যি, আজ পুরুষ মেরে হাত গন্ধ করবই। ভগিনীগণ, আগে গানটা হয়ে যাক।

গান : এমন বন্ধু আর কে আছে,
তোমার মতো সিস্টার
দিনে সেজে রাতকানা মোম হাতে দিই হানা
যেই ডেকেছেন মিনিস্টার

নারী : এবার আ-ক্র-ম-ণ, ই—ই—ক! তিন তলার সমান বাঁদর দাঁত ছিরকুটে হাসছে!

হনুমান : বাঁদর নয় রে ম্যাডাম, বজরংবলী! আমি আগে লং জাম্প দিয়ে চলে এলাম। সেতুবন্ধনের মিছিল এখন হোলি গ্যাঞ্জেস পেরোচ্ছে।

অ্যাঙ্কর : স্যর ছোট্ট করে একটা মাঙ্কি'জ আই ভিউ...

হনু : আরে ধুর। আগে আপনাদের নীলাভ এয়ারস্পেসে ফ্লাই করে কী মজা আসত। আনতাবড়ি প্লেন বগলদাবা করে কত জোক মেরেছি। এখন তো সব

প্লেন-টেন ফঙ্গবেনে। একটাকে চেপেছি কি চাপিনি, চার টুকরো হয়ে গেল। এখানে টেটভ্যাক কোথায় নেওয়া যাবে? ও দাদা—

ইনচার্জ : জানি না! খামখা বিরক্ত করবেন না। আইডিয়া আছে, ক'টা মিছিল আসছে, ক'টা যুগ কভার করছি আমরা ওভার স্পেস অ্যান্ড টাইম! আপনি পারবেন একটা মোবাইলে তৈমুর লং আর মাতঙ্গিনী হাজরা সামলাতে? আরে হেই হেই কে বাচ্চাগুলোকে ঢুকতে দিল স্টেজের তলায়? এটা তোদের আইসপাইস খেলার জায়গা?

ক্যাডার ১ : ধাপ্পা দিয়ে দেব স্যার?

ইনচার্জ : চোপ বোগাস কোথাকার, এই সিকিওরিটি, হাঁ করে পাখি দেখছেন কী? কমরেড বি, কমরেড বু, কমরেড জ্যো, সব ওই গাড়িটায় আসছেন, সামলান!

ঘোষক : এসে গেছে স্পেনের মাইগ্রেটরি বিহঙ্গ গ্রুপ, প্রথমে কমলা ঠোঁট, পরে ছেয়ে-হলদে মেশানো ওরা নর্থ কোরিয়া-র, সবাই ওপরে তাকিয়ে হাততালি দিন, আমাদের স্বদেশী হাঁসের মিছিল পৌঁছে যাবে আধ ঘণ্টার মধ্যে, লিড করছেন কমরেড রিদয়, এই এই হো চি মিন সরণির ওখানে ভয় পাবেন না, ভলান্টিয়াররা যাঁরা ফিট হয়ে যাচ্ছেন তাঁদের সরিয়ে দিন, এঁরা স্থলপথে মুভ করছেন ভূশণ্ডীর ভূত, ব্রহ্মদত্যি, যক্ষ, কারিয়া পেরেত, আর তাদের তিন জন্মের বউ, সবাই দেখে আমোদে গড়িয়ে পড়ুন, বগল বাজান, বন্ধুগণ বারবার কিন্তু বলে রাখা হচ্ছে সবুজ মিলিটারি পোশাক পরা দাড়িওলা লোক এলে স্যালুট করে গলার নলি ফুলিয়ে স্লোগান দিয়ে ফাটিয়ে দেবেন, ওঁর নাম চে গুয়েভারা, যে শালা পদবি নিয়ে ইয়ার্কি মারবে পুঁতে ফেলব একেবারে—

কম অ : আচ্ছা, শ্রীচৈতন্যর গ্রুপটার জন্যে শেড-এর ব্যবস্থা করেছেন, ওঁদের তো ন্যাড়ামাথা।

কম সু : আলাদা শেড কী করে দেব, উইগের ব্যবস্থা করতে পারি।

কম অ : সল্টলেক ঝেঁটিয়ে আনছেন তো?

কম সু : ওই দেখুন না, মুড়ো এসপ্ল্যানেডে পৌঁছেছে, তার মানে ন্যাজা করুণাময়ীর রান্নাঘরে। আবার গানও গাইছে

গান : এক দিন বিক যায়েগা মাটি কে মোল
জগ মে রহ যায়েঙ্গে মহামিছিলের বোল
লা লা লালা লা লা

কম বি : এ কী অমিতাভ লালার জয়ধ্বনি দিচ্ছে না কি?

ঘোষক : এই মরেছে, সবাই ছাতা খুলুন, ছাতা খুলুন। পাখি কমরেডরা, আপনারা বরং একটু ওদিকটায় যান না। পাবলিক টয়লেট আছে।

পাখি : সেই নরওয়ে থেকে তুষার ঝড় এড়িয়ে শিলাবৃষ্টি পেরিয়ে চেপেচুপে আসছি, কমিটমেন্টটা দেখুন।

ব্রহ্মদৈত্য : আমায় যদি এদের জন্যে টিকি শ্যাম্পু করতে হয়, ব্রিগেডকে সি গ্রেড করে দেব। কোথায় ব্রাহ্মণকে পা ধোয়ার জল দেবে, না পাখপাখালি নিয়ে আদিখ্যেতা। যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই!

নেপোলিয়ন : কেয়া বললোয়াঁ? ব্যাটা ব্রহ্মমঁসিয়ে? আমি দই মারছি?

ফরাসি বিপ্লবী : এসব আস্তিল-বাস্তিল কথা বললে স্ট্রেট গিলোটিন! না নেপুয়া?

নেপো : তোদের দুর্গ ভাঙার অস্ত্রগুলো দে না ঢুকিয়ে, এপাশ দিয়ে লিবার্তে ওপাশ দিয়ে ফ্রাতার্নিতে বেরিয়ে থাকবে।

শাঁকচুন্নি : আমার মিনসেকে ভয় দেখিওনি বলে দিলাম! এক্ষুনি আয়ী-মা, ধায়ী-মা, খোক্কুসি, সুয়োরানি, গোটা টিম ডেকে আনব! এই, ফেয়ারি টেলের মিছিলটা কদ্দুর রে?

ব্যাঙ্গমা : আঃ, কে পরিচিত নামগুলো বললে ভাই? দ্যাখো না, চশমাটা হারিয়ে কাদের ঝাঁকে ঢুকে পড়েছি, এখন বলছে সুইসাইড কম্পালসরি (কান্না)।

সুইসাইডাল পাখি : কেঁদে লাভ নেই প্যাঁচাবুড়ো। আমরা বছর বছর জাটিংগা গ্রামে মিছিল করে আত্মহত্যা করি। একশো জনকে স্পেশাল দাওয়াত দিয়ে এনেছে এখানে, মেট্রো রেলে ঝাঁপিয়ে দেখাতে হবে। এখন তোমার প্রক্সি কে দেবে? স্পনসরদের কি আমি জবাব দেব?

ইনচার্জ : হচ্ছে কী এখানে, অ্যাবেটমেন্ট অব মার্ডার!

ক্যাডার ২ : স্যর, স্যর, ওদিকে মার্ডার সত্যি হয়ে যাবে। দুর্বার মহিলা সমিতি কমপ্লেন করছে, ওদের মিছিল দেখে নাগা সন্ন্যাসীরা টোন কাটছে।

ইনচার্জ : খেয়েছে, কুম্ভ-মিছিল ঢুকে গেছে! পইপই করে বললাম না, রিলিজিয়নের ব্যাপারটা নজর রাখতে? ওদের শার্প ত্রিশূল-ফিশুল আছে।

ক্যাডার ১ : সেই তো স্যর, বলতে গেছিলুম, চিমটে দিয়ে চিমটি কেটে কী করেছে দেখুন! সারা গা একেবারে আমাদের পতাকার মতো লাল!

ইনচার্জ : কুইক, কয়্যার-ফয়্যারগুলোকে গলা ছাড়তে বল। গান-ফান চললে হুজ্জুত কম থাকে।

কয়্যার : *মোদের গরব*
মোদের ক্যালি
আ মরি বাংলা র‍্যালি
নাদুসনুদুস গঙ্গাভ্যালির
ফাঁকির অ্যালিবাই
ওরে ধম্মতলায় কম্মখ্যালি
দুদ্দাড়িয়ে ধাই

মোজেস : এক্সকিউজ মি, এখানে একটা সমুদ্র পাওয়া যাবে?

ইনচার্জ : অ্যাঁ!

মোজেস : আমাদের ফোল্ডিং সমুদ্র আছে অবশ্য, কিন্তু জেরুজালেমের রাস্তায় ইউজ করে করে একেবারে ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার, বুইলেন না? এদিকে ঢেউ-ফেউ ফাঁক করে হেঁটে না দেখালে আপনারা সিঙাড়া দেবেন না শুনলাম।

ইনচার্জ : না না, আসলে 'টেন কম্যান্ডমেন্টস'-এ ওই চিচিং ফাঁক সিনটা করেই তো আপনি হিট!

অ্যাঙ্কর : কী থ্রিলিং মিছিল না? দর্শকদের জন্য একটা শর্ট বর্ণনা?

মোজেস : হয়েছে কী, সেই অমোঘ প্রভাতে জগতের হিতার্থে আমাদের সদাপ্রভু কহিলেন—

অ্যাঙ্কর : আরে না না, জাস্ট সিনারিটা, এক লাইনে। ব্রেকের সময় হয়ে আসছে।

মোজেস : ওঃ, সে সাংঘাতিক ব্যাপার। এদিকটায় তিমির গ্রাস, ওদিকটায় অক্টোপাস, ডলবি সাউন্ডে জলোচ্ছ্বাস—

অ্যাঙ্কর : আর আপনি যেন দোতলা বাস। উতরোল ট্রাফিকের মধ্যে দিয়ে ধীরে সুস্থে, হেলে দুলে চলেছেন। এই ব্রেকটা স্পনসর করছেন...

ইনচার্জ : ওটার সময় কী ক্ল্যাপ পড়বে দেখবেন। ছ'হাজার ইছদি এনেছেন তো?

মোজেস : সে আর বলতে। এই এখেন থেকে জু একেবারে পিলপিল করছে আলিপুর জু অবদি।

ক্যাডার ২ : স্যর, এই জার্নালিস্টটা উল্টোপাল্টা কুইজ করছে—

ইনচার্জ : অঃ, আর বলতে হবে না, ছক বুঝে গেছি, মিছিলের জন্যে বাচ্চাদের হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার অসুবিধে কপচাবেন তো?

সাংবাদিক : ইয়ে, হ্যাঁ।

ইনচার্জ : বাংলার হিস্ট্রিতে সবচেয়ে বড় প্রসেশন কার জানেন? রবি ঠাকুরের। উনি আপনাদের গণতন্ত্র মেনে রোববার মারা যাননি। উইক ডে-তেই তাঁর শোকমিছিল একেবারে ট্রাফিকের তেরোটা বাজিয়ে ছেড়েছিল। এবার বলুন কী বলবেন!

ক্যাডার ২ : হ্যা হ্যা কী দিলেন স্যর। অবশ্য সাইকেলের চেন রেডি ছিল।

ইনচার্জ : না না, আজ একদম জালি করবি না। ছাদে ছাদে বিবিসি।

কম বু-র সেক্রেটারি : স্যর, ফোন। মাও।

কম বু : বেড়াল-ফেড়ালও ইনভাইট করেছ না কি?

সেক্রে : না স্যর, জে দং। লং মার্চ। রেড বুক।

কম বু : ও! বলুন কমরেড। বিজয়ার লাল সেলাম। অ্যাঁ? এই কম সু, মাও বলছেন আপনি যে তিন লাখ ম্যাটাডোর ভাড়া করে দিয়েছিলেন তার আদ্ধেক শিলিগুড়ি এসে ব্রেকডাউন করে গেছে!

কম সু : চিয়াং কাই শেক-এর চক্রান্ত বলে চালিয়ে দিন, আমি ম্যাটাডোরওলার সঙ্গে বুঝে নিচ্ছি।

কম অ : আমাকে দিন। হ্যালো কমরেড, আপনি গরমাগরম চাউমিনের লোভ দেখিয়ে বাকিটা হাঁটিয়ে আনুন, পি-পিং থেকে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কম জ্যো : আচ্ছা, কে তখন থেকে ঘ্যানঘ্যান করে বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে বলো তো? কানের পোকা নড়িয়ে দিলে!

কম সু : ও হচ্ছে হ্যামলিনের বাঁশিওলা। ইঁদুর আর বাচ্চার মিছিল নিয়ে এসেছে।

কম জ্যো : ওঃ, সিলেবাসে যা ছিল কিচ্ছু ছাড়োনি, না?

ক্যাডার ১ : আঁ! গে আর লেসবিয়ানরা মিছিল বাগিয়ে ঢুকে পড়েছে! বলছে মানুষ মাত্রই হোমো। স্যাপিয়েনটা এক্সট্রা।

ক্যাডার ২ : স্যর, স্যর, ও লোকটাকে দেখুন, মনে হয় ওই দলের। সাদা মিনিস্কার্ট পরা ব্যাটাছেলে।

ইনচার্জ : ইইক! বলে কী গাধাটা! উনি তো গাঁধী, ডান্ডি মার্চের দল নিয়ে এসেছেন। মিনিস্কার্ট না, ওটা খেটো ধুতি। যা, ওঁকে স্টেজে ডেকে আন।

সত্যাগ্রহী : লবণ আন্দোলনের নাম করে এসেছেন তো, সল্ট লেক না গেলে ওঁর প্রতিজ্ঞা থাকে না।

কম বু : আপনারা বোঝান, এটা প্রতীকী।

কম অ : অ্যাকচুয়াল অ্যাক্টটা না করলে ক্ষতি কী?

গাঁধী : (হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে) এসব কে শেখাল? জ্যোতি কি? একটু বসব, এক গ্লাস ছাগলের দুধ খাব।

কম বু : হ্যাঁ হ্যাঁ, এই, ছাগলের মিছিল ছিল না একটা?

ইনচার্জ : না স্যর।

কম জ্যো : স্টুপিড। পেঙ্গুইন-ফেঙ্গুইন অবধি ডেকে দিলে আর ছাগল বাদ পড়ে গেল?

কম বু : একটু ওয়েট করুন। আমি ব্যবস্থা করছি। ততক্ষণ কবিতা-টবিতা শুনুন। এই, কবিদের মিছিলের লিডারকে ডাকুন তো।

কবি : এই তো স্যর, আপনার পিছনেই। কী শোনাব?

কম বু : ওই যে বলেছিলাম, টু-লাইনার লিখে এনেছেন? কোনও প্যাঁচ-পয়জার নেই, একদম কমিউনিকেটিভ?

কবি : নিশ্চয়ই স্যর। এই যে—

আমরাই করেছিলাম অপারেশন বর্গা
আমরাই করিতেছি মহামিছিল অর্গা।

'নাইজ'টা ইচ্ছে করে সাইলেন্ট রেখেছি স্যর। কেমন লাগল গাঁধীজি?

গাঁধী : বুড়ো বয়সে মুখ খুলিও না বাবা। তোমাদের সবার ভাল হোক।

ক্যাডার ১ : স্যর স্যর ডামাডোল। শ্রীচৈতন্য খেপচুরিয়াস। ক্যাডাররা জুগাই-মাধাইকে মারছে।

কম অ : কেন!

ইনচার্জ : দুটোই একদম ড্রাঙ্ক। 'শরাবি'র গান গাইতে গাইতে কলসির কানা মারছে যেখানে সেখানে। পনেরো জন কমরেড ইনজিওর।

কম বু : কমরেড নিমাই তো এসব সাপোর্ট করার লোক নন।

ক্যাডার ২ : উনি বলছেন, মেরেছে কলসির কানা, তাই বলে কি ভোট দেবে না?

কম বু : (কম জ্যো-কে) আনরেস্ট বাড়ছে। আপনি একটা বক্তৃতা শুরু করুন। নইলে সামলানো যাবে না।

ঘোষক : সাইলেন্স! শান্ত হোন। মাইকের সামনে কম জ্যো।

কম জ্যো : আমরা বললাম করব, তোমরা বললে করুন, ওরা বলল দেব না,

তারা বলল অসাংবিধানিক, উনি চাইলেন আবেদন, তিনি ভাবলেন নিবেদন, এ বলল ছিছি, সে হাসল হিহি, আর কী প্রোনাউন আছে গো কম বু?

ক্যাডার ২ : স্যর স্যর, ভয়াবহ। পাখিরা অনেকক্ষণ খেতে পায়নি বলে হ্যামলিনের বাঁশিওলার ইঁদুর কপাকপ লাঞ্চ মারছে।

বাঁশিওলা : আমাকে চেনো না, একটা গৎ বাজাব, লটকে লট কমনিস্ট পেছু পেছু এসে পাহাড়ে সেঁধিয়ে যাবে। আমার কম্পেনসেশন চাই।

কম বু : এই, তাড়াতাড়ি একটা ইমোশন দিয়ে ডাইভার্ট করো। সবচেয়ে করুণ কিছু স্পেকট্যাক্‌ল আছে? শিশু-ভিকটিম বা ওই গোছের?

ঘোষক : সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে, কাদের টিউন প্যাঁকপেঁকিয়ে বাজে! এবার ইরাকি যুদ্ধে তৈলসিক্ত পেঙ্গুইনদের গান—

(মা ও ছানা পেঙ্গুইন স্টেজে ওঠে)

ক্যাডার ১ : এ বাবা গোটা স্টেজটা তেল হয়ে গেল গো, কালচে তেল থকথক করছে!

ঘোষক : আসুন সকলে সাম্রাজ্যবাদী কালো হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে এই এই এই!

ক্যাডার ১ : বলেছিলাম স্লিপ খাবেই। (ঘোষক হড়কে নীচে পড়ে যায়)।

ক্যাডার ২ : এত তোয়ালে ছিল, মুছিয়ে দিতে পারেননি?

ইনচার্জ : ফ্যাচফ্যাচ করিসনি। তেল কমালে সিমপ্যাথিও কমে যেত। আপনারা গান ধরুন, পাখি-কমরেড।

মা পেঙ্গু : *ওরা আমাদের ডাক*
ডাকতে দেয় না
যুদ্ধবাজ মানুষ ওরা দুশমন।
আমরা আমাদের ডাক ডাকি—

ছানা : *ছোট্ট পাখি*

মা ও ছানা : *ওরা চায় না ওরা চায় না*

মাও : হেই, চায়নার নামে বলা হচ্ছে কেন, ওরা তো আমেরিকা! মার মার পেঙ্গুদের। ব্যাটা মিথ্যেবাদী।

লং মার্চের মিছিল : ডেকে এনে অপমান! ইতিহাসের বিকৃতি!

কম বু : বোঝার চেষ্টা করুন, কমরেড। বাংলা আর ইংরিজি গুলিয়ে ফেলবেন না!

মাও : ভাষা শেখাচ্ছ? কালচারাল রেভোলিউশন করে এলাম আর লিরিক বুঝি না?

(ভয়াবহ শব্দ 'দ—ড়া—ম')

সকলে : ও কী হল!

যুধিষ্ঠির : কিছু না, ভীম পড়ে গেছে। উড়াল পুলের ওপর।

কম বু : লাগেনি তো?

যুধি : নাঃ, উড়াল পুলটা ভেঙে গেছে।

ক্যামেরাম্যান : এই যাঃ যাঃ, কী আপদ, গায়ে উঠছে যে! কার ডালকুত্তো?

যুধি : সাবধান, ওই ঘিয়েভাজা সারমেয় আমার সঙ্গী, যেন কোনও অসম্মান না হয়!

অ্যাঙ্কর : আপনার একটা বাইট দিন স্যর। (অ্যাঙ্করের পায়ে কুকুরের ভয়াবহ 'বাইট' দেওন)।

অ্যাঙ্কর : ওরে কী হল রে, ধর্ম ইন ডিসগাইজ ভেবেছিলাম, এ তো জেনুইন চোদ্দো ইঞ্জেকশনের মাল! আমি চননু।

কম সু : কভারেজ হবে না?

স্পনসরের মিছিল : তবে তো কনট্র্যাক্ট ক্যানসেল হোবে স্যরলোগ।

কম জ্যো : এ কী, ওপর থেকে হাঁস-বৃষ্টি হচ্ছে কেন? ম্যাজিসিয়ান ডেকেছ না কি?

যুধি : অর্জুনের কাণ্ড বোধহয়। পাখির চোখ দেখতে পেলেই টার্গেট করে তো।

ক্যাডার ১ : স্যর স্যর মোজেস ভুল সুইচ টিপে সমুদ্র লেলিয়ে সাউথ ক্যালকাটা ভাসিয়ে দিয়েছেন।

ক্যাডার ২ : হনুমান নর্থটা পোড়াচ্ছেন স্যর, ওঁর বোধহয় টিটেনাসের ব্যথা উঠেছে, সেঁক দেবেন!

ক্যাডার ৩ : আলেকজান্ডার তৈমুর লং-কে 'খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং' বলেছেন, খণ্ডযুদ্ধ চলছে রেসকোর্সের সামনে!

ক্যাডার ৪ : ধম্মকুকুর লাল লাল চোখ করে সটান স্টেজের দিকে তেড়ে আসছে, ক্ষেপে গেছে মনে হয়!

ক্যাডার ১ : না, ধাঁ করে ডিরেকশন পাল্টে পশ্চিম দিকে ছুটছে। পশ্চিম দিকে ও কীইই!

(সবাই পশ্চিমে তাকায়)

সমস্বরে : আঁ-আঁ-ক!

ঘোষক : (মাটিতে পড়েই) ও কে আসছে অল্প খুঁড়িয়ে ধুলো উড়িয়ে নটে মুড়িয়ে! ইস্তিরি না করা সাদা শাড়ির আঁচল উড়ছে যেন অ্যানিমিক অগ্নিশিখা!

সহস্র ডেসিবেল কাংস্যবিনিন্দিত চিৎকার যেন সংকটের সাইরেন! ফটরফটর চটি আর উত্তোলিত মুঠি যেন ডামাডোলের টুঁটি। কী হবে রে, আমি উঠি!

সকলে : দি—দি!

(দিদি এসে দাঁড়ান। শুধু হাওয়ার সোঁ-সোঁ। জল চুপ। আগুন চুপ।)

দিদি : আমার শুধু একটাই প্রশ্ন।

(হাওয়া চুপ। বু চুপ। জ্যো চুপ।)

দিদি : কমরেড কি কম পড়িতেছে?

সকলে : আঁ—আঁইক্স!

(প্রত্যেকের মূর্ছা ও পতন)

২৬ অক্টোবর, ২০০৩

কমরেড মঙ্গল

হে লাল গ্রহ, মদীয় লাল সেলাম জানিবা। চিরকাল আমাদের বলাবলি, মার্কসবাদ যদি কোথাও প্রকৃত ফুলে-ফলে, তো ওইখানে। গোটা প্ল্যানেটটাই কিনা রক্তবর্ণ! বিধাতা মার্কস-টিকা পরিয়েই রেখেছেন! কিন্তু কনট্যাক্ট হবে ক্যায়সে? বিলেতের বিটকেল যানগুলো পর্যন্ত অকাল-অক্কা। শেষে কে যেন সমাজতান্ত্রিক ব্রেন খাটিয়ে বলল, হয়তো আপনারাই বুর্জোয়া দেশের গাড়িকে নামতে দিতে চান না, লগা দিয়ে খুঁচিয়ে ওদের ফেলে দেন! হয়তো মহাকাশ যেতে দামি রকেটের প্রয়োজনীয়তা একটা পুঁজিবাদী মিথ! তখন আমরা কিছু বিশ্বাসী ক্যাডারকে অটো চড়িয়ে পাঠালাম। ঘোর অমাবস্যা দেখে আলিমুদ্দিনের ছাদ থেকে লঞ্চ করে দিয়েছি। স্লোগান দিতে দিতে ছায়াপথে রওনা হয়ে গেল। সঙ্গে এই বিজ্ঞাপন-ক্যাপসুল। চুপে বলি কমরেড, এ পোড়া গ্রহে আর কমিউনিজ্‌ম জমিবার নয়। সব-কে-সব লস্যির প্রসেসে এ-গেলাসে ধনতন্ত্র ও-ভাঁড়ে সমাজতন্ত্র নিয়ে জাগ্‌ল করে একটি মিক্সড সুবিধাবাদ প্রেজেন্ট করছি বটে, গতিক ভাল না। আপনাদের হেল্প জরুরি। ভিক্ষে চাইছি ভাববেন না। আমাদের হেড কিন্তু হেল্ড হাই, বিলক্ষণ রিটার্ন দেব। পঃবঙ্গের অ্যাসেটের লিস্টি পড়ুন, মাল্টিপারপাস প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মুখ ধোবেন। পার্টির ঊর্ধ্বে উঠে বিরোধী নাটের গুরুদেরও ইনক্লুড করে দিলাম। আপনারা কেমন দেখতে, সভ্যতার কোন স্তরে, মূল্যবোধ ও ইন্ডাস্ট্রি কেমন, জানি না। যেমনই হোক, যা-ই দরকার, আমরা বডি ফেলে দেব। আদিম সাম্যবাদ চলছে? ইস্ক্রুপ টাইট করে দেব। সামন্ততন্ত্র? এইসা লোচ্চা জীবনমুখী হাফ-আখড়াই স্টকে আছে, বাইজিরা বাগানবাড়ি ছাড়তেই চাইবে না। বৃহস্পতি গ্রহের সঙ্গে আকচাআকচি? এমন কুঁদুলে দিদি সাপ্লাই দেব, তেরাত্তির না পোয়াতে জুপিটারগণ নিজেরা মাথাফাটাফাটি করে মরে থাকবে। এখানে হিংসুটে

অপপ্রচার পেরিয়ে গেঁয়ো বাংলার ভিখ মেলে না, কিন্তু আপনারা বিচক্ষণ, 'ডিল' হবেই। ফিরতি সিগন্যালের অপেক্ষায় হাঁ করে আকাশের পানে ঘাড় তুলে তাকিয়ে রইলাম। স্পন্ডিলোসিস না ধরে যায়, দেখবেন।

ইতিহাসের লুকানো খবর

বাংলা ও মঙ্গলগ্রহের মধ্যে আজ যে মহান সম্পর্ক সূচিত হতে চলেছে, তা আকস্মিক নয়। হয়তো সূত্রগুলি আজ লুপ্ত, কিন্তু বঙ্গীয় পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মঙ্গলগ্রহের নিঃসন্দেহে এক আত্মিক যোগ ছিল। অনেক আগে থেকেই কি গুরুজনেরা আমাদের 'মঙ্গল হোক' বলেন না? আমাদের ঘরে ঘরে কি 'মঙ্গলা' নামের মেয়ে ছিল না? সর্বোপরি, মঙ্গলকাব্য লেখার মহান ঐতিহ্য কাদের? সুদূর তাং ১৪১০ (ইং) সনে মনসামঙ্গল, এরপর বিভিন্ন তাং (ইং ও বং)-এ চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কত বলব? চেঙ্গিজ খানও অত বার 'মোঙ্গোল' অভিধা শোনেননি। কলিকাতা শহরের মনুমেন্টের রং সাদা হওয়া সত্ত্বেও তার মুণ্ড লাল করা নিয়ে দুশ্চরিত্র ফ্রয়েডীয়গণ যে কথাই বলুন, প্রকৃত অবচেতনে সরকার মঙ্গলের কথাই ভাবছিলেন, শিশুও অনুমান করতে পারে।

আমাদের সম্পদরাশি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *সাহিত্যিক*

'রাশিয়ার চিঠি'র লেখক। 'গ্রাম ছাড়া ওই *রাঙা* মাটির পথ' লিখে গ্রামে গ্রামে মাটির কাছাকাছি যেতে হলে সমাজতন্ত্রই একমাত্র পথ, তা বোঝান। নিজ অঞ্চলের নর্দমা পাকা করার জন্য নোবেল প্রাইজ গ্রহণ করেন। তাঁর নাটক 'রক্তকরবী'তে লাল ফুল স্বাধীনতার প্রতীক। সাম্রাজ্যবাদী ইংলন্ড প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি তীব্র ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন। জাতীয় সঙ্গীতে অবধি তাঁর জনগণতান্ত্রিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। জমিদার হওয়া সত্ত্বেও 'আমি তোমাদেরই লোক' বলে জোড়াসাঁকোর ভোগবাদী জীবন তীব্র ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে শান্তিনিকেতনে অনুন্নত মেহনতি উপজাতির মধ্যে থাকতে চলে যান। সেখানে কিছু ডাকাতও থাকতেন—তাঁরা ধনবাদী সমাজের শিকার উপলব্ধি করে কবি তাঁদের পাল্কিবাহক নিয়োগ করেন এবং এভাবে লুম্পেন প্রোলেতারিয়েতদের সৃজনশীল শ্রমসম্পর্কে নিয়ে আসা যায়, ভূরি পরিমাণ অর্থব্যয়ে প্রমাণ করেন। আমরা পরবর্তীকালে এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অসাধু

প্রোমোটার, গণধর্ষণকারী, তোলাবাজ, জিঘাংসু খুনি, সকলকে পার্টির সঙ্গে সৃজনশীল শ্রমসম্পর্কে জড়িয়ে অভূতপূর্ব উপকার পেয়েছি। এঁর কোটেশন গ্রহনির্বিশেষে, মুখেভাত থেকে উল্কাপাত, সর্বত্র কাজে লাগবে।

অটো রিকশা : *যান*

সর্বত্রগামী। নিন্দুকেরা বলেন, এটি জলে চলে না, কিন্তু বর্ষার কলকাতায় সন্দেহ নিরসন হয়ে যাবে। যে কোনও গলিঘুঁজিতে, ট্রামলাইনে, বেলাইনে, অসংখ্য বিশালকায় যানের মধ্যিখান দিয়ে গলে, লাফিয়ে, কাত হয়ে, স্পিন খেয়ে, পথচারীর তলপেটে গোঁত্তা মেরে তাকেই গালি দিয়ে ও প্রয়োজনে সমবেত ভাবে পিটিয়ে, হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছেন। সীমিত সামর্থ্যের মানুষের কাছে পুঁজিবাদী ট্যাক্সির বিকল্প এই 'সমাজতন্ত্রের বাহন' সম্পূর্ণ আমাদের আবিষ্কার। জেম্‌স বন্ড পরবর্তী ছবির জন্য এই অলরাউন্ডার-যান চেয়ে সুভাষ চক্রবর্তীর পায়ে ধরছেন, লাইসেন্স পাচ্ছেন না। আপনাদের গ্রহ থেকে নেপচুন/প্লুটো, যেখানে খুশি ট্রিপ মারতে হলে, সমস্ত উড়ন্ত উপগ্রহ, ছুটন্ত ধূমকেতু, ফুটন্ত নক্ষত্র এড়িয়ে ও পেরিয়ে অনায়াসে পৌঁছে দেবেন। অফিস টাইমে কিছু বাড়তি লাগবে।

মা দুর্গা : *দেবী*

আপনাদের কয় হাত কে জানে, না কি অর্ধেক মহিষ অর্ধেক কল্পনা, আমাদের কাছে কিন্তু সব স্পেসিমেনই আছে। এই দেবীটি কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যায় 'টাডা', 'পোটা' আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে প্রতি বছর দশ হাতে অস্ত্রসজ্জিতা হয়ে পঃবঙ্গের শৌর্য বিজ্ঞাপিত করেন। জোতদার হিমালয়ের একমাত্র কন্যা হয়েও বিলাসবহুল জীবনকে তীব্র ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে স্বেচ্ছায় 'ডি-ক্লাস্‌ড' হয়ে অন্ত্যজ শ্রেণির কর্মহীন প্রোলেতারিয়েত শিবকে বিবাহ করেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী মহিষাসুরকে পরাজিত করেন। প্রভূত বয়স হওয়া সত্ত্বেও এ রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য ফি বছর এসে পাঁচ দিন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। বসেন না, বাতের মলমও চান না। স্পনসরের অভাব পড়লে হাত জোড় করে সফ্‌টলি বলবেন, আপনাদের প্যান্ডেলে সুলভে দাঁড়িয়ে দেবেন।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় : *ক্রিকেটার*

কেন্দ্রের বঙ্গবঞ্চনার প্রাচীন অভ্যাসকে ভোঁতা করে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। আজীবন বামপন্থী। কখনও ডান হাতে ব্যাট করেন না। সাম্রাজ্যবাদী ইংলন্ডের সঙ্গে তীব্র ঘৃণা ভরে সেঞ্চুরি তো করেনই, এক নাটকীয় জয়ের পর তীব্র ঘৃণা ভরে পরনের জামা খুলে শূন্যে ঘুরিয়ে তৃতীয় বিশ্বের জয় ঘোষণা করেন। আপনাদের গ্রহে যে কোনও শর্টপিচ উল্কাকে হেলমেট, ঘাড়, থুতনি দিয়ে সামাল দেবেন, কোনও গোলাকৃতি গ্রহকে নির্মম প্রহারের প্রয়োজন হলে গ্রহটিকে সাবধানে অফ-সাইডে রেখে এঁর হাতে ব্যাট দেবেন, নিমেষে বাউন্ডারি পেরিয়ে যাবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় : *শিল্পী*

খুব ভাল গণেশ আঁকেন। কবি, গদ্যকার। সাহিত্য ইংরাজিতে অনূদিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড় বহুমুখী প্রতিভা। নিজে গান লিখে, সুর দিয়ে, গেয়ে, নিজে সিন্থেসাইজার বাজিয়ে ধর্মতলায় পরিবেশন করেছেন, বাচ্চাদের জন্য গানের ক্যাসেট বেরিয়েছে। প্রখর গ্রীষ্মে মোটা পশমি চাদর গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যার পথনাটক করে প্রথম ওই ঘরানায় পেটফাটা কমেডির প্রচলন করেন। রবীন্দ্রনাথ কখনও মন্ত্রিত্ব পাননি। ইনি তা-ও পেয়েছেন। মন্ত্রী হতে গেলে দফতর লাগে, এই চিরকালীন কুসংস্কারকে তীব্র ঘৃণা ভরে ধ্বংস করেছেন। তুচ্ছাপিতুচ্ছ বিষয়ে প্রবল ঝগড়া আর মলিন মেলোড্রামা বাধাবার প্রয়োজন হলে, উপযোগিতা অতুলনীয়। শুধু স্টেজে তুলে দিন। কানে গোঁজার তুলো আমরা জোগান দেব, সস্তায়।

জ্যোতি বসু : *পরম পিতা*

ব্যারিস্টার, বৈদিক ঋষি। সুখ, দুঃখ, বানতলা, সবেতে নির্বিকার। কোনও কিছুতে বিচলিত হন না, শেয়ালের ডাকে ঘুম ভেঙে যাওয়া আর ঐতিহাসিক ভুল-এ দিল্লি ফসকে যাওয়া ছাড়া। শোনা যায় দু'মাস বয়সে একবার হেসেছিলেন। বুর্জোয়া অপপ্রচারও হতে পারে। যে কোনও ক্রাইসিসে 'এমন তো হতেই পারে' বলে গুরুত্ব লাঘব করতে হলে, অসমাপ্ত বাক্যের টানা গদ্য মুখে মুখে রচনার শিল্প শিখতে হলে এবং গাম্ভীর্য ও হামবড়াই ওয়ার্কশপে চিফ গেস্ট পেতে, মহাবিশ্বে প্রথম ও একমাত্র পছন্দ। স্টক সীমিত।

সুব্রত মুখোপাধ্যায় : *নট, সমাজসংস্কারক*

'চৌধুরী ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স' সিরিয়ালে সুইমিং পুলে খালি গায়ে ভেসে মুনমুন সেনের সঙ্গে আলাপচারিতা করে বিখ্যাত। এই হয়তো মমতাপন্থীর অভিনয় করছেন, এই পরিপন্থীর। খাজনা আদায়ের অভিনব বাজনা আবিষ্কারে আর্কিমিডিস-প্রতিম। শুক্রগ্রহ ঝামেলা পাকালে সেদিকে মাইল মাইল জঞ্জালের ভ্যাট দাঁড় করিয়ে দেবেন, ত্রাহি ত্রাহি বলে ওরা বাকি না থাকলেও কর দেবে। আবার কক্ষপথের মাঝমধ্যিখানে আঁখাম্বা প্যান্ডেলও দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন, সিজনের ওপর নির্ভর করছে। প্রকাশ্য মহাকাশে হিসি করলে রকেট থেকে নেমে গাছের ডাল দিয়ে পেটাবেন।

নকশাল : *বাংলার বীর*

খতরনাক পাবলিক, কিঞ্চিৎ নাক-উঁচুও বটে। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না বলে মাথা কিনেছেন। মাস্টারদা-ক্ষুদিরামের পর বাঙালির বোমাবাজির ফ্যান্টাসিকে এঁরাই বাস্তব করেছিলেন, সেই ব্যর্থ বিপ্লবের খোশবাই খেলিয়ে এখনও চলছে। এ জাতির সবচেয়ে দরদের বস্তু : 'সাকসেসফুল শহিদ', সে ইমেজে এঁরা বলে বলে ফার্স্ট। 'যত মত তত পথ' মন্ত্রের সাধক : মাও, চে, হো, লেনিন, স্তালিন, কানু, চারু, এবং মাও-লেনিন, চে-স্তালিন, চে-মাও, কানু-স্তালিন-শিবদাস-হো-হা, সহস্র পার্মুটেশন-কম্বিনেশনে ব্র্যাকেট রচনা করেই অ্যামিবার মতো সংগঠন ভাগ হয়ে যায়। আমাদের সবচেয়ে বিস্ফোরক এক্সপোর্ট। পাশের গ্রহে ঝামেলা বাধাতে চাইলে আজই আমদানি করুন। হাই ডিসকাউন্ট।

ভোকাল টনিক : *শক্তিবর্ধক ডোজ*

শ্রমিকেরা কাজ করছে না? গ্রহ আস্তে ঘুরছে? 'লালমুখো একাদশ' দশ গোল খেল? ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ—এসে গেল যে কোনও আতান্তর আসান করতে অব্যর্থ ও অনর্গল : ভোকাল টনিক। হাফটাইমে কানের গোড়ায় দু'ফোঁটাই যথেষ্ট। ভয়ংকর অনুপ্রেরণা মুহূর্তে গজাবে, 'ওরে থাম রে, এক্ষুনি করছি' বলে সবাই ফাস্ট ফরোয়ার্ড মোশনে সব কাজ করে দেবে, শ্রমিকরা আঠারো ঘণ্টা খেটেও ওভারটাইম নেবে না, ছোট ছেলে কষ্টকর চাকরি করতে চাইবে, মেনি বিল্লি উরু চাপড়ে রয়্যাল বেঙ্গলের সঙ্গে লড়তে চলে যাবে। বিধিসম্মত সতর্কীকরণ:

চচ্চড়ির মশলা দিয়ে বিরিয়ানি রাঁধা যাবে না। ও হ্যাঁ, প্রণেতা এক ও একমাত্র পি কে ব্যানার্জি। এঁর কোনও শাখা নেই।

সত্যজিৎ রায় : *চলচ্চিত্র পরিচালক*

প্রচণ্ড হাইট সত্ত্বেও বিদেশি খেলা বাস্কেটবলের প্রতি কোনও উৎসাহ না দেখিয়ে দেশি ভাষায় সমাজসেবামূলক ছায়াছবি রচনা করেন। উপযুক্ত অ্যালোপ্যাথির অভাবে দরিদ্র বালিকার মৃত্যু (পথের পাঁচালী), টালা ট্যাঙ্কের জল শোধন না করলে ফুড পয়জনের আশঙ্কা (গণশত্রু), গ্রামীণ কাদাপিচ্ছিল সড়কে শহুরে ব্যক্তির আছাড়ের সম্ভাবনা (তিন কন্যা), হার্টের রোগীর বাড়িতে ধেড়ে পাগলকে রাখার বিপদ (শাখা-প্রশাখা), জনকল্যাণের সমস্ত জরুরি বিষয়ে বারে বারে মানুষকে সাদা-কালো ও কালারে সচেতন করে দিয়েছেন। খুব গভীর শিল্পও আছে: দেওর-বউদি অবৈধ সম্পর্কে দোলনা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা (চারুলতা), বা বুর্জোয়া 'র‍্যাশনালিজ্‌ম'-এর ধারণাকে তীব্র ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে সাবঅলটার্ন শিল্পীর সঙ্গে সাব-সাবঅলটার্ন ভূতেদের মেলবন্ধন ও হিট সঙ্গীতসৃজন (গুগাবাবা)। বুর্জোয়া মার্কিন পুঁজিপতিরা উপায়ান্তর না দেখে অস্কার দিতে চাইলে তীব্র ঘৃণা ভরে তাদের হাসপাতালে আসতে বলেন ও বেড-এ শুয়েই বক্তৃতা দেন। এঁর রেট্রো সদলে দেখুন ও নোট নিন, বিশেষত 'মার্স ওয়েলফেয়ার দফতর'-এর কর্তারা।

ঋতুপর্ণ ঘোষ : *শল্যচিকিৎসক*

একজনের ধড়মুন্ডু অটুট রেখে তার গলায় সম্পূর্ণ অন্য লোকের স্বর নিপুণ জুড়ে দেন। অনেক সময় পেশেন্ট পার্টি জানতেও পারেন না। অবাঙালির গলায় বাঙালি, রাজার গলায় কাঙালি, এমনকী গৌরী ঘোষের গলায় স্বয়ং নিজের স্বর জুড়ে ম্যাজিক দেখিয়েছেন। তাঁর ছবিতে নেড়ি ডাকলে লোকে ভাবে অ্যালসেশিয়ান দিয়ে 'ডাব' করানো হয়েছে। ও হ্যাঁ, ছবিও করেন। বাংলা স্টার থেকে মুম্বই তারকায় প্রমোশন হয়েছে। জনশ্রুতি, পরবর্তী পালায় ক্লিন্ট ইস্টউডকে ক্লিষ্ট বিধবার রোলে নিচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথের গলা দিয়ে ডাব করানো হবে। যে কোনও ই এন টি প্রবলেমে এঁকে দেখান। মহাকাশে চেম্বার খুলে দিতে আগ্রহী প্রযোজক দেখা করুন।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : *সমন্বয়সাধক*

এক জন্মে রাজকীয় ভোগবিলাসকে তীব্র ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু সংঘ গড়তে ভোলেননি। এ কাঠামোয় সুজাতার পায়সান্নের বদলে 'ফিলিম ফেস্টিভ্যাল' পথ্যি করেছেন। সেবারও অজাত-বেজাতকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, এবারও কমিউনিস্ট সরকারে অচ্ছুত ব্যবসায়ীদের বুকে টেনে নিয়েছেন। অবিশ্বাস্য সমন্বয়ের ভেলকি দেখাচ্ছেন। এক হাতে পুলিশ অন্য হাতে কলচর, এ কাঁধে সুনীল-শক্তি অন্য কাঁধে রক্তারক্তি, বুকপকেটে পুঁজিবাদ ঝুলপকেটে মার্কসবাদ, সোমবার ইতালি বুধবার ট্রেড ইউনিয়ন মিতালি, সুন্দর ফর্সা মুখখানা টকটকে হয়ে যাচ্ছে। এর ওপর আবার বগলে একখানি দানবীয় ইরেজার, তেইশ বছরের ভুল মুছে দেওয়ার জন্য। ধন্যি দাদার অধ্যবসায়। উন্নততর মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের নেতা। দু'টো গ্রহের সমন্বয় নিয়ে কোনও টেনশন করবেন না, মেলাবেন তিনি মেলাবেন। চুক্তি সইয়ের পরদিন থেকে মানিকতলা টু মার্স উড়াল পুল শুরু হয়ে যাবে।

ঘাটতিশূন্য বাজেট : *হয় হয় টানতি পারো না*

দুর্ধর্ষ ম্যাজিক। অসীমবাবু সরকারে ঢোকার পর থেকে পি সি সরকারের বাজার পড়তি। লোকে মাসের পর মাস মাইনে পাচ্ছে না, কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মেট্রো না গলায় দড়ি এইটুকু শুধু ডিলেমা, বাজারে চাকরি নেই, ব্যবসায় কাটতি নেই, কিন্তু হুঁ হুঁ বাবা, বাজেটে ঘাটতি নেই। রোগা মানুষের বায়োডেটা-য় দারা সিং লিখে রাখার এই অথেনটিক ভাঁড়ামি আপনাদের শিখিয়ে দেব, ভাণ্ডার ঢনঢন করলেও ব্যালেন্স শিটের ডান-বাঁ মিলিয়ে সে কাগজ লোকের মুখে ছুড়ে দিন, ব্যস, সর্বমঙ্গল হয়ে থাকবে। উন্নয়ন তো মশাই খাতায়-কলমে রচিত হয়, সেটায় শান দিন। আপনি কি বোকা মিনিবাস নাকি, যে লিখে রাখবেন, 'কভি খুশি কভি গম, ব্যয় বেশি আয় কম'!

আনন্দবাজার : *মস্তিষ্ক প্রক্ষালন যন্ত্র*

দিনকে রাত, কুকুরকে ঠাকুর, সংবাদকে গল্প এবং গাভাসকারকে গাওস্কর বানাবার কল। এঁর পারমিশন নিয়ে পঃবঙ্গে সূর্য ওঠে, বাঙালির নেকুপুষু মগজকে নাইয়ে, খাইয়ে, সযতনে শুকোতে দেওয়ার দায়িত্ব এঁরই। চালে-ডালে-ইউরিনালে পাবলিক ভাবে তারা বলছে, আসলে বলে আনন্দবাজার। আগুনে পোড়ে না, হুশ করলে ওড়ে না, বয়সে ক্ষয় পায় না,

ভগবানকেও ভয় পায় না। সহস্র লিটল ম্যাগ আর কবিগোষ্ঠীর প্রধান অনুপ্রেরণা, কারণ ইনি না থাকলে কার শত্রুতা করে তাঁরা বেঁচে থাকতেন? মোদ্দা কথা, আনন্দবাজার সর্বশক্তিমান, কারণ ইহা দশ লাখ। এ জিনিসকে মঙ্গলে অফিস খুলতে দিন, সাত দিনের মধ্যে গ্রহের নাম হবে মঙ্গলানন্দ।

ফ্র্যাংকলি বলি

ভ্যারাইটি তো দেখলেন। কী জিনিস বানায়েছি, তবু অলপ্লেয়েরা পাত্তা দেয় না। শুধু এক ঘ্যানঘ্যানে লব্জ, রাস্তা নেই, পরিকাঠামো নেই, কাজের পরিবেশ নেই। আরে কী আছে দ্যাখ। টেগোর থেকে টিক্‌রমবাজ—এ স্পেকট্রাম কে দেবে? তবে আপনারাও যদি বদমাশ বুর্জোয়া হন (অভাগা যেদিকে চায়, বামপন্থা উবে যায়) আর এই প্রোপোজাল তীব্র ঘৃণা ভরে ছুড়ে ফেলেন, দাদা, অন্য প্রস্তাবও আছে। একখানি 'ক' বাদ দিয়ে 'মার্কসবাদ'কে 'মার্সবাদ'-এ নিয়ে যেতে আমাদের পাঁচ মিনিট। এমনকী অন্যত্র প্লেস করে 'কমার্সবাদ'ও করতে পারি। ঝটিতি একটি পলিটব্যুরোর মিটিং সেরে নিলেই হল।

ঝেড়ে খকখক করব, স্যর? আসলি বচন হল, এ বাজারে 'বাম' মানেই লোকে অপয়া ভাবছে। 'বাম' শহর গুঁড়িয়ে চুর, বামিয়ানের বুদ্ধ পুরো পউডার, বামপন্থার সিমিলার পুঁদিচ্চেরি। ঘাড়ে হাত বুলিয়ে ভালবেসে সামান্য কথা কপচাতে গেলেই 'ওরে, ফের বাম্বু নিয়ে এল', 'বিধি বাম' বলে সব দোরে খিল দিচ্ছে। ওখেনে জমি-টমি সস্তা যাচ্ছে কি? দু'ডজন লিডার আর হাজার কুড়ি বিদগ্ধ ক্যাডারের স্পেস হবে? গ্রহে তুলে ল্যাডার কেড়ে নেবেন না, মাইরি। চুক্তিপত্র একটু-আধটু চেঞ্জ করে, আমরাই সটান রওনা দিচ্ছি নাহয়। ভাববেন না, এনি ড্যাম পরিবেশে আমূল মানিয়ে নেওয়ার খ্যামতা বর্তমান। দু'দিন বাদে আপনাদেরই প্রাইমারি থেকে বাংলা শিখতে বাধ্য করব'খন। এট্টু কনসিডার করবেন।

৪ জানুয়ারি, ২০০৪

দশমহাবিদ্যা

নববর্ষের দশ প্রতিজ্ঞা

রাস্তায় থুতু ফেলব না

পুরসভা আমাদের রাস্তা রং করার ভার দেয়নি, চেরাপুঞ্জিকে ভ্যাঙাবার উৎকট খেয়াল না রপ্ত করলেও চলবে। কিছুর মধ্যে কিছু না, অন্যের কাছ থেকে শ্রম নয় ব্যবসা নয়, হঠাৎ ডাহা নকল করলাম ঘিনঘিনে বদভ্যাস: রঙিন থুতুবৃষ্টি। সারা দিন গরুর মতো জাবর কাটছি, পোয়াতির মতো ওয়াক তুলছি, পিচকিরির মতো রাঙিয়ে দিচ্ছি মাঠ-ঘাট-অন্যের শার্ট। বিশ্বাস করুন, গাড়ি থেকে মুন্ডু বাড়িয়ে গলগল করে থুতু বমি করলে দুর্দান্ত স্মার্ট দেখায় না। মুখভর্তি পরাগরস নিয়ে হাও-হাও করে কথা বললেও কালচার্ড জাতির সুভাষিতানি প্রচার হয় না। এত ফটরফটর চলন বলন সরকারের বাপ-মা তোলন, তা হলে অন্তত এটুকু বোধ থাকতেই হবে যে থুতু ফেললে নিজের বাড়ি গিয়ে, যত গ্যালন খুশি। এবং অবশ্যই, গোটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটাকে আপনার বাড়ির সঙ্গে অ্যাটাচ্ড বাথরুম হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়নি। ছোট বাইরের জন্যে বাথরুমে না গিয়ে বিডন স্ট্রিটে গেলাম, এ কী ধরনের রুচি? কুকুর তবু ল্যাম্পপোস্ট দেখে দাঁড়ায়, আমাদের সেটুকুও বাছবিচার নেই। এ বছর আমরা চেষ্টা করব নিজ শরীরের বর্জ্য-ফেলার মোহন প্রদর্শনীটি সর্বজনীন না করতে।

মেয়েদের বিরক্ত করব না

মানছি, প্রায় গোটা জীবনটা সেক্সস্টার্ভড দমবন্ধ এবং একই সঙ্গে 'ই বাবা সেক্স কী নোংরা' ভণ্ডামি পালনের অনবরত ধকল সাংঘাতিক, তবু সে জিঘাংসায় মহিলাদের প্রতিনিয়ত ছোবলাতে পারি না। আমরা পুরুষরা একটা মুহূর্ত তিষ্ঠোতে দিই না ওঁদের। চোখ দিয়ে নাগাড়ে চিরুনি-তল্লাসি, মেট্রোর সিঁড়িতে চটচটে মন্তব্য যাতে তাঁর গোটা দিন গুলিয়ে ওঠে, এ সবে শুরু। কোমল গায়ে

হাত দিতে চৈত্র সেলের ভিড়ে গুঁজে গেলাম। পুজোয় দল বেঁধে বেরোচ্ছি আর কাউন্ট রাখছি, কে কতটা অসভ্যতা ফলিয়েছে, সে তত স্মার্ট। একজন মহিলা বাড়ি থেকে বেরনোর সময় লিপস্টিকের সঙ্গেই মেখে নেন এই নিশ্চয়তা: তাঁকে অপমানিত হতে হবে। নিয়ম। শুধু চেষ্টা, আজ যদি একটু কম হয়। স্রেফ স্ত্রীলিঙ্গবাচক মানুষ হয়ে জন্মেছেন বলে তাঁর একটু আনমনা হওয়া, আলগা পথ চলা, একলা সিনেমা দেখার সামান্য মৌলিক অধিকারটুকু আমরা কেড়ে নিলাম। ভিড়-ট্রেনে ওঠার সময় কেউ-না-কেউ বুকে হাত দেবেই। উঠে তাকিয়ে দেখবেন, সব্বাই শিক্ষিত দেখতে, অধিকাংশ বাপের বয়সী। শহরে গ্রামে সংঘারামে অবিশ্রান্ত পুরুষবাজি চলেছে। একটা সেকেন্ড অব্যাহতি নেই, সতর্কতা শিথিল করার উপায় নেই, অচেনা লোক ঘোর আপন-জায়গায় হাত দিলে সয়ে যাওয়া গুমরে থাকা অভ্যাস করে নেওয়া ছাড়া রাস্তা নেই। এ বছর তাঁদের এই অমানুষিক অপমান করব না। ওঁরা চলমান মাংসখণ্ড নন। নিতান্ত সহ-মানুষ, ওঁদেরও ভিড়-বাসে অসহ্য লাগছে, ঘাড়ের কাছটা ব্যথা করছে, জলতেষ্টা পেয়েছে, বাড়ি গিয়ে সিরিয়াল দেখতে ইচ্ছে করছে।

মেয়ে হওয়ার সুযোগ নেব না

পুরুষশাসিত সমাজে মেয়ে হয়ে সহসা চিৎকার করে ওঠার প্রভূত সুবিধে, জনতার শিভালরি (শভিনিজ্‌মেরই ও-পিঠ) অ্যায়সা চেগে উঠবে, ভিলেন-সাব্যস্ত পুরুষটি কিছু বলার আগেই দু'গন্ডা রদ্দা। কিছু মহিলা তা বুঝে সব জায়গায় মহিলা হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে চলেছেন। বহু ভদ্র ছেলে রাস্তাঘাটে কাঁটা হয়ে থাকে, মেয়েদের জ্যোতিপরিধি না টাচ করে ফ্যালে! মেয়েদের অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করে না। মুখ হাঁ করেও তুরন্ত বুজে নেয়। নারী কিছুটা লাইসেন্স পাবেনই, সর্ববিদিত। সেই মহিলাগিরি আমরা ফলাব না এ বছর। মহিলা হয়েও লাইনের শেষে দাঁড়াব, যে তিরিশ জন দাঁড়িয়ে আছেন, সবাইকে পেরিয়ে কাউন্টারে গিয়ে আধো আধো করে বলব না, আমার ট্রেন এসে গেছে। ট্রেন সবারই এসে গেছে। আমরা পাশের লোকটিকে জোরে কনুই দিয়ে ঠেলে সিটে বসে পড়ব না, বাসে ছেলেটির পা জোরসে মাড়িয়ে দিয়ে তাকেই 'ইডিয়ট' বলব না। কাজ আদায় করার জন্য লীলাপেখম বিস্তার করব না। ওতে নিজেদেরই ছোট করা হয়, বার বার বিশেষ অধিকার চাওয়ার মানে, নিজেদের অ-সমতাকেই স্বীকার।

কাজের মেয়েকে মাইনে বেশি দেব

নিয়ম হচ্ছে, কত্তাটির অফিসে সি এল, ই এল, মেডিক্যাল লিভ আরও বেশি নেই কেন হাহাকার, তা হলে ফের পুরী যাওয়া যেত, কিন্তু কাজের মেয়েটির এক দিন কামাই নিয়ে পাড়া মাথায়। 'অবশ্য ওদের অত বলেটলে কিছু হবে না, ওদের গন্ডারের চামড়া।' 'ওরা' মানে? গরিবরা? টাটা-বিড়লার তুলনায় আমরা সাতাত্তর গুণ হতকুচ্ছিত গরিব। এবার যদি অফিসে কোটিপতি মালিক নিজে চেয়ারে বসে আমার বাবাকে মাটিতে বসতে দেন? মার্সিডিজে উঠতে উঠতে বলেন, 'ও শালা মধ্যবিত্ত চাকরের জাতকে দিয়ে কিসু হবে না, যতই প্রমোশন দাও'? আমরা ডাইনিং টেবিলে খাব আর কাজের লোক উবু হয়ে এনামেলের বাটিতে সস্তা চালের ভাত মাখবে, এই তো নিয়ম? সে মাছ রাঁধল কিন্তু চার টুকরো পমফ্রেট বাপ-মা-ছেলে-মেয়ে ঢেঁকুর তুলে মেরে দিলাম, এই তো নিয়ম? ছ'বছরের বিল্টুসোনাকে ন'বছরের মালতী স্কুলে নিয়ে যাবে, ফিরে ভারী বাজারের থলে বয়ে হাঁটবে বাবুর পিছু পিছু, এই তো নিয়ম? ('চাইল্ড লেবার' খোঁচালে বলব, আমি দেখছি বলেই তো তবু খেতে পাচ্ছে, নইলে কী হত? এই অজুহাতে মালতীর শৈশব দুরমুশ করে দেব।) অর্ডার দিয়ে তিন বার আলমারির তলা ঝাঁটাব, কিন্তু তার পেট ফেটে গেলেও বাথরুমে ঢুকতে দেব না। (আমাদের হিসি পর্যন্ত গরিবের হিসির চেয়ে উচ্চ শ্রেণির!) এ বছর নিয়মগুলো বাতিল করে দেব। মাসে চার দিন ছুটির অধিকার স্বীকার করব, পুজোয় অত খারাপ শাড়ি দেব না, দুশোর বেশি মাইনে চাইলে 'এদের খাঁইয়ের শেষ নেই' বলে ইতর-দাগাব না, ওঁদের একই বাজার থেকে চালডাল কিনতে হয়, আমার বাবার যদি বেশি মাইনে দাবির অধিকার থাকে, তাঁদেরও আছে।

'আপনি' বলতে শিখব

সামাজিক শ্রেণিবিভাগ করে 'আপনি' 'তুমি' বণ্টন করব না। যিনি ট্যাক্সি চালাচ্ছেন তিনি আমার 'তুমি' হলেন কীসে? দশটা-পাঁচটার ফাইল ঠেলছি বলে আমি কোথাকার হনু? কিছু কাজ 'ছোট কাজ', তা করলেই 'তুমি' আর পুলিশ বা প্রফেসর দেখলেই 'স্যর আপনি', এ সাম্প্রদায়িকতা ছাড়ব। কাজের লোক, হকারকে নির্দ্বিধায় 'তুমি' (ক্যাঁক করে ধরলে বলব, 'কামারাদারি', আপন করে নিচ্ছিনু, 'ভাই দ্যাখো না দুটো পঁচিশে হয় কি না'), বাজারের সবজিওলা,

জমাদার, রিকশাচালককে 'তুই'! (জানেন, সেদিন রিকশাওলার সঙ্গে দর করছি, ব্যাটা সিটের ওপর পা তুলে কথা বলছে! আমি বললাম, অ্যায় পা নামা, কার সঙ্গে কথা বলছিস এভাবে! এই শালা সি পি এম এসে এই ছোটলোকগুলোর বাড় বেড়েছে জানেন তো?) কপাল করে ঝুপড়ির বদলে একটা মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মে গেছি আর লোনের সুবাদে ফ্ল্যাটের স্বপ্ন দেখছি বলে কারও মাথা কিনিনি, অন্যের সম্মান মাড়ানোর অধিকার পিতৃসূত্রে পাইনি, বুঝব। এ বছর অচেনা লোককে 'আপনি' বলব।

গণধোলাইয়ে অংশ নেব না

একজন মানুষকে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে সবাই মিলে তার মুখ ফাটিয়ে দেওয়া দাঁত ভেঙে দেওয়া পাঁজর পিষে দেওয়া, একজন লোক হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে 'বাবু আমাকে মারবেন না বাবু' আর্তনাদের সময় খুব ঠান্ডা মাথায় তাক করে সরু বাখারি দিয়ে তার নরম চোখ দুটো গেলে দেওয়ার মধ্যে যে প্রচণ্ড মজা, আমরা এ বছর তা উপভোগ করব না। সমষ্টিগত ভাবে একলা জনকে কোণঠাসা করে অত্যাচার করার যে ঐতিহ্য, ক্লাবের তরফ থেকে শাস্তি দিয়ে গোটা পাড়ার সামনে প্রৌঢ়কে ওঠবোস করানোর যে গৌরব (শালা বুড়ো ভাম আমাদের বোনকে চোখ মেরেছে), আমরা এক বছর তা থেকে স্বেচ্ছা-উপোস নেব। আমাদের ফ্রাস্টেশনগুলো উগরে দেওয়ার জন্য প্লাস্টিকের 'হিট মি' পুতুল কিনে তাকে নিয়মিত মেঝেয় আছড়াব, বেল্ট দিয়ে ফোল্ডিং খাটকে পেটাব, বাথরুমে অসহ্য খিস্তি করব; কিন্তু চোর ধরতে পারলে পুলিশে খবর দেব, রিকশায় করে মাইক নিয়ে অমুক মাঠে সারাদিন ব্যাপী গণধোলাইয়ের আসরে লোক ডাকব না, আমার দাম্পত্য জ্বলুনি বা বসের অত্যাচারের জেরে শব্দ করে কাঁদব, তবু অসহায় অন্য লোকের হাড়ে শাঁসে রক্তে আমার যৌন হতাশা থেঁতলে দেব না। বুঝব, আমরা যা করছি তাতে প্রতি মুহূর্তে একশো গুণ অপরাধ হচ্ছে, যাকে পেটাচ্ছি, সে যা করেছে, তার চেয়ে।

অতিবিনয়ী হব না

নিয়ম হল, কেউ অপমান করলে তার উত্তর দিতে পারব না, অবাক স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে থাকব, রাত্তিরে বাড়ি ফিরে বুকের ভেতরটা জ্বলে যাবে, পরদিন থেকে মনে মনে কয়েকশো মোক্ষম প্রত্যুত্তর রিহার্সাল দিতে দিতে পথ চলব অটো

চড়ব, বুকের জ্বালা খুব বাড়লে মনে করব, অ্যাসিডিটি। তারপর ভাবব, আসলে আমি তো ভাল লোক, ভালদের এরম হবেই, দুনিয়াটা অশিক্ষিত-য় ভরে গেছে, কুকুরের পায়ে কামড়ে নিজেকে তো নিচু করতে পারি না! এ বছর এসব প্রবোধ নিজেকে দেব না। বুঝব, 'মেরুদণ্ডহীনতা'কে 'বিনয়' বা 'ভালমানুষি'র মলাট দিলেই সব উতরে যায় না। জানি, যখন কেউ কদর্য ভঙ্গিতে আঘাত করে, তার তিতকুটে পিত্তি উগরে দিতে খামখা শিকার বেছে নেয়, নিজেকে সহসা থতমত লাগে, বিশ্বাস হয় না, আমার সঙ্গে এরকম ঘটছে! আমি তো এত ভাল, নরম! মুখে কথা জোগায় না, ধাঁ করে কান্না পেয়ে যায়, জানি। কিন্তু নিজেকে শেখাব, এতে পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জানোয়ারগিরিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, মাথায় চড়ানো হচ্ছে, নিজের সম্মান বজায় না রেখে নিজেকে অপমান করছি। অন্ততপক্ষে জোরে চেঁচিয়ে উঠব, হাতটা সামনে তুলে লোকটাকে থামাবার ভঙ্গি করব, একটা সবখোল প্রতিবাদ মুখস্থ রাখব: 'আপনি এভাবে কথা বলতে পারেন না!' কিংবা 'আপনি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন, মনে রাখবেন!'

অ্যাক্সিডেন্ট দেখে পাশ কাটাব না

নিয়ম হচ্ছে, বাসের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে অ্যাক্সিডেন্টে তালগোল পাকানো বাইক, পড়ে থাকা রক্তাক্ত শরীরটরির দেখে প্রলম্বিত 'ইস্‌স' ধ্বনি শেষে নিজের সিটে ফিরে আসব, ড্রাইভারকে বিকল্প গলির হদিস দেব, অফিস গিয়ে তারিয়ে তারিয়ে গল্প করব, 'রক্তে একদম ভেসে যাচ্ছে, একজন তো স্পট ডেড, মাথাটা থেঁতলে গেছে, মেয়েটা হিঁচড়ে হিঁচড়ে রাস্তার সাইডে যাওয়ার চেষ্টা করছে, চোখে দেখা যায় না।' রাত্রে বাড়ি ফিরে ফের অনুপুঙ্খ ধারাবিবরণীর পর বলব 'ইস, খেতে ইচ্ছে করছে না গো, ছেলেটার মুখটা মনে পড়ছে।' গিন্নি বলবেন, 'সে তো হবেই, আর একটু ঘণ্ট দিই?' এ বছর আমরা এমন জন্তুবাজি করব না। পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা, এই অজুহাতে পাশ কাটাব, আর একজন মানুষ পথে শুয়ে কাতরাতে কাতরাতে মরে যাবে, গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখব, স্যান্ট্রো চড়ে বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে যাব, হয় না। আমরা গাড়ির সিটে রক্ত লেগে যাবে জেনেও, তাকে তুলে নিয়ে হাসপাতাল দৌড়ব, হ্যাঁ এক দিন অফিস কামাই হবে, পুলিশ হ্যারাস করবে, কিন্তু ওইটুকুর বদলে হয়তো একটা লোক আরও চল্লিশ বছর নিজেকে সাবান

মাখাতে মাখাতে গুনগুন করবে। এবং, ঈশ্বর না-করুন, আমারও তো একদিন এমন হতে পারে। তখন কেমন লাগবে, নিজের রক্তের গন্ধে শুয়ে সারি সারি মজাদেখন পা আর নিরাসক্ত টায়ার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখতে?

শহিদবাজি ফলাব না

'হে বঞ্চনা তুমি মোরে করেছ মহান' আউড়ে সাফারিং-এর গ্ল্যামারে গাল ফুলিয়ে বাস করা আমাদের প্রিয়তম শখ। কাকা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে, মাস্টার ফার্স্ট ডিভিশন থেকে, কেন্দ্র অনুদান থেকে, ভাগ্য সুন্দরী বউ থেকে। এবং তার কী গৌরব! ওই যে গোহার হারছি, ওইটেই জিত। সাফল্য তো সবাই পায়, শহিদ-বেদিতে ক'জন ঠ্যাং দোলায়? হাঁপানি হয়েছে এবং ডাক্তার দেখাচ্ছি না, শ্বাস টানতে টানতে এমন করে খবর দেব যেন বিশ্বজয় চলছে। বাড়িতে দুটো কালার টিভি, কথায় কথায় 'আমরা যারা গরিব' বলে ছদ্ম-ঘ্যানঘ্যান শুরু করছি। বাংলার ছেলে টিমে চান্স না পেলেই নিশ্চিত, 'অ, ও তো পলিটিক্স, শালারা আমাদের উঠতে দেবে না।' শুধু যে 'সিস্টেমের শহিদ' সই করে বাটি হাতে সিমপ্যাথি কুড়োচ্ছি, কেঁদে কোলে উঠছি, তা নয়, এই ঢালের আড়ালে হদ্দমুদ্দ লড়াইয়ের দায়িত্বটাও বেবাক এড়াচ্ছি। কারণ বঞ্চিত হয়েছি মানেই তো জেতার বাড়া, আর দৌড়ে দরকারটা কী? তাই আমাদের কাছে হেরে যাওয়া মাত্রেই হেভি মহৎ। অনুসিদ্ধান্ত: জিতে যাওয়া মাত্রেই ঘোর বজ্জাতি। এটাকেই সাঁইতিরিশ দিয়ে গুণ করলে পাব, যে কবি না খেতে পেয়ে মারা গেছেন, তিনি বাধ্যতামূলক ভাবে বিরাট কবি। তাঁর কবিতা যা-ই হোক না কেন। বাড়ি-গাড়ি হাঁকানো সাহিত্যিক, একই তত্ত্বে, খারাপ লেখক হতে বাধ্য। যিনি বস্তুগত ভাবে বঞ্চিত নন, তিনি মহৎ শিল্পী হতে পারেন না। এ বছরটা আমরা এই নির্বোধ সমীকরণে আইকন বাছব না, নিজেদের ভোলাব না। ঠিক যেমন ব্যাংক ব্যালান্স আছে মানেই লোকটা ভাল, বা জনপ্রিয় মানেই শিল্পী ভাল, এ ভাবনা চরম অশালীন, উল্টোটাও সমান গাড়ল কুসংস্কার: ব্যাংক ব্যালান্স নেই বলেই লোকটি অপূর্ব, বা সুট-বুট পরেন ব্যাকব্রাশ করেন পুরস্কার পেয়ে চোস্ত ইংরিজিতে সাহেবদের ইন্টারভিউ দেন মানেই পরিচালকটি মধ্যমানের।

র-ফলা উচ্চারণ করব

বাঙালি নিয়ে হিন্দি সিরিয়ালে কমেডি করলে রেগে যাব আর নিজের ভাষাটা ঠিক করে বলতে পারব না, দুটো একসঙ্গে হয় না। নিজের সংস্কৃতি নিয়ে অত বারফাট্টাই থাকলে বানান ঠিক করব, জামা পড়ে বই পরব না। আমরা বক্তব্য 'রাখব' না, 'পেশ' করব, র-ফলা উচ্চারণ করব, 'ফ' উচ্চারণের সময় দাঁতে-ঠোঁটে ঠেকাব না, ঠোঁটে-ঠোঁকে ঠেকাব। 'উৎকর্ষতা', 'সখ্যতা', 'পৌরুষত্ব' বলব না, 'সন্‌মান', 'আভ্যন্তরীণ'ও নয়, 'তোমাদেরকে', 'আমাদেরকে' বলার প্রশ্ন নেই, 'বাগানেতে', 'বিকেলেতে' লিখব না, যত বড় কবিই হই। 'এটা আমার *জন্যে* খুব খারাপ হবে' নয়, 'এটা আমার পক্ষে খুব খারাপ হবে'। 'অভিষেক বচ্চন একদম ওর বাবার ওপর গিয়েছে' বলে কোনও কথা হয় না। 'অভিষেক একদম ওর বাবার মতো'। 'মেরে লিয়ে বুরা হোগা', 'বাপ পে গয়া হ্যায়' আগে ভেবে নিয়ে তার বাংলা অনুবাদ করে মাতৃভাষা বললে, খাঁটি বাঙালি সত্তার গুমোরে আর বেলুন ফোলাব না। একটা পাথোমিক স্তর অবধি পোত্যেকেরই ঠিক শব্দ পোয়োগের পোয়োজন আছে।

১১ এপ্রিল, ২০০৪

নোয়ার নাও

সংবাদপাঠক : অ্যাই অ্যাই অ্যাই ক্যামেরা ভেসে গেল! সলিল তোমারটা স্টেডি করো তো, ফট করে গলাজলে দাঁড়িয়ে খবরটা পড়ে দিই। বন্ধুগণ, এটিই এই গ্রহের শেষ সংবাদ। ব্যাব্যাগো, টেলিপ্রম্পটারে ব্যাং লাফাচ্ছে, ওই গেল গেল গেল লগবগিয়ে ঝপাস। দাদারা, কুইক করছি, এক্ষুনি ডুবে যাবে আমাদের টাওয়ার, টিভি-র ধাঁ-চক্কাস কেব্‌লামি আবহমান ফুটুড্ডুম। গোটা সভ্যতারই রোয়াবর‍্যালা শেষ। এটা অফিসিয়াল ঘোষণা: পৃথিবী ওয়াক-ওভার দিচ্ছে, আর কিচ্ছু করার নেই। চোঁ-চাঁ ভেসে পড়ুন। ল্যাঙট আঁকড়ে ডাইভ দিন। গত চল্লিশ দিন ধরে যে ভয়াবহ মুষলধারে বর্ষণ পৃথিবীকে দুরমুশ করে চলেছে, সেই অসহ ঝমঝমানি সাকসেসফুল। সম্পূর্ণ স্থলভাগ ভেসে গেছে। জলের তোড়ে উপড়ে বিশ বাঁও ঘূর্ণিতে চরকি খাচ্ছে আইফেল টাওয়ার, স্ট্যাচু অব লিবার্টি, কুতুব মিনার। সাবধানে সাঁতরাবেন, পায়ে ফুটে গেলে টেটভ্যাক দেওয়ার কেউ নেই। ঢেউয়ের থাবায় ঝপাঝপ ধসছে চিনের প্রাচীর, লুকোনো পর্নোগ্রাফি ভেসে বেড়াচ্ছে অকাতরে। বেকহ্যাম আকুল হয়ে দোতলা সাবমেরিন কিনতে অ্যাড দিচ্ছেন (দালাল নহে), ঐশ্বর্যর পায়ে স্বল্প হাজা, সলমন খান মৎস্যকন্যার সঙ্গে ভেগে গেছেন প্রম্পটলি। বুলা চৌধুরীর কোচিং-এ ভর্তি হতে মার্ডার চলছে। রাষ্ট্র হাল ছেড়ে দিয়েছে। জর্জ বুশ হেলিকপ্টার চড়ে শূন্যে একলা ফড়িং। এ জিনিস নাকি আরও সাঁ-সাঁ বাড়বে। তুড়ুক সাঁতরে এভারেস্টের চাঁদিতে হাত বুলিয়ে আসা যাবে, অ্যায়সা উঠবে লেভেল। আজ রাত দশটা দশ থেকে মহাপ্রলয়। এই অংশটি নিবেদন করলেন কে সি পালের ছাতা। মহাপ্রলয়েও বাঁচায় মাথা। শুভ ঝমঝম।

নোয়া-র নোটিশ : 'আর সদাপ্রভু পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ, সে ভ্রষ্ট হইয়াছে, কেন-না পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রাণী ভ্রষ্টাচারী হইয়াছিল। তখন ঈশ্বর

নোয়াকে কহিলেন, তুমি গোফর কাষ্ঠ দ্বারা এক জাহাজ নির্মাণ কর, সেই জাহাজের মধ্যে কুঠরী নির্মাণ করিবে, ও তাহার ভিতরে ও বাহিরে ধূনা দিয়া লেপন করিবে। জাহাজ দীর্ঘে তিন শত হাত, প্রস্থে পঞ্চাশ হাত ও উচ্চতায় ত্রিশ হাত হইবে। দেখো আবার টাইটানিক বানাইয়া ফেলো না। আর দেখ, আকাশের নীচে প্রাণবায়ুবিশিষ্ট যত জন্তু আছে, সকলকে বিনষ্ট করণার্থে আমি পৃথিবীর উপর জলপ্লাবন আনিব। কিন্তু তোমার সহিত আমি আপনার নিয়ম স্থির করিব (বুড়া বহুৎ ভাল লোক, মজুরিও কম নেবে বলেই মনে লয়); তুমি আপনার পরিবার লইয়া সেই জাহাজের মধ্যে প্রবেশ করিবে। আর, শুচি পশুর স্ত্রী-পুরুষ সাত জোড়া, অশুচি পশুর স্ত্রী-পুরুষ এক জোড়া, পক্ষীদিগেরও সাত জোড়া লইয়া সমস্ত ভূমণ্ডলে তাহাদের বংশ রক্ষার্থে তোমার সঙ্গে রাখ। আমি পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্র বৃষ্টি বর্ষাইয়া যাবতীয় প্রাণীকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব।' অর্থাৎ প্রলয়ে বাকি সব ভেসে যাবে, শুধু আমার নৌকোটি পূর্ণ অক্ষত, হেলেদুলে প্লেজার-তরণী প্রায়, দিব্যি ইতিউতি। সব প্রাণী জলের তোড়ে মরে হেজে ফৌত হলে, ধীরে ড্যাঙা জাগরূক, সাফসুফ গ্রহে আমি জাহাজে মজুত 'জোড়া'গুলি টুপুস নামিয়ে দেব। তারা চরে খাবে ও ফের পত্তনিবে মানুষকেত্তন। যা প্রকৃত প্রস্তাবে অপদার্থ সিন, কারণ অ্যাদ্দিন বাদে আপনাদেরও 'দি এন্ড' ঘটছে হুবহু গোল্লা-ট্যাঁড়া প্যাটার্নে। আপনারা বই পড়েন না, যেখান-সেখান দিয়ে রাস্তা পার হন, পাগলের পোঁটলা ছিনিয়ে মেন রোডে ফেলে দেন, নাক-মুখের সৌন্দর্যকে অন্তরের সৌন্দর্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন লাগাতার। অতএব, ফের প্রলয়। সেকেন্ড এডিশনে আমিই আবার টেন্ডার পেয়েছি, বিশাল নৌকো রেডি, এবার আদেশ ডিফারেন্ট: স্রেফ দশ জোড়া মনুষ্য তুলে নেব। প্লাবনে সক্কলের খেল খতম মাজাকি হজম, শুধু এঁদের ছাড়া। দ্রুত অ্যাপ্লাই করুন। অবশ্য নিতান্ত রামাশ্যামা হলে যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। ন্যূনতম যোগ্যতা: ভি আই পি হতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন পাঠান একমাত্র কম্পিটিশন পোস্টকার্ডে, আর নীচের স্লোগানটি পূর্ণ করুন অনধিক দশ শব্দে: নোয়াই সেরা রক্ষাকর্তা কারণ...

সমকামী সংগঠন : আচ্ছা, এই 'জোড়া' ব্যাপারটা কী হচ্ছে? অ্যাঁ? আর কদ্দিন এই হেটেরোসেক্সুয়াল চক্কর চলবে বস? সমকামী কাপ্‌ল কেন নৌকোয় উঠবে না? 'স্ত্রী-পুরুষ' জোড়ার চেয়ে পুং-পুং বা দ্বি-গার্লফ্রেন্ড কম কীসে? তারা ইয়ে

করতে জানে না? সিনেমা হিট করাচ্ছে না? কানাডা, সুইডেনে বিয়ে বাগিয়ে ফাটিয়ে দিচ্ছি আর জাহাজের খোলে সংসার বসাতে গায়ে ডুমো ডুমো র‍্যাশ বেরবে?

নকশাল : এ লাথি-খাওয়া পাবলিকের ব্রেনটাই টিসটিসিয়ে গেছে। একটা ডিক্টেটর ফরমান জারি করল, একটা টাকাখোর দালাল নৌকো-হুজুগ তুলে দিল, ব্যস, ল্যাল্‌লেলিয়ে ছুটে যাচ্ছে। একবার ভাব, ওই জাহাজের খোলে বিশ হাজার লোক ধরে যায়, একটু চেপে বসলে। আর এঁয়ারা কুড়িটি ফুলটুসম্যান মিডিয়ালেলুয়াকে লাক্সারি-ক্রুজে নিয়ে যাচ্ছেন! ওরে ব্যাটা বন্ধুগণ, এই নির্বাচন বয়কট করুন। ছোট ছোট ডিঙি দিয়ে জাহাজ ঘিরে ফেলি চলুন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় : নোয়াদা-আ-আ, আমি সিলেক্টেড হতে চাই না। না-আ-আ, চাই না। শত শত ভাইবোন ভেসে যাচ্ছে টেঁসে যাচ্ছে, আমি তাদের পাশে ফেঁসে যেতে চাই। আমি শহিদিদি, ডাকলেও যাব না, টানাটানি করলে গলায় ওয়াটার বট্‌ল জড়িয়ে আত্মহত্যা করব। কিন্তু যদি দেখি সুদীপ-নয়না চান্স পেয়েছে, আমাকে চেনো না, নিজের নৌকো নিজে ফুটো করে করে আমি এইসান এক্সপার্ট, তোমার নৌকো গাবলে দিতে আদ্ধেক বক্তিমেই যথেষ্ট।

অগস্ত্য সমিতি : অত ঝামেলায় না গিয়ে পুরো জলটা চোঁ-চোঁ করে টেনে মেরে দিলেই তো মিটে যায়। ফ্রি স্ট্র দিচ্ছি।

বামফ্রন্ট : হ্যাঁ, নোয়াবাবু আমাদের কনট্যাক্ট করেছেন। আমরা নৌকোটায় 'বাইরে থেকে' উঠতে চাই। মানে এক পা ওতে দিয়ে, অন্য পা আমাদের নিজস্ব ল্যাং-বোটে রেখে চলব। এই ধন্দমূলক ট্র্যাপিজ উনি ঠিক বুঝতে পারছেন না, পড়াশোনা নেই তো। পৌরাণিক ভুল করে চলেছেন।

প্রসেনজিৎ : আরে, নোয়ার সঙ্গে দেখা করব কী, রেনি সিনগুলো শুট করছি তো এখন। নৌকোয় তো ওঠার ইচ্ছে ছিলই। কিন্তু কী করব, ডেট দিতে পারছি না।

ওয়াটারপোলো ক্লাব : পইপই করে বলেছিলুম না, আমাদেরটাই আসলি খেলা? শুনলেন না, সচিন-সচিন করে ম'লেন, এখন লাও, স্পনসররা এসে চরণাম্মেতো চাইছে! হ্যাঁ, পরশু ম্যাচ চলাকালীন গোলকি-কে হাঙরে সাবড়ে দিয়েছে, তা খেলাধুলোয় এট্টু-আধটু তো লাগবেই। তা বলে কি ওয়ান অ্যান্ড ওনলি প্রলয়-গেম থেমে থাকবে?

রামা-শ্যামা : *রাম :* আরিশ্লা, কী সাইজ দেখেছেন নৌকোটার! হেব্বি মজবুত। কী মেটিরিয়াল বলুন তো, সেগুন, না?

শ্যাম : প্লাস্টিক হতে পারে, 'প্রলয়প্রুফ' তো ওই একটিই।

যদু : অ্যাই এদিকে আয়, এদিকে আয়, হেভি ভিউ। নিন, স্কেচ করুন।

রাম : কী আঁকাআঁকি হচ্ছে দাদা?

মধু : আরে, আমরা বোসপুকুর, পুজোয় ভাঁড়ের প্যান্ডেল করেছিলাম। এবার 'নোয়ার নাও' নামাচ্ছি। ভেতরে জলের প্রতিমা। সব কটা পেরাইজ পকেটে পুরে রেখে দেব।

মধুর ছেলে : বাবা, করে ফেলেছি।

যদু : কিচ্ছু এসে যায় না বাবা, জলে জল মিশে গেছে। আরও করো। প্রলয় বাড়িয়ে দাও।

জুন মালিয়া : চান্স পাব কি না গড নোজ, কিন্তু নৌকো উদ্বোধনের ঝাক্কাস পার্টিটায় প্লিইজ ডাকতে ভুলবেন না মিস্টার নোয়া। নইলে কাগজে আমার সেদিনকার ফোটোটা মিস হয়ে যাবে।

ফেমিনিস্ট সংগঠন : আরে! এই 'জোড়া' নেওয়ার কনসেপ্টটা তো টোটাল ভুল। জাহাজে লোক নেওয়ার পারপাসটা কী? স্রেফ প্রজনন: প্রলয়ের শেষে যাতে ফের জগৎ প্রাণিময় হয়ে ওঠে। তো জন্ম দেয় কারা? মেয়েরা। পুরুষগুলো তো ব্লাডি সিড-সাপ্লায়ার। তা হলে একজন পুরুষ আর উনিশটি মেয়ে নিলেই হয়। অবশ্য বেচারির ধকল বেশি হয়ে যাবে, ঠিক আছে, ২-১৮ করে দিলুম। ইমিডিয়েটলি প্রজনন রাইজিং, দশের চেয়ে আঠেরোটা পেটে মানুষ পোষার সম্ভাবনা বেশি, এটা মাথায় ঢুকছে না? যাঁরা মোনোগ্যামি কপচাচ্ছেন, তাঁদের বলি, এখন ইমার্জেন্সি, ন্যাকামির স্কোপ নেই। ছক বদলান।

অমল দত্ত : ছক বদলাবার কথা শুনলাম যেন? কে বদলাবে? আর কারও সে ট্রেনিং আছে? জোয়ারে ৩-৫-৩, ভাঁটার সময় ৪-২-৪-১, কিংবা হয়তো উওম্যান-মার্কিং করলামই না, ডায়মন্ড সিস্টেমে চলে গেলাম। আমাকেই তো সবটা শেখাতে-পড়াতে হবে, কারও ভোকাল টনিকে তো আর হাই-টাইড সামাল দেওয়া যাবে না!

বিপাশা বসু : আমিও ফেমিনিস্ট। কোনও সুপার-স্বাস্থ্যবতী রমণী যদি না চুপ্পুড় ভিজল, বৃষ্টি পড়ার মানে কী? রাজ কপূর আমাদের শেখাননি, ঝর্না সৃষ্টি হয়েছে স্রেফ সাদা শাড়ি পরা মেয়েদের ভেজানোর জন্য? নোয়াসোনার নৌকোর ডেক-এ শাড়ি লেপ্টে জল সাপটে আমি যদি গা দুলিয়ে ভাইটালস্ট্যাট ফুলিয়ে না নাচি, তা হলে হোয়াই ও হোয়াই, রেন ইজ ফলিং ছমাছমছম?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : নীর ও নীরা খুব আলাদা নয়। দুই-ই বহতা, অতল ও ফ্রিস্টাইলযোগ্য। শুনছি অনেক মেয়ে ও একটি মাত্র ছেলে নৌকোয় উঠবে। একলপ্তে অতগুলি মেয়ের হৃদয় করতলে বৃষ্টিফোঁটার মতো মিলিয়ে নেওয়ার রোম্যান্টিকতা তো নীললোহিত ছাড়া কারও দেখি না। তবে আসল কথা, নোয়ামশাই আমাকে নিন না নিন, নৌকার নামফলকটি যেন বাংলাতে লেখা হয়।

জয় গোস্বামী : নোয়ামাধব নোয়ামাধব, তোমার নায়ে যাব
প্রলয়জলে ছলাৎ চলে, কবির কথা ভাবো?
আমি এখন দু'কুড়ি দশ, আমি এখন থিতু
রোগা মানুষ, কনুই ঠেলে যিনিই পারেন জিতুন।
(তবে) সেইখানে কে ঘুম শোয়াবে, মেঘ ধোয়াবে, পাখি?
আমায় ছাড়া বৃষ্টিব্যাপার জাস্টিফায়েড না কি?

অ্যাকোয়াকসমেটিক্স : *প্রলয়ে ডুবেছে ধরা, শুধু সেই জন্য ভেসে যাবে আপনার রূপ-লাবণ্য?* উঁহু, পাশে তো আছেই অনোখা পণ্য : অ্যাকোয়াকসমেটিক্স—নতুন প্লাবন-প্রুফ মেক-আপ কিট। পলি-পাঁক-কাদাজলেও আপনার অ্যাপিল পিছলে উঠবে। ১৩৩টি শেড, বিশ্ব-মানের, এবং অ্যান্টি-জলবিছুটি। এখনই জোর সাঁতরে আসুন নিকটতম সেন্টারে, হয়ে উঠুন: 'জলেও জ্বলজ্বলে'!

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ : আ বে যা যা, প্রলয় কি খ্রিস্টানদের কপিরাইট? আমাদের পুরাণে ওর'ম দশ-বিশটা প্রলয় এ-চ্যাপটার ও-চ্যাপটার ঘাই মারছে। বৈবস্বত মনুর কাছে এসে মাছ আশ্রয় চাইল, তারপর ও কী রে, সে ডেলি সাইজে জি পি-তে বেড়ে যায়! আজ পুকুরে ধরে না, কাল নদীকে ওভারটেক করছে। শেষে সাগরে ফেলে দেওয়া হলে মাছ বলল, ওয় মনু, এখন সমগ্র পৃথিবী প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন হবে। আপনি একটি নৌকো নির্মাণ করুন (কে কার থেকে ঝেড়েছে বোঝা যাচ্ছে?), সপ্তর্ষিদিগকে নিন, সর্বপ্রকার জীবও রাখুন। আমি পরে শৃঙ্গযুক্ত হয়ে এসে উদ্ধার করব'খনে। এখন ফের প্রলয়, মৎস্য অবতার আসবেন, শিং নাচাবেন, আমরা ল্যাসো করে দড়ি গলিয়ে, ঝুলে পড়ব।

আনন্দবাজারে প্রকাশিত খবর : *স্টাফ রিপোর্টার, জলুয়া :* উঁহু, ফেলুদার গল্প নয়, সিনেমাও নয়। চার বছরের বিল্টু থেকে চুয়াত্তর বছরের মায়ারানি দেবী, এলাকায় সকলের মুখে একটাই স্লোগান, 'মছলিবাবা'! গেরুয়াধারী হাস্যমুখ এই সন্ন্যাসী (বয়স বলবেন না, ইন্টারভিউ দেবেন না, মৌনী আছেন) প্রলয়ের জলে আজীবন থাকার জন্য সারা গায়ে আঁশ গজিয়ে দিচ্ছেন, স্রেফ মন্ত্র পড়ে। না, পয়সা লাগবে না, প্রণামী দিতে হবে এক গেলাস অ্যাকোয়াগার্ডের জল। যাঁরা বলেছিলেন, বুজরুকি, ঠোঁট আঁশে বুজে গেছে, রা বেরচ্ছে না। যাঁরা ভক্তি ভরে (পড়ুন, দায়ে পড়ে) পায়ে উপুড়, নতুন পোশাক পেয়ে আহ্লাদে ঝিকমিক করছেন। নিজেদের মধ্যেই অ্যাফিডেভিট (এপিডেবিট নয়) করে কেউ নাম নিয়েছেন ইলিশচন্দ্র, কেউ মৌরলাপ্রতিম। আশ্রমের সামনে গিয়ে দেখা গেল থিকথিক করছে ভিড়, তার মধ্যে যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরাও আছেন, ওঁদের অভিযোগ, ফেভিকল দিয়ে আঁশ আটকে এই 'মিরাক্‌ল' দেখানো হচ্ছে। ওদিকে আড়িয়াদহের জলবালিকা পুঁটিয়া (১১)-কে পরশু থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, প্রতিবেশীরা বলছেন, পাশের জলাঞ্চলে নাকি খুবসে কাল রাত্রে কালিয়া খাওয়া হয়েছে। ঠিক কী ঘটেছিল মঙ্গলবার? পুঁটিয়ার মা কাঁদতে কাঁদতে অভিযোগ করেন, 'বিটিয়াকে আঁশ গজিয়ে লিয়ে এসলাম, বিটি মছলির মতো খেলেকুদে সিঁকসাঁক ত্যায়রতে লাগল, কুথা গেছে কে জানে, উ শালা পাশের পাড়া পিকনিক করার মতো বড়কা সাইজ মছলি তুলল ক্যায়সে?' 'ও পুঁটিয়া' বলে এরপর তিনি এই প্রতিবেদকের সামনেই

প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়েন। পুলিশবোটকে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা বলেন, এভিডেন্স ভেসে গিয়েছে।

বেহুলা : নোয়া, কলা খাও। অল্টারনেটিভ বোট হিসেবে কবেই ফ্রম হিয়ার টু স্বর্গ স্রেফ একখান কলার মান্দাসে পাড়ি দিয়েছি। মিনি ভেলা। কমফি অ্যান্ড কোজি। মুশকিল, কলাগাছ এখনও একটা-আধটা পেলেও আর একটা প্রয়োজনীয় বস্তু পাচ্ছি না: মৃত মরদ। এজন্য অ্যাপ্লাই করুন। (*বিঃ দ্রঃ* পরে নেচেগেয়ে প্রাণ না ফেরাতে পারলে নর্তকী দায়ী নহে)।

রামা-শ্যামা : *রাম :* জানেন, আমার বড় মেয়েটা কাল ওবাড়ির মেজছেলেটার সঙ্গে ভেসে গেল!

শ্যাম : সে কী! দুটো আপারকাট ঝাড়তে পারলেন না?

রাম : আর মশাই, সারা দিন সাঁতরাতে সাঁতরাতে গায়ে কী ব্যথা! ড্যানা দুটো তো ছিঁড়ে পড়ছে। কোন শালারা বলত, সাঁতারের মতো এক্সারসাইজ আর হয় না!

যদু : অ্যাপ্লাই করছেন না কি?

মধু : অদ্ভুত গবেট তো আপনি! জানেন না, পুরোটা গট-আপ? সব আগে থেকে টাকা খাইয়ে সিলেক্ট হয়ে গেছে। ইন্ডিয়া থেকে শুধু সচিন আর বচ্চন।

রাম : আরে শুনুন, আমার সেজশালা স্টেটস থেকে ফোন করেছিল, এন্টায়ার নৌকোটা আমেরিকা কিনে নিয়েছে। বুশ আর টপ নাইন্টিন বিলিওনেয়ার যাচ্ছে।

যদু : আপনার শালার মোবাইলে জল ঢুকেছে। অতগুলো ব্যাটাছেলে যাবে কী করে? 'জোড়া' 'জোড়া' করে লাফালাফি শুনছেন!

মধু : লিখে নিন, হলিউডের মাইকেল ডগলাস-ক্যাথরিন জিটা জোন্‌স এক নম্বর। টম ক্রুজ তো ডিভোর্স করে দিল, নইলে ও আর নিকোল বেরিয়ে যেত। অবশ্য বিয়ে থাকতে হবে তো কোথাও বলা নেই।

যদু : না না, কিস্যু থাকতে হবে না। আদিম লিবার্টি। এক পিস ছেলে, এক পিস মেয়ে। আমি আর ও-বাড়ির চামেলি বউদি, সাপোজ ধরুন।

শ্যাম : ওদিকে জাহাজ তো ছেড়ে দিল। একটা সাসপিশাস ভোঁ শুনলাম যেন?

মধু : ভোঁ, অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি ভাঁ! রিউমার হল, আন্ডারওয়াটার অর্গানাইজেশন-রা ডুবসাঁতার দিয়ে জাহাজের তলায় সতেরো লাখ আলপিন ফুঁড়ে ফর্দাফাঁই। স্টার্ট দেবে, ব্যস, ভ্যাইপি-পাছায় হাঙরের লাথ!

যদু : হা হা, নোয়া-র বউ নোয়া ভাঙবে!

রাম : আর ছাড়ুন মহায়, কাদার ব্যাপারীর স্টিমারের খোঁজে কী দরকার? শ্যামবাজারের দিকটা ভাসবেন না কি? গরমাগরম জলসিঙাড়া ভাজছে!

২৫ জুলাই, ২০০৪

রস কষ সিঙাড়া বুলবুলি মস্তক

আমাদের ছোটবেলায় পৃথিবী ছিল ম্যাজিকের কৌটো। তখন লোকজন এত জঘন্য হয়ে যায়নি, টিভিও আবিষ্কৃত হয়নি। মানে, হয়েছে, কিন্তু সে পুষতে পারত শুধু বড়লোকরা। পর্দার ফাঁক দিয়ে বস্তুটির নীল ঝিলিক এটুখানি দেখা গেলেই সমুদ্রদর্শনের অবিকল শিরশির। আর দল বেঁধে পিন্টুদাদের বাড়ি দেখতে যেতে হত শনিবারের বাংলা সিনেমা। নায়িকার দুঃখু হলেই বোন ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে কাঁদত। এক দিন লুকিয়ে ছাঁকনি নিয়ে গেছি। যেই না সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় রোলারুলি শুরু করেছেন, বোনও অমনি পোঁ, ব্যস, ফটাস করে ছাঁকনি ধরেছি চোখের কাছে। সে কী হইহই! নাকডাকা জেঠুর কাছে কানমলা খাইয়ে তবে ছাড়লে। রাজা একবার উৎপল দত্ত-র কাছে বকুনি খেল। ও তখন সবে সাড়ে তিন। উৎপল দত্ত-র মুখটা বিরাট করে ক্লোজ-আপ দেখিয়েছে, আর উনি নায়ককে তেড়ে ধমকে উঠেছেন, রাজা ভেবেছে ওকে, আর ভ্যাঁ।

ক্লাস টেস্টে অঙ্কে দশে দশ হলে বেস্পতিবার চিত্রমালা, বাংলা সিনেমার গান। এক-একটা সিনেমার তিনটে করে গান দিত তখন। মাদার-এর একটা গান হলেই নিশ্চিন্দি। 'হতাম যদি তোতাপাখি' হবেই। আমার ফেভারিট। গাইছেন লতা মঙ্গেশকর। আমি তো জানতামই, লতা অপরূপ রূপসী, লাল শাড়ি পরা টুকটুকে ফর্সা মেয়ে। একটু মুখ নিচু করে হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইছেন, বিন্তিদি যেমন পাড়ার ফাংশনে গায়। ওই করতে গিয়েই তো পিয়ানো অ্যাকোর্ডিয়ন এক্সপার্ট সজলদার সঙ্গে ইয়ে। ও বাবা, জানাজানি হতে সে কী ধুন্ধুমার! সজলদারা তিলি যে। তারপর অবশ্য বড়মামা সোজা গটগট করে দোতলায় উঠে গিয়ে বাজখাঁই ব্যারিটোনে জাতপাত কুসংস্কার সব সটাসট শুইয়ে দিলেন। এতবার জোরে জোরে 'ছিঃ, চ্ছি ছি' বললেন যে বিন্তিদির হাত কেঁপে সজলদার পাসপোর্ট ফোটো সোজা সোফার তলায়। তুলব কি তুলব না পোজে বিন্তিদি অল্প বেঁকে স্টিল হয়েই নাকে কেঁদে অস্থির। পরে অবশ্য বলল,

আনন্দাশ্রু। নাকি তখনই বুঝেছে যে, অঘ্রাণে বিয়ে। 'আপনারা কি ভুলে গেলেন মেঘনাদ সাহা যে সাহা?'—আশি ডেসিবেলের এই মোক্ষম কোশ্চেনের উত্তর দেবে সাধ্য কার? বড়মামা আবার ছ'ফুট চার। যাক গে, বিয়ের কবিতা লিখতে গিয়ে মেসোমশাই যে আমার মিল চুরি করে 'দুটি হৃদয় মিলল আজি/ভরল তাদের সোহাগ-সাজি' লিখে বাহবা পেল, তার কী?

হ্যাঁ হ্যাঁ, যা বলছিলাম, লতা। এক দিন টিভিতে কে যেন গান গাইছে, ঘোমটা-টোমটা দেওয়া, সায়রা বানুর ধারেকাছেও লাগে না, আর জেঠিমণি বলল, 'ওই দ্যাখ লতা'। আমি তো হ্যাহ্যা করে হাসছি, খুব মজা করতে পারে জেঠিমণি। পরে যখন সব্বাই বারবার সত্যি গাললে, এমনকী বলাইদা, মনটা যেন চুপসে ফুটো হয়ে গেল। এই তো আমরা সব্বাই ভাল দেখতে, মা, বাবা, দিদিমা, মাইমা। আমি তো একেবারে বসানো রাজপুত্তুর। ঠোঁট দেখে লোকে ভাবে লিপস্টিক দিয়ে এনেছে। মাইমা ইস্কুল থেকে আনতে গিয়ে হেসে খুন। 'কী বলেন দিদি? ব্যাটাছেলের ঠোঁটে ওসব লাগাব কেন? ওর জন্ম থেকে ও রকম!' আর লতা ভাল দেখতে হল না? সব গুণবান মানুষই তো রূপবান। হবেই। রবীন্দ্রনাথকেই দ্যাখো। তারপর, গাওস্কর। তবে অমন হেমামালিনীর মতো গলা দিলেন ভগবান, আর রূপের বেলা? কিশোরকুমার ভাল না দেখতে হলে বোধহয় নিজের তত্ত্বের ওপরেই ভরসা হারিয়ে যেত। পরে অবশ্য কম্পেনসেট করে দিয়েছিলাম। সন্ধেবেলা 'সাপ'কে সাপ বলতে নেই। লতা। শুনে খুব রেগে গেলাম, কিছুতেই না! আমি 'আশা' বলব।

নেমন্তন্ন-বাড়িতে খেতে বসে কান্না গিলতাম। এত আস্তে খাই, আমার যতক্ষণে সবে লম্বা বেগুনভাজা শেষ, অন্যরা মাংসে প্রোমোশন পেয়ে গেছে। ছোট্ট কলাপাতায় পাহাড়ের মতো খাবার জমে যাচ্ছে, ভাঁড় লিক করে জল মিশছে রগরগে ঝোলে, পিছিয়ে বসতে গেলে কাঠের ভাঁজ-করা চেয়ার উল্টে যায় যায়। তারপরই আসল। গোটা ব্যাচ উঠে পড়েছে, রোল করা কাগজ নিয়ে ক্যাটারার আমার পাশে এসে থেমে আছে। পরের ব্যাচ বসতে পারছে না। বিন্তিদির মা বারবার চশমা ঠিক করছেন। বড়মামা সাঁইসাঁই নস্যি নিচ্ছেন আর বলছেন, 'ক্যাবলাটাকে উঠিয়ে নিয়ে যাও!' উরেব্বাপ, বড়মামা অঙ্ক পারতাম না বলে 'সাদা গাধা' অবধি বলেছেন। বেহদ্দ ফর্সা ছিলাম কিনা। যাক গে, মাইমা ঠুসে খাইয়ে যাচ্ছে, 'আহা, ছোট বাচ্চা, খাবে না?' ছোট বাচ্চা অঝোরে কাঁদছে আর কোঁতকোঁত করে গিলছে।

রাত্তিরে দোতলায় ঢালাও বিছনায় শুতে যেতে হল। সে আবার টুম্পার কী ভয়। কানে কেন্নো ঢুকে যাবে। আমি তো হাঁ। কিন্তু অমন ভ্যাবলা মেয়েরও সাপোর্ট জুটে গেল। ক্লাস সিক্সের টুনটুনি পোড়া-গাল নিয়ে (না না, আগুনে না, ওর পানে চুন বেশি ছিল) বলল, জানিস একবার কী হয়েছিল? একটা ছেলে সব সময় বলে মাথায় ব্যথা মাথায় ব্যথা, শেষমেশ মা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে। ডাক্তার টেস্ট-ফেস্ট করে দেখেন, দূর, সব নর্মাল। তখন যেই না, 'ইস্কুল ফাঁকি দেওয়ার জন্যে মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে, বাঁদর?' বলে তার চুল ধরে রাম-টেনেছেন, ব্যস, কপালের ওপর থেকে খুলিটা পুরো খুলে এসেছে জগের ঢাকনার মতো। কান দিয়ে কেঁচো ঢুকে কুরে কুরে খেয়ে রেখেছিল। শুনে আমি, কী বলব, পা-ফা খোলা থাক বাপ, লেপ কানে দিয়ে শুলাম।

পরদিনের সংবাদ, বাসরে ফার্স্ট হয়েছে আশিসদা। 'লালকুঠি'র গান গেয়ে। সেও আমার টিভিতে শোনা, 'কারও কেউ নই কো আমি, কেউ আমার নয়, কোনও নাম নেই কো আমার, শোনো মহাশয়।' যা অবাক লাগত, বলার না। বেচারা হেভি একলা নয় বুঝলাম, মা-বাপ মরেহেজে একসা, কিন্তু নাম অবধি নেই কেন? ক্লাসে কী বলে ডাকবে? রোল নম্বর ওয়ান? ও, টিভিতে আর দেখতাম 'চিচিং ফাঁক'। মাইকেল এলে তো কথা নেই, ভাল্লাগায় বুক ফুলে ঢোল। মাইকেল হচ্ছে ছোট্ট কথা-বলা পুতুল, মেয়ে দেখলেই বলত, 'অ্যাই, তুমি আমায় বিয়ে করবে?' সেই অভ্যাস যে তখন অতটা ভেতরে চারিয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারিনি।

দোলের দিন শুধু গরুর গায়ে রং দিতাম। প্যাতপেতে পিচকিরি দিয়ে। একবার এক বিধবা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, গরুর মতোই সাদা আর নিরীহ জ্ঞানে ছুট্টে গেছি, তারপর কী গালাগাল রে! কিছুক্ষণ পর পিঠে প্রবল বেলুন খেয়ে স্তম্ভিত হয়ে ইদিক উদিক তাকাচ্ছি, হেনকালে গুরমিত সিং হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে সাঁড়াশির মতো আঙুলে চোয়াল ফাঁক করে মাজনের কায়দায় দাঁতে মোবিল মাখিয়ে দিল। মানুষের প্রতি বিশ্বাস সেই থেকেই নেই। আবার এও ঠিক, দিন তিনেক বাদে দুপুরবেলা বুম্বার সঙ্গে বসে গুরমিতকে মেরে পুঁতে ফেলার একটা প্ল্যান প্রায় পেকে এসেছে, এমন সময় ও এসে বলল বড়দের ম্যাচে ছোটদের চার জনকে নেওয়া হবে, আমরা কর্কেট বলে খেলতে রাজি কি? ব্রাহ্মণের ছেলে তো, তক্ষুনি ক্ষমা করে দিলুম। কিন্তু অশোকগড়ের বোলাররা কী নিষ্ঠুর! আর কর্কেট কী শক্ত, ডিউজের বাবা! তার ওপর ফুলটস দিয়েছিল।

এমনিতেই তো এক দিন ব্যাটিং-এর সময় জেঠিমণি দোতলা থেকে জিজ্ঞেস করেছে, 'কার মতো খেলতে চাও' আর আমি বলেছি 'সুরজিৎ সেনগুপ্ত', কী হাসি সকলের! আরে, আমি তো ভেবেছি আমরা যেমন শীতে ক্রিকেট খেলি অন্য সিজনে ফুটবল, সবাই তাই। বড় বড় লোকগুলো যে একটার বেশি দুটো খেলা খেলতে পারে না কে জানত। তবে খুব ভাল স্প্রিং দিতাম। 'স্পিন' বললে তার মাহাত্ম্য থাকে না কি? পরে যেমন শুনলাম পেনাল্টি কিক। আরে, সারা জীবন গাঁতিয়ে 'প্ল্যান্টিক' মেরে এলাম, গোলকিপার প্রাণপণ 'ড্রাইভ' দিয়েও বাঁচাতে পারল না, যত সব ইংরিজিয়ানা! আমাকে সবাই বলত ওইটুকু ছেলে, কী ভাল অফস্প্রিং দেয়। না, তখন কারও মনে কু ছিল না। কেউ অফস্প্রিং-এর অন্য মানেও জানত না।

অমৃত দত্ত-র এক হাতে ছ'টা আঙুল, আর প্রচণ্ড পবিত্র মন। যা বলবে ফলবেই। কথায় কথায় সবাইকে অভিশাপ দিত। তাও ভাগ্য, সেকশন-বি। ওদের ছেলেরা দুঃখ করত, লাল স্কেচপেন নাকি একটা দিনও রাখতে পায় না। অমৃত বলে 'দে, নইলে কালকেই অন্ধ হয়ে যাবি।' নবেন্দুর পাঁচ পাঁচটা মিকি মাউসের জলছবি কেড়ে ওর সামনেই পেনের পেছন দিয়ে ঘষে ঘষে ক্লাসওয়ার্কের খাতায় লাগিয়েছে। জলছবি না তো, প্রাণ! আমাকে ছোটমামা তিন পাতা কিনে দিয়েছে। দেওয়ার কথা ছিল অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের জার্সি বা গোটা ক্রিকেট সেট। তারপর বলল, সারা বাড়ি মোহনবাগান, তুইও হয়ে যা, মোহনবাগানের জার্সি পাবি। কিন্তু বুয়াদা যে ইস্টবেঙ্গল। বিছনায় এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম। শেষে ছোট্ট একটা ক্যারম বোর্ড কিনে দিয়ে, মোহনবাগান করে নিল। যাক গে, ডেলি কলাগাছ তো খেলা যাবে। একবার রেড ফেললে আর চিন্তা নেই। পঞ্চাশ।

যা বলছিলাম, অমৃত। এক দিন ওদের মিস আসেননি বলে জয়েন্ট ক্লাস হল, অমৃত আমার পাশে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম। বলল, ও নাকি ওর বাবার গুরুদেব। মানে, গুরুদেব যখন মারা যাচ্ছেন, তখন তো ঘরে কারও ঢোকার পারমিশন নেই অমৃতর বাবা ছাড়া। তিনি পা জড়িয়ে ধরে বললেন, গুরুদেব, হাউহাউহাউ, আপনাকে ছাড়া বাঁচব কী করে? গুরু বললেন, আমি তোর ছেলে হয়ে ফিরে আসছি সামনের জুনে। বাঁ হাতে ছ'টা আঙুল হচ্ছে সিওর সাইন। আমাদের গোটা বেঞ্চ মাথা নেড়ে জানাল, একজ্যাক্টলি ক্ষুদিরাম কেস। মাসির ছেলের গলায় ফাঁসের দড়ির দাগ ছিল কি না? একটু পরেই

অমৃত আমার সেন্টেড রবারটা চাইল। কমলা রঙের, দেখলেই লজেন্সের মতো খেয়ে নিতে ইচ্ছে করে। কত কাকুতি করে পেয়েছি। ওটা গেলে আর কুকুর-রবার কিনে দেবে না। টানলে মাথা একদিকে ল্যাজ একদিকে, মধ্যিখানে টুকটুক করছে। দোনামনা দেখে জোকারের মুখ দেওয়া মৌরি লজেন্সের প্যাকেটটাও ডিম্যান্ডে জুড়ে দিল। কী বলব, অ্যায়সান রাগ চড়ে গেল না, বললাম, দেব না যা। আশেপাশের চারটে বেঞ্চ তো ভয়ে স্তব্ধ। হ্যাঁ, সেই তর্জনী উঠল। 'কাল সকাল হওয়ার আগেই তুই মরে যাবি।'

রাতে শুতে যাওয়ার আগে দুধ আর নামে না! হুট করে মনে হল, প্যান্টের পকেটে যে দশ পয়সার 'কারেন্ট' রয়েছে, এখনই মেরে দেব কি? জিভের ডগায় কারেন্ট রেখে বসে আছি, চোখ আর জিভ ইকুয়াল জলে ভেসে যাচ্ছে। বালিশে 'রাম' লিখতে অবধি ভুলে গেলাম। কঙ্কাটাকে আর ভয় কী? ছোটমামা টিউশনি থেকে ফেরার সময় যেটা তাড়া করেছিল, যার ভয়ে রাত্তিরে বাথরুমে গেলে কালো কালো গাছের দিকে ঠায় তাকিয়ে ছ'বার চেঁচাই, 'দিদিমাআ, দাঁড়িয়ে আছো তোওও?', কাল থেকে সে-ও থাকবে, আমি না। ব্ল্যাকিও দাপাদাপি করছে। কুকুররা সব আগে টের পায়। কিন্তু সকালে উঠে দেখি, বাঃ, দিব্যি। চোখফোখে অবধি দেখতে পাচ্ছি। টিফিনে বি-সেকশন গিয়ে অমৃতকে ভেঙিয়ে এলাম। সে বললে, তথাস্তু পড়ে গেছিল। তথাস্তু মুনি বসে একদম সমান গ্যাপ দিয়ে আঙুলের কর গুনে চলেছেন। এমনি মানুষের কোনও ইচ্ছে চেঁচিয়ে বলার সময় যদি তথাস্তু পড়ে যায়, সেটা ফলবেই। আর, সিদ্ধপুরুষরা বর বা শাপ দেওয়ার সময় তথাস্তু পড়ে গেলে কাটাকুটি হয়ে যাবে। জন্মে শুনিনি। গলার চামড়া টেনে ব্যথা করে করে যে গড প্রমিস, তা অবধি কাটা যায়, রাজর্ষিদা তো বিদ্যা ছুঁয়ে মিথ্যে বলেছে, কিন্তু তথাস্তু? যাক গে, দিনকাল ভাল চলছে। তা হলে সেই যেবার বামন ভিখিরিকে ভেঙিয়েছিলাম বলে মা বলল আমিও ওর'ম বেঁটে হয়ে থাকব, কিছুতেই লম্বা হব না, সেটাও কেটে যাবে, না?

লোডশেডিং হলে নিয়ম গানের লড়াই, আর আঙুল দিয়ে দেওয়ালে হরিণের ছায়া বানানো। মাইমা অবশ্য তেরোর নামতা বলাত, আর দেরি হলেই বুঝত মুখস্থ নেই, আগেরটার সঙ্গে তেরো যোগ করে দিচ্ছি। কোনও মতে ফাঁক গলে বারান্দায় বসতে পারলেই, ছোটমামা। গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে গাইবে, 'কী গান শোনালে আজি অতি চমৎকার—চমকে ওঠে চৌকিদার!' এ

ছাড়া মিলের চ্যালেঞ্জ। যেই না ছোটমামা জোরসে বলবে 'হাঁস বক পায়রা ইট চুন সুরকি', আমায় তক্ষুনি পরের লাইন বলতে হবে। একবার বললাম 'ডানলপ ব্রিজ থেকে বালি খুব দূর কি?' কী গর্ব হল! তাও তো তখন 'পুড়কি' শব্দ ভোকাবুলারিতে ঢোকেনি। কিন্তু লোডশেডিঙে বোঝা যেত, শুধু কঙ্কাটা নয়। মেসোমশাই যখন বাজি ধরে পোড়ো বাড়িতে রাত কাটাত আর মুসলমান ভূত 'আল্লার দোয়া মাগো বাবুজি' বলে তক্তপোশের চার দিকে ঘুরছিল আর চন্দননগরের সাহেব ভূত 'ও মিস্টার, হোয়াই হ্যাভ ইউ কাম হিয়ার' বলে ছড়ি নাচিয়েছিল, তারা আসতে কতক্ষণ? তার ওপর সেকেন্ড বিল্ডিং-এর কাণ্ডটা আমার জন্যই হয়েছে।

আমাকে স্কুলের গাড়ি নিয়ে যেত। গাড়ির স্টুডেন্টরা অন্যদের চেয়ে এক ঘণ্টা আগে পৌঁছয়। তখন গোটা স্কুল ফাঁকা। অতএব সাত জনে খেলার গ্রুপ হবেই। মিতুল তো খেলবে না। পায়ে ডিফেক্ট। ওর সঙ্গে খেলতে হবে 'আগের জন্ম'। তোমার জন্ম কবে, ৮.৪.১৯৭০? তা হলে ৮+৪+১+৯+৭+০ = ২৯। ব্যস, ফাউন্টেন পেন ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ২৯টা কালির ফোঁটা ফ্যালো অঙ্ক খাতার সাদা পাতা ছিঁড়ে। তারপর কাগজটা আট ভাঁজ করে, খুললেই—অদ্ভুত বিশাল ছোপ। ওটা কী রে? মন দিয়ে সবাই মিলে ঝুঁকে দেখলেই বোঝা যাবে প্রজাপতি, বা সজারু, বা গাছ। আগের জন্মে তুমি ওইটা ছিলে। ওদিকে এ জন্মে আমাদের রেক্টর মারা গেলেন। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অমন ভয়াবহ লোক হয় না কি? কোট-প্যান্ট পরে সর্বক্ষণ পায়চারি আর বেগড়বাই দেখলে ক্লাস থেকে টেনে বার করে কী মার! একটা স্কেল ভাঙলে ক্ষতি নেই, ওঁর ড্রয়ারে ভর্তি। যাক গে, দ্যুতিময় দেখেছে উনি পায়চারি করছেন সেকেন্ড বিল্ডিঙের সামনেটায়, মাথাটা নেই। আমিই বললাম, চ প্ল্যানচেট করি। সবাই পা টিপে টিপে সেকেন্ড বিল্ডিঙে ঢুকে অরসন মিসের ক্লাসরুমে গোল হয়ে হাত ধরাধরি করে 'রেক্টর রেক্টর' বলেছি কি বলিনি, ও মা, বদ্ধ বিল্ডিঙে রাশি রাশি ইট পড়তে লাগল। বেঞ্চি উল্টে সে কী পড়িমরি দৌড়! সবচেয়ে জোরে দৌড়ল আমাদের লিডার রাজর্ষিদা।

রাজর্ষিদা বাজে লোক। 'মাক্কালীর দিব্যি' বলে, 'মাইরি' বলে। এক কাঁধে হাত রাখলে মা মরে যায় সবাই জানে, তবু জয়দীপের এক কাঁধে হাত রেখে কথা বলেছে। এক দিন ফিসফিস করে বলল নার্দা আর কার্মাকে দেখেছিস? এমনিতে কিছু দেখতাম না তা না। জেনারেল তারাকিমোর খাঁচায় সবুজ কাঁচুলি

আর সুপার-স্বচ্ছ ঘাগরা পরা ডায়না, তারপর সোনাবেলায় যে ওরা বিয়ের পর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াজড়ি করে বালিতে গড়াচ্ছিল, বেতালের শুধু একটা জাঙিয়া, হাঁ করে কি গিলিনি? আর বাহাদুরের গার্লফ্রেন্ড বেলাকে অন্যদের এলেবেলে লাগলেও আমি পাতায় চুমু খেয়েছি দুপুরবেলা। কিন্তু সেটা প্লেটোনিক চুমু। ম্যানড্রেক-এ লোথারেরই ফ্যান ছিলাম। বছরভর যে নার্দা-কার্মা বিকিনি পরে রোদ পোয়াচ্ছে, নজরেই পড়েনি। রাজর্ষিদা আমার ইন্দ্রজাল কমিক্সগুলো নিয়ে ডটপেন দিয়ে চৌকোগুলো দাগিয়ে দিল। কী অসম্ভব খারাপ! আর চন্দ্রাণী আমায় একা পেলেই বলত, ওরে আমার ড্যাশ রে! এই আপনাদের গা ছুঁয়ে বলছি, ড্যাশে কী ফিল ইন দ্য ব্ল্যাংক করতে হবে, আমি জানতাম না। খুব রেগে যেতাম। আইসপাইসে চোখ জোরে চেপে গুনছি, চন্দ্রাণী পেছনে ড্যাশ ড্যাশ বলে সুর কেটে ঘুরছে। তারপর যখন ওকে আর জয়ন্তকে নিয়ে ব্যাড মিনিং করে ছড়া লিখলাম আর মরাল সাইন্স মিস এসে ঠাস করে চড় মারলেন, সে কি ওঁর উচিত হয়েছিল?

কিন্তু রাজর্ষিদা কী ভাল ব্রুস লি-র গল্প বলত, ওঃ! সেই যেবার ব্রুস লি-কে দুশোটা গুন্ডা ঘিরে ফেলল, সব্বার হাতে মেশিনগান, আর ব্রুস লি-র হাতে শুধু নানচাকু? রাজর্ষিদা দেখাল স্কেল নিয়ে, কীর'ম নানচাকু সাঁই সাঁই করে ঘোরাচ্ছে, হাজার হাজার গুলি লেগে ছিটকে যাচ্ছে চতুর্দিকে, শেষকালে সব ক'টা গুন্ডা মরে গেল আর ব্রুস লি-র গায়ে আঁচড়টাও লাগেনি। আর ব্রাজিলের ছেলে কালোমানিক পেলে? এমন কাটাতে জানে, একবার এগারো জনকে কাটিয়ে নিয়ে গোললাইনে পৌঁছে গেছে, কিন্তু গোল দিল না। আবার ফিরে এল নিজের বক্সে। তারপর আবার এগারো জনকে ডজ, ফের গোললাইনে। পুরো স্টেডিয়াম চুপ। না, গোল দিল না। তারপর আবার। এর'ম পাঁচবার করে, তবে গোল দিল। সাধে কি ওয়ার্ল্ড কাপে দু'হাজারটা গোল আছে? আমি অবশ্য জানতাম এক হাজার। কিন্তু বলতে গেলেই ঝঞ্ঝাট। 'রস কষ সিঙাড়া বুলবুলি মস্তক'-এ এক্সট্রা জোরে মারবে। তখন ডান হাতটা বাঁ-র চেয়ে ছ'পোঁচ বেশি লাল নিয়ে ক্লাসে যাও।

এই রে স্পেস কমে আসছে। আদ্দেক কথা তো বলাই হল না। গৌতম-শুভ নেড়ি কুকুরের পিঠে চেপে গোটা পাড়া ঘুরে বেড়াত, পঞ্জাবিদের ছোট্ট ছেলে পামা মুঠো মুঠো ধুলো খেত আর আমরা আঁতকে মরতাম, সেন্টুকে রুদ্র সংঘের মাঠে বীর হনুমান তাড়া করল আর অডিয়েন্সে নূপুরের মা এত

হাসলেন যে হনুমান ফ্ল্যাংক চেঞ্জ করে সেদিকে বোম্বাই লাফ, বুম্বার ঠাকমা মারা যাবেন কি না ঠিক করতে কড়ির-গয়না পরা গরু এল—সে কলাপাতা খেলে, যাবেন, না খেলে: যাবেন না। বড় হয়ে অন্যদেরও ছোটবেলার গল্প শুনেছি। পুতান 'চাওয়া-পাওয়া' দেখে সারা রাস্তা জেঠির হাত ধরে চোখ বন্ধ করে এল, উত্তমকুমারকে দেখেছে, আর কাউকে দেখবে না। বুজাইকে দু'বছর ধরে একটা শয়তান লিডার-মেয়ে খেলায় নিত না, ও একলা চাতালে বসে আস্তে আস্তে ছিঁড়ে টিফিন খেত। উবু দশ কুড়ি গোনার সময় অন্যদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লে ওকে না গুনে বেরিয়ে যেত, যেন ও নেই। হেঁটে হেঁটে ফিরে আসত আবার ছোট্ট টিফিন বাক্সটার পাশে। গলার কাছটা কী ব্যথা করে, না? আর আমরা ভাবি টনসিল। যাগ্গে যাগ।

৪ ডিসেম্বর, ২০০৫

ফলিবেই ফলিবেই

২০০৬-এর ভবিষ্যদ্বাণী

মহাশ্বেতা নোবেল পাবেন

পরের দু'হপ্তা ধরে হাসপাতালে যত মেয়ে জন্মাবে সবার নাম হবে 'মহাশ্বেতা', সব ছেলের নাম হবে 'খেরিয়া শবর'। পাগলের মতো দৌড়ে সবাই মহাশ্বেতা দেবী-কে দর্শন করতে যাবে ('লাইনে আসুন লাইনে আসুন', ওদিকে বাঁয়ের কানাগলিতে সটাসট কুপন ব্ল্যাক) আর নিজ ছেলেদের গাঁট্টা মেরে বলবে, 'তাড়াতাড়ি যা না বাঁদর, পিসির পায়ে পেনটা ছুঁইয়ে আয়!' মাধ্যমিকের আগে মহাশ্বেতার পা নীল হয়ে যাবে। মমতা দাবি করবেন, বছর দশেক ধরে বলে আসছেন চৌরঙ্গির নাম হোক 'মহাশ্বেতা স্কোয়ার', বুদ্ধবাবু শোনেননি বলে এক্ষুনি পদত্যাগ চাই। ফুটপাথের পোস্টারের দোকানে শাহরুখের পাশে মহাশ্বেতার হাসিমুখ। রেশন কার্ডের মোড়কে ল্যামিনেট করা রবীন্দ্রনাথ-মহাশ্বেতার জোড়াছবি সক্কলের শেল্‌ফে (তলায় কল্কা করা: 'বাঙলা সাহীত্যের রাজা-রাণী')। বইমেলায় 'মহাশ্বেতা রচনাবলি'র জন্য লাইন পড়বে ডালহৌসি অবধি, স্টলের কোলাপসিব্‌ল গেট ভেঙে পড়বে এগারো বার, লাথালাথি আর কনুইগুঁতোর চোটে হাসপাতালে যাবেন ২১৩৪ জন, কিন্তু লাখে লাখে পুলিশ, ইস্ক্রুপ হাতে মিস্তিরি (কোলাপসিব্‌ল তক্ষুনি সারাবার জন্য), স্টার্ট দিয়ে রাখা অ্যাম্বুল্যান্স—সমস্ত আগে থেকেই মোতায়েন ছিল বলে গিল্ডের ভূয়সী প্রশংসা।

সব অসুরের মুখ গ্রেগ চ্যাপেল

এক ঐতিহাসিক মিটিঙে বাংলার সব পুজো-কমিটি মিলে ঠিক করা হবে, থিম-ফিম যা খুশি হোক, প্যান্ডেল ভাঁড়ের হোক বা গোপাল ভাঁড়ের, গোটা

রাজ্যে অসুরের মুখ হবে হুবহু গ্রেগ চ্যাপেল। মহিষের বদলে ক্যাঙারুর পেট ফাটিয়ে উঠে আসছেন। হাতে ক্রিকেট-ব্যাট বা আন্ডার-আর্ম বল। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম শ্বেতাঙ্গ অসুর বলে চুনকামের দাম বেড়ে যাবে। কুমোরটুলির চতুর্দিক থেকে, নীল বা সবুজ বা কালো এক পোঁচ বুলিয়ে নিয়েই 'এঃহে, স্লিপ অব টাং' বারে বারে ধ্বনিত। প্রায় সব প্যান্ডেলেই শোভা পাবেন ডাকিনী-যোগিনী টাইপ 'অ্যাসিস্ট্যান্ট-অসুর' কিরণ মোরে, রবি শাস্ত্রী। ছ'আটটা সিংহ তাঁদের পাইকারি রেটে কামড়াচ্ছে। চ্যাপেল তো ফালাফালা। 'সেরা চ্যাপেল' পুরস্কার ঘোষণা করবে রং কোম্পানি। সে পুরস্কার 'বড়িশা স্পোর্টিং' পাওয়ায় পার্শিয়ালিটির গুজব। 'মুদিয়ালির চ্যাপেলটা আরও হরেন্‌ডাস হয়েছিল না রে?'

বুশ সোমালিয়া-য় বোম ফেলবেন

ফেব্রুয়ারির দু'টো ব্লাস্টের ধারেকাছেই আফ্রিকান ভিখিরি ঘুরঘুর করছিল: পেন্টাগনের রিপোর্ট। বুশ মার্চে বোম ফেলবেন ইথিওপিয়ায়। এপ্রিলে ঘানায়। মে-তে সোমালিয়ায় আখাম্বা একখানি টপকে দিতে সবাই একটু নজ্জা পাবে। টিভিতে টানা দেখাচ্ছে তো, পাঁজরা উপচে ওঠা কঙ্কালগুলো সব পিত্তি নিংড়ে ধুঁকছে আর মাঝে মাঝে তাদের মুন্ডু বা হাত একটুখানিক করে উড়ে যাচ্ছে। যুগ যুগ ধরে পেটে গিঁট বেঁধে কাঁউকাঁউ করে মাটি চিবোচ্ছে বিষপাতা চুষছে, ভাতের সঙ্গে স্প্লিন্টার দিলেও মেখে খায়—এরা টেররিস্ট? বুশের ফাইলে প্রিন্টিং মিসটেক হয়নি তো? জর্জের সিধে লব্জ: আরে, সব ধাপ্পাবাজি। হতভাগাগুলোকে লাখ লাখ ডলার অনুদান দিচ্ছি ফি বছর, এতগুলো রোকড়া যাচ্ছে কোথায়? সব অমন স্কেলিটন-টাইপ রোগা কেন? নির্ঘাৎ না খেয়েদেয়ে টোটাল-টা দিয়ে 'ওয়েপন অব মাস ডেসট্রাকশন' বানাচ্ছে। তা ছাড়া ওই ভেকু-ভেকু তাকানো আর এক্সট্রা-স্লিম চেহারাপত্তর দেখিয়ে মায়া কাড়া, হাইলি সাসপিশাস। কায়দার নাম 'ম্যানুফ্যাকচারিং সিমপ্যাথি'। তুমি ভাবছ কোঁচড়ে কাঁদুনে বাচ্চা, ওদিকে নোংরা কাঁথায় মোড়া আর ডি এক্স। টনি ব্লেয়ার-এর তবু ফোন: 'প্রভু, একটু নধর দেখে দেশ অ্যাটাক করলে হত না?' বুশ: 'ওই বুদ্ধির জন্যই তো চামচা থেকে গেলে টনি। সোজা অঙ্কগুলো আগে অ্যাটেম্পট করতে হয়। তিন মাসে স্ট্রেট তিনটেকে হাঁকড়ালাম, শালা এমন নিকিরি, রিটার্নে একটা বুড়িমা চকলেট বোম অবধি মারতে পারেনি!' সংবিধান তুবড়ে

ইউ এস কংগ্রেসের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত: ২০০৮-এ ইলেকশন হবে না। বুশকেই তৃতীয় টার্মের জন্য প্রেসিডেন্ট করা হবে।

বইমেলা উদ্বোধন করবেন বোর্হেস

নির্ধারিত প্ল্যান-প্রোগ্রাম ভেস্তে বুদ্ধবাবুর আঁতেল-ভেটো: আর্জেন্টিনার লেখক হোর্হে লুই বোর্হেস বইমেলা উদ্বোধন করবেন। বোর্হেস মারা গেছেন '৮৬ সালে, কিন্তু আমেরিকায় আবিষ্কৃত 'প্ল্যানচেটোমর্গিফায়ার' ৩৪২৬ কোটি দিয়ে কিনেছে পঃ বঃ সরকার (এই যন্ত্রে যে কোনও মৃত মনীষীকে মর্তে এনে পাঁচ মিনিটের বক্তৃতা দেওয়ানো যায়)। এ টাকায় কত লোককে পুনর্বাসন দেওয়া যেত তা নিয়ে বুদ্ধিজীবীরা তর্ক তুলবেন না কারণ সক্কলে বোর্হেসের পাশের চেয়ারে বসতে লবি-ব্যস্ত। বিশাল প্রেস কনফারেন্সে ত্যাঁদড় রিপোর্টার উঠে বলবেন, 'আচ্ছা, কলকাতা বইমেলা উদ্বোধনে আপনার একবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে এক ভদ্রলোকের নাম মনে পড়ল না?' (দর্শকদের পাঁচ মিনিট হাততালি)। বুদ্ধবাবু পটাং: 'তা হলে কি রাজ্য সরকার ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র সদনে যে স্পেশাল ফাংশনের ব্যবস্থা করছে, তার উদ্বোধনী ভাষণটা বোর্হেস দিতেন?' (দশ মিনিট হাততালি)। বোর্হেস-বক্তিমে অবশ্য তেমন জমবে না, কারণ যাদবপুরের কম্পারেটিভ লিটারেচার-এর ছেলেমেয়েরা এমন সমস্বরে তাঁকে ভয়ানক কঠিন সব প্রশ্ন করতে থাকবে এবং প্রতি বাইশ গজ অন্তর একজন করে সাধারণ লোক 'ভূ—ত, ভূ—ত' বলে চেয়ার উল্টে অজ্ঞান হয়ে যেতে থাকবে, তিনি বিরক্ত হয়ে ভ্যানিশ। আর রবি-ফাংশনটিও বাতিল, কারণ যন্তরটি রাখা হবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গুদামে, এবং ২৪ বৈশাখ সন্ধেয় সেটা বের করতে গিয়ে দেখা যাবে, সবচেয়ে ভাইটাল তার-টা ইঁদুরে কেটে দিয়েছে।

রামদেবজি'র এড্স-বিরোধী প্রাণায়াম

এমনিতেই 'আস্থা' চ্যানেল খুলে পেটরোগাদের 'কপালভাতি' প্রাণায়ামের শোঁ-শোঁ শব্দে এবং টাকলুদের নখে নখ ঘষার শব্দে পঃবঙ্গে কান পাতা যাচ্ছে না। রামদেবজি ডেমনস্ট্রেশনসহ বলে দিচ্ছেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্যায়সান কোরিওগ্রাফিতে ছ'দিনে চালশে যোলো দিনে উদুরি ছাব্বিশ দিনে ডায়াবিটিস আর ছত্তিরিশ দিনে নখকুনি সেরে যায়। অ্যালোপ্যাথি ত্রাহি ত্রাহি শব্দে হাঁক পাড়ছে। তার ওপর এ বছরের গোড়ায় বেরোবে 'পোড়াকপালভাতি': দুর্ভাগ্য

রোধের অব্যর্থ নিদান। খালি গায়ে কৌপিন পরে ভক্তিভরে প্র্যাকটিস করলে লটারি বাঁধা। বছরের অন্তিম ভাগে উনি বাতলাবেন মোক্ষম এড্স-রোধী আসন। বাঁ নাক টিপে নৈর্ঋত কোণে তাকিয়ে ডান গোড়ালি দিয়ে (নিজ) ডান নিতম্বে লাথ। তারপর উল্টোটা। ব্যস। ঝাড়া সাত মিনিট, দিনে তিন বার। অবশ্য এর সঙ্গে স্মল পয়েন্টে দু'টো ফুটনোট। জীবনে কক্ষনও সেক্স করিবে না। আর, স্ব-স্কিনে কভু সুঁই ফুঁড়িবে না। উভয়ই (অর্থাৎ নিঘিন্নে যৌনতা আর ব্যথাময় ইঞ্জেকশন) টোটাল বকোয়াস, সরল প্রাচ্যকে শয়তান-পাশ্চাত্যের বখিয়ে দেওয়ার কল। এই সামান্য দু'টি আনুষঙ্গিক নিষেধ মানলেই, প্রাণায়ামের জোরে এড্স কালাপানি পার।

সুভাষবাবু ভাড়া কমাবেন

ভোটের ঠিক তিন সপ্তাহ আগে হঠাৎ কলকাতাবাসীর হেঁচকি অবিরত। অটো ড্রাইভারদের অসম্ভব ভাল ব্যবহার, ট্যাক্সিঅলারা ব্যাগভর্তি খুচরো বাড়িয়ে: 'কী আশ্চর্য দিদি, সতেরো টাকা চল্লিশ হয়েছে, কুড়ি টাকা দিলেন যে বড়! নিন বলছি দু'টাকা ষাট ফেরত। রক্ত জল করা রোজগার আপনার!' কন্ডাক্টররা একটুও ওভারটেক করতে না চেয়ে 'অ্যাই অ্যাকেবারে রোক্কে' চেঁচিয়ে থুত্থুড়ে বুড়িকে ধীরেসুস্থে নামতে সাহায্য। প্রত্যেক তিন স্টপ অন্তর গোলাপজলের ছিটে, লেডিজ সিটে সবাইকে গোড়ের মালা, জেন্টসদের সর্বাধিক ইয়াংকে 'কল্লোল'-এর ক্যাসেট। অটোয় মৃদু রবীন্দ্রসংগীত। সোম-বুধ-শুক্র কণিকা, মঙ্গল-বেস্পতি-শনি সুচিত্রা। রবি বাংলা ব্যান্ড। এর ওপর মধুকিশমিশের ন্যায় ঘোষণা: যানবাহনের ভাড়া সোঁ করে নীচে। দেড় টাকায় ডিপো টু ডিপো। প্রিয় যাত্রী, মোবাইল অফ রাখুন। পাশের প্যাসেঞ্জার গান শুনছেন। অফিসটাইমে দেরি হয়ে গেলে ট্রাফিক পুলিশের ওয়াকি-টকি থেকে ফোন করে দিন (ফ্রি)। সুভাষবাবু: 'ট্রাফিক-বিপ্লব আগের বছরেই হওয়ার কথা ছিল, একটা ফাইল হারিয়ে গেছল বলে একটু দেরি হল। নিন্দুকরা বলছেন ভোট-ফোট, আমাদের সেবা নিয়ে কথা। তবে ওরা এসে গেলে আর...।' ওরা যাতে না আসে, সাধারণ মানুষ সকাল থেকে 'জয় সুভাষ জয় সুভাষ' রবে পোলিং বুথ-যাত্রা। সুভাষবাবু ফের: 'বাইরে থেকে পুলিশ আসতে পারে, তা বলে বাইরে থেকে ছেলে? ছিঃ! থুঃ। জনতাই আমার ক্যাডার। তাঁদের ভোটই আমার ছাপ্পা।' কোটেশনে কাগজ ছয়লাপ।

ই-টিভি দেখাবে 'অতি-সত্যজিৎ'

মানে সত্যজিৎ রায়ের সব ক'টা ছবি আর এক বার তুলে, রবিবারের টেলিফিল্ম। 'পথের পাঁচালী'র জন্য প্রথম পছন্দ ঋতুপর্ণ ঘোষ, কিন্তু তিনি তখন জুলিয়া রবার্টস-কে নিয়ে 'সাহেব-বিবি-গোলাম' তুলছেন, অতএব স্ট্রেট সঞ্জয় লীলা বনশালি। অপুর অডিশনের দিন গোটা টালিগঞ্জ জ্যাম, মেট্রোয় অসফলদের নাগাড়ে আত্মহত্যা। দুর্গার ভূমিকায় অবশ্যই সুইট-ছটফটে জুন মাল্য। ব্রেক-এ বিজ্ঞাপনেও মানিকায়ন কমপ্লিট: কিনুন অপুর প্রিয় হাওয়াই, লালমোহনের প্রিয় ভোজালি, তোপসের প্রিয় পার্সে, বাঘার প্রিয় রাজকন্যা। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চারুলতা' নিয়ে তোলপাড়। অমলের সঙ্গে মন্দা-বৌঠানের তীব্র বিছানা-সিন দেখানো হল কেন, জবাব চাই জবাব দাও। তবে বোম্‌কে দিল 'সোনার কেল্লা'। প্রোমোয় কিছুতেই মুকুলের মুখ দেখাচ্ছে না, আবছা চৌকো-চৌকো দিয়ে ঢাকা, সাড়ে ন'টায় সবাই হুমড়ি খেয়ে দ্যাখে: ইইক্‌স! এ তো ফের সেই কুশল! ক্ল্যাপ, আনন্দাশ্রু। গর্বিত যীশু দাশগুপ্ত: হঠাৎ ব্রেনওয়েভ এল, আরে, অন্য লোক খুঁজছি কেন? কুশলের মুখটা তো একজ্যাক্টলি একই আছে! শুধু বেঁটে করে দেওয়া নিয়ে কথা। সাউথ থেকে লোক আনালুম, কমল হাসান-কে 'আপ্পু-রাজা'য় বামন সাজিয়েছিল। কেল্লা ফতে।

এশিয়াডে সব মেডেল চিন-এর

একটাও ইভেন্টে না নেমেই! অলিম্পিকের তৈয়ারিতে প্রাণপণ ব্যস্ত চিন জানিয়ে দেবে, এলেবেলে খেলায় দুধভাতদের হারিয়ে হিরো সাজা বহুৎ হয়েছে, এবার তাদের সম্মুখে বিশ্বদাদা বনার লং জাম্প। নিজভূমে অলিম্পিক আর মাত্তর দু'বছর পর। সেখানে সবচেয়ে বেশি গোল্ড না পেলে তাবৎ খেলোয়াড়কে তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে কচুকাটা, পলিটব্যুরোর সার্কুলার জেরক্স-সহ পৌঁছে গেছে। তবে এট্টু তো মন খারাপ থাকেই, অ্যাদ্দিনের এশিয়াডের সুলতান। তাই খেলাশেষে জয়ী অ্যাথলিটরা পতাকা জড়িয়ে সগর্বে কেঁদেকেটে হাতের উল্টোপিঠে চক্ষু মুছে দ্যাখে কী, সব মেডেলে ইয়াব্বড় করে লেখা: 'মেড ইন চায়না'। সব পদকই চিনের!

বাগুইহাটিতে তেল পাওয়া যাবে

কী ধমাকা, ভুসভুসিয়ে খনি থেকে তেল বেরোচ্ছে আর পশ্চিমবঙ্গের ইকোনমির গ্রাফ কাগজ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এক দিন তো অসীম দাশগুপ্তের ফুটেও গেল! ভি আই পি-র ওই সাইড থেকে একধারসে ফ্ল্যাট-উচ্ছেদ। তেলের পাইপ বসবে। মধ্যবিত্তের পুনর্বাসন ক্যায়সে? 'বাবা, আমরাও কি তা হলে বস্তি?' ছেলের আকুল কুইজ। পুলিশ এসে কালার টিভি, কাচের ডাইনিং টেবিল ছুড়ে ছুড়ে ফেলছে। 'এ কী পুলিশ, আপনার বাড়িতে মা-বোন, সিডি-ডিভিডি নেই?' 'মর্ শালা।' পাছায় ক্যাঁৎ লাথি। ঝি-চাকর দাঁড়িয়ে খ্যালখ্যাল হাসছে। 'দাঁত বার করছিস কি লিন্টুর মা, পুজোয় যে জর্জেট দিলুম, অবরোধে চল্!' 'আজ থেকে 'লিন্টুর মা-ম্যাডাম' বলবে গো বউদি। আন্দোলনের আদিখ্যেতা ওব্লা কোরো, এব্লা তিনটে বাড়িতে চেনা করিয়ে দিই চলো। সাহাবাবুরা কিন্তু কামাই পছন্দ করে না।' ডামাডোলের বাজারে লিন্টুর সঙ্গে যাজ্ঞসেনী-র ঝোপের আড়ালে ঝিংকুলুলু।

আকাশে ট্রাফিক-সিগন্যাল

বাসভাড়ার চেয়ে প্লেনভাড়া কমে যাবে, প্রত্যেক কুটির-শিল্প ব্যবসায়ী একটা করে এয়ারওয়েজ খুলে ফেলবেন। 'লন্ডন যাবেন? সাড়ে চার টাকা', 'এদিকে কাকু, সত্তর টাকায় ভেনিজুয়েলা' ফড়েদের হাঁকে মুখরিত এয়ারপোর্ট। 'বিনোদিনী এয়ারলাইনস', 'মিনতি এয়ারকুইন'। পাশে বড় করে 'সেন্টু+বাবাই'। উঠলে দেখবেন সিটের বদলে সতরঞ্চি, দেওয়ালে পানের পিক ও গোল্লাপাকানো চুয়িংগাম, পাইলট তড়কা খেতে গেছে বলে ছাড়তে দেরি হচ্ছে। ততক্ষণ সত্যেন্দ্র ছাতু-র গান শুনুন। আকাশপথে যা বেধড়ক ভিড় আর র‍্যাশ ড্রাইভিং শুরু, কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে গুজুরগুজুর করে আর চলবে না। এয়ার ট্রাফিক সিগন্যাল নিয়ে যেতে হবে ওপরে। মেঘে মেঘে পুঁতে দেওয়া হবে লাল-সবুজ আলোওলা ঠ্যাং। মেঘ নিজের মনে সরে গেলে অ্যাকসিডেন্ট। অথবা প্যাসেঞ্জারের অবিরত খিটখিট, 'পোত্যেকটা প্লেন বাঁ দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে, আর এ শালা...', 'যা না, প্যারাশুটে নেমে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আয়', 'দেখছেন দেখছেন, ইচ্ছে করে মেঘটা খেল!'

পিঁপড়ে খোবলাবে রোগিণীর নাক

হইহই। সূর্যকান্তবাবু বলবেন: আশ্চর্য, 'পিঁপড়েয় রোগিণীর চোখ খাচ্ছে' এ রকম ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেদিকে আমার লক্ষ ছিল। তা চোখ তো খায়নি! আপনাদের নাক খোবলালেও আপত্তি চোখ খোবলালেও আপত্তি, তো সরকারি হাসপাতালের পিঁপড়েরা কি কিচ্ছু না-খেয়ে থাকবে? অকাট্য দরদের সামনে সবাই অধোবদন। সত্যিই, মানুষের প্রাণ পিঁপড়ের প্রাণের চেয়ে বেশি মূল্যবান—এ ধারণায় তো বিকৃত ক্ষমতাবিন্যাসের দুর্গন্ধ। সবার ওপরে মানুষ সত্য, কী ভিত্তিতে? কেন্নো কী দোষ করল? সহ-প্রাণীর মৌলিক সমানাধিকার সম্পর্কে দৃঢ় স্টান্স দেখে উচ্ছ্বসিত ডিসকভারি চ্যানেল পঃ বঃ স্বাস্থ্য দফতরকে লাখো ডলার। কুকুর বেড়াল তো ছিলই, ক্রমে সরকারি হাসপাতালে জগিং-রত খটাশ, ভাম, শুয়োর, গোসাপ। বাথরুমে কুমির। চেয়ারে ঢুলছে ভাল্লুক (বেচারার প্রায়ই জ্বর, বেডটাই প্রাপ্য)। রোগিণীর লম্বা চুলে ডোডোপাখি। রোগীর হাত আলতো চিবোচ্ছে দুষ্প্রাপ্য লেমুর। চিড়িয়াখানা দেখতে কষ্ট করে আবার আলিপুর কেন, কাছেই যখন আর জি কর, এস এস কে এম? 'অলটারনেটিভ জু' গড়ার অভিনব ধারণা ও মানুষ-অমানুষ সহাবস্থানের নয়া মডেল-প্রণয়নের জন্য তাবৎ সেমিনারে পঃ বঃ সঃ হুররে, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ঝাঁক বেঁধে ডি-লিট।

দাউদ ইব্রাহিম ধরা পড়বেন

এবং তিনি জেরায় মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে মুম্বইয়ের সমস্ত হিরো হাজতে। প্রবল আকাল রুখতে বলিউড থেকে লোক এসে হাতেপায়ে ধরে নিয়ে যাবে রজনীকান্ত্ ও প্রসেনজিৎ-কে। তিন মাস ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি, তারপর দক্ষিণী সিগারেট-জাগলারকে ছাড়িয়ে বংস্টারের বেস্পতি তুঙ্গে। রানি-র সঙ্গে তাঁর সুপারডুপারলুপার 'বঙ্গালি জোড়ি'-র কথা তো ছাড়ুন, প্রীতি জিন্‌টা অবধি বলবেন, 'গুচি-গুচি, মোস্ট কিসেব্‌ল'! পর পর সাতাশটা হিট, রামগোপালে দনাদন গুলি চালাচ্ছেন করণ জোহরে সপাসপ কেঁদে ভাসাচ্ছেন, পোস্টারে এহাতে করিনা ও-বগলে বিপ্‌স, 'আঁখো কি রেত' ছবিতে ঐশ্বর্যার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে তেরোটা চুম্পাচুম্পি: দেখে বাঙালি ইগোর মিলিত অর্গ্যাজ্‌ম! আচমকা রাতারাতি দাউদের ফাঁসি, সব্বাই বেকসুর খালাস, এবং ইয়া আল্লা কী নিমকহারামি! যে প্রযোজকরা 'প্রোসেন' বলতে পাপোশ চাটছিলেন, পাল্টি

খেয়ে ফের সেই দড়কচা মারা বচ্চন, বাঁটকুল আমির, পাকানো সলমনকে নিয়ে নেত্য। ফোন করলে নম্বর দেখে কেটে দিচ্ছে! অভিমানে ব্যাক টু টালিগঞ্জ। বাংলার রাস্তায় রাস্তায় অবরোধ। ট্রেনের লোকের নেমে পড়ে যোগদান।

মারাদোনা বিশ্বকাপে খেলবেন

রেকর্ড সময়ে যা রোগা হয়েছেন, ভি এল সি সি-ও ধাঁ। প্লাস আবার নিজের টিভি-অনুষ্ঠানে একটা নীল রুমাল পেতে তার ওপরে সাতাশ জনকে এঁকেবেঁকে নাগাড়ে আধ ঘণ্টা ডজ, লাইভ টেলিকাস্ট, টি আর পি তুঙ্গে। বোঁ করে চান্স বিশ্বকাপ দলে। খবর শুনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কী কান্না (সে-ও লাইভ)। তারপর পুরো রজার মিল্লা-র অবতার। সেকেন্ড হাফে নামবেন, ডিফেন্সচেরা পাস, গোল অন্তে কোমর বেঁকিয়ে সিগনেচার-নাচ। পেনাল্টি বক্সে ঢুকেই হুড়মুড়িয়ে পড়ে যান আর ডুকরে ওঠেন, স্টেডিয়ামও গর্জে একসা, রোজ পেনাল্টিতে গোল। ওঃবেঙ্গল বরাবরের মতো ব্রাজিলের জন্যই কলজে ফাটাবে ঠিক করেছিল, কিন্তু মিরাকল দেখে আমূল আর্জেন্তিনান্তরিত। নীল-সাদা বেঁটে সাইজ জার্সি গ্র্যান্ডের ফুটপাথে ঢেলে বিক্রি। হেনকালে সামান্য ঝামেলা: ফিফা-র ড্রাগ-টেস্টার ছোট শিশি নিয়ে নিয়মমাফিক ইয়ে সংগ্রহ করতে গেছেন, মিনমিনিয়ে পায়ে পায়ে ঘুরছেন, মারাদোনা কিছুতে দেবেন না। শেষমেশ সোনার কেল্লা-র কায়দায় ফুঁসে উঠে: 'আমার হিসি পাচ্ছে না!' কী করে বেকায়দায় গোড়ালিতে লেগে গেল কে জানে, সে দিন থেকে আর নামা নট। শুধু রিজার্ভ বেঞ্চে বসে থাকেন আর চুমু ছোড়েন। তাতে কী, কোক-এর অ্যাডে বলটা মাথায় রিসিভ করে স্টিল রেখে যখন স্ট্র টানতে টানতে বলছেন 'পিও সর উঠা কে', জিও গুরু!

শপিং মল ডিকশনারি বদলাবে

যুক্তি সরল: লাখে লাখে শপিং মল পিলপিল করবে গোটা বঙ্গ জুড়ে, মুদিখানা-সন্ধেবাজারের ভিটে-মাটি চাটি হয়ে যাবে, সব টিন-এজার বাড়ি থেকে বেরোবার সময় বলবে 'মা, মল দেখতে যাচ্ছি', স্বামী দেরি করে বাড়ি ফিরে বলবেন 'মল থেকে এলুম', গর্ব করে ফোন হবে 'আমাদের বাড়ির পাশে কত্ত বড় মল', আর 'মল' শব্দের অর্থ ডিকশনারিতে থাকবে ওই ম্যাগোম্যা সবচেয়ে ঘেন্নার জিনিস—এ তো হয় না। হিন্দি ভাষা কেমতি সোন্দর, 'মেরা

লাল দোপাট্টা মলমল কা'! তা নয়, মোবাইলে এক গাল হেসে বং-ভদ্দরলোক: 'ও, তুই এসে গেছিস, দাঁড়া দাঁড়া আমি এক্ষুনি মল-ত্যাগ করছি।' ও কী! মল-কর্তৃপক্ষ রাগত পিটিশন দেবেন সংসদ-চলন্তিকা আরও যত বাংলা অভিধানের বিরুদ্ধে। দ্যাখে কে, তড়িঘড়ি 'নয়া আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে বাঙ্গালা ভাষা সংস্কার কমিটি' গঠন (চেয়ারম্যান পবিত্র সরকার)। দু'দিনে অ্যামেন্ডমেন্ট: *মল* (মিল+→ জর্জ-অৎ(শানচ্)) = ইং. বি. অপূর্ব সুগন্ধি বিপণির মিলিত সমাহার (দ্বিগু সমাস, অ্যাই এখানে কিন্তু গু মানে গরু!) অ্যাপো-র মিলনস্থল। স্মার্টের বিচরণস্থান। ট্যাশের বারাণসী।—অন্য কোনও অর্থে উক্ত শব্দের ব্যবহার স্ট্রিক্ট নিষেধ। প্রথমে কিছু দিন ঝঞ্ঝাট: মলমূত্রাগার মানে মল-এ অবস্থিত মূত্রাগার। স্রেফ মূত্র ত্যাগ করা যাবে। কী হল, অমন মুখ করে আছেন কেন? অ, শিটাগার খুঁজছেন, তা-ই বলুন। বাংলাটা আগে ভাল করে শিখুন দাদা।

আর যা যা...

মকবুল ফিদা সানিয়া মির্জা-কে নিয়ে ফিলিম করবেন, একশো কোটি টাকার ছবি, চিত্রনাট্যের মাথামুন্ডু নেই, ঝর্নার তলায় শিফন শাড়ি পরে সানিয়া আছেন। প্রেস মিটে ঠোনা দিয়ে হুসেন: 'ও সব মাধুরীফাধুরি ছাড়ুন, এই হচ্ছে রিয়েল ইন্ডিয়ান আদুরি!' লিয়েন্ডার উইম্বলডনের সিঙ্গলস সেমিফাইনালে উঠবেন এবং স্ট্যান্ডের দিকে তাকিয়ে হেশ-কে কাঁচকলা প্রদর্শন। মাইকেল জ্যাকসন এপ্রিল ফুলের দিন একটি প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করবেন, নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কোনও বাচ্চা থাকলেই চড় মেরে বের করে দেওয়া হবে। সব সিরিয়াল উঠে গিয়ে প্রতি চ্যানেলে ভরভর্তি গেম-শো, জনপ্রিয়তম: 'কহো না কোটেশন', 'ক্যায়সে নাচুঁ ম্যায়', 'কিতনা হুয়া রকম', 'কা রে গা মা'—সব ক'টার প্রযোজক একতা কপূর। সন্দীপ রায়ের 'টিনটোরেটোর যিশু' বিশাল হিট করবে, কিন্তু ব্লক-বুকিং করা চার্চ-রা স্বল্প হতাশ। বিক্রম ঘোষ গালবাদ্য বাজিয়ে গ্র্যামি পাবেন। মুশারফ বেড়াল পুষে নাম রাখবেন 'কাশ্মীর', কিন্তু পেল্লায় রইরই ও মনমোহন সিংহ-র আধঘণ্টাব্যাপী ফোনের পর বেচারির নাম হবে তার ল্যাজের চেয়েও বড়: 'পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ভূখণ্ড, যা অক্টোবরে পুনর্বিবেচনাসাপেক্ষ'। অলরেডি প্রমাণিত, যে কোনও গানেরই শ্রেষ্ঠ সার্থকতা রিং-টোন-প্রাপ্তি। অতএব ভায়া মিডিয়া হয়ে না এসে একটি বাংলা ব্যান্ড

অ্যালবাম তৈরিই করবে স্রেফ মোবাইলের জন্য। I টিপলে প্রথম গান, ইত্যাদি। বাজার মাত করে দেবে কথা-অপারেটেড কম্পিউটার, যাকে 'ওরে ওঠ, বেলা হয়েছে' বললেই অন হয়ে যায় আর 'যাঃ, শুয়ে পড়' বললেই শাট-ডাউন। একটাই ঝামেলা, ডিক্টেশনের সময় যা শোনে তা-ই লেখে, ভুল করার পর রেগে দুশ্‌শালা বললে স্পষ্ট লিখে ফ্যালে 'দুশ্‌শালা'। আর বড়রাস্তার পাশে বাড়ি হলে কবির পাণ্ডুলিপি এ রকম: 'আজি এ প্রভাতে রবির প্যাঁপ্যাঅ্যাঁ ঢকরঢকরঢকর ঘেউঘেউ ক্যাঁ—চ কী হল দেখে চালাতে পারেন না অ মা দ্যাকো না নিয়ে নিল ম্যাওওও ক্রিংক্রিং কা কা কা কর কেমনে পশিল ধরার পর।' ডায়মন্ড হারবারের রিসর্টে খুশবু-র বিগ্রহ স্থাপন করা হবে, প্রাক-বৈবাহিক যৌনতার আগে সেখানে ভেট চড়াবেন যুবাযুবি। এলটন জন-এর বিয়ে ভাঙবে এবং 'ব্রিটেনের প্রথম সমকামী ডিভোর্স করলুম' বলে কী হেঁক্কোর! ফ্রান্সে জাতিদাঙ্গা ভয়াল আকার নেবে, প্রতিবাদে বচ্চন ফ্রেঞ্চকাট কেটে ফেলবেন। মানেকা গাঁধীর লাগাতার ক্যাম্পেনে স্পেনে বুলফাইট ব্যান। ও হ্যাঁ, অষ্টমীর দিন বৃষ্টি হবে। আর, নেতাজি এ বছরও ফিরবেন না।

১ জানুয়ারি, ২০০৬

বিগ্রহ ও বি-গ্রহ

আঁআঁআঁক্‌স! কিংবা গ্লু! কিংবা ফ্রোঁর্‌র্‌র্‌র্‌ৎ! নারায়ণ দেবনাথোচিত বিস্ময়-অব্যয়ের গোটা অভিধান ধামসেও এ অবিচারের ঠিকঠাক হাহাকার বোঝাতে পারবে না বস। প্লুটো-র হাতও নেই যে মাথার চুল ছিঁড়বে। মাথায় চুলও নেই অবশ্য। কিন্তু এ কী ধরনের ইল্লুতে কারবার! একটা নিপাট ভদ্রলোক নির্বিবাদী গ্রহ, সূর্যের চেয়ে যোজন যোজন লাজুক দূরত্বে একেবারে ঘাড় নিচু করে রুটিন-মাফিক স্পিন খেয়ে যাচ্ছে, যদ্দিন চাও হাত কচলে নখ রগড়ে মিনমিনিয়ে ঘুরঘুর করে যাবে, কেউ বলতে পারবে না ছিয়াত্তর বছরে একটি দিনও অ্যাবসেন্ট হয়েছে বা আস্তে কোমর ঘোরাচ্ছিল বা আহ্নিকের সময় বিড়ি ফোঁকে—তাকে স্রেফ কতকগুলো হুমদো লোক একটা সেমিনারের ঘরে কী সব অংবং বকে, গ্রহের আসন থেকে ঝট্‌করে নামিয়ে দিলে! 'অ্যাই ব্যাটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউ অ্যাট দ্য ব্যাক, কাল থেকে তুই বামন গ্রহ!'

তার মানে? কোনও ব্যাকিং নেই বলে কি যাচ্ছেতাই করবে? কে বামন? যখন সাধ করে চাঁদা দিয়ে সৌরমণ্ডল এঁকে বালকবৃন্দের টেক্সট-বইয়ে বিলি করেছিলে, তখন মনে ছিল না? যখন যুগ যুগ ধরে কোশ্চেন পেপারে 'হাউ মেনি প্ল্যানেটস আর দেয়ার ইন দ্য সোলার সিস্টেম' ছেপে গোঁপ পাকিয়ে গার্ড দিচ্ছিলে, তখন মনে ছিল না? প্লুটো কি তোমাদের পায়ে ধরে সাধতে গেছিল, যে বাপ আমার, আপিসটাইমে ভাত জুটছে না, আমায় একটা গ্রহের স্টেটাস দে? সে দিব্যি আপন মনে খেলছে, থাকছে, যেন বা মহাশূন্যে গড়গড়ানো আত্মভোলা মার্বেল, কালের কপোলতলে কুচো ক্যাম্বিস বল, আবহাওয়াটাও এয়ারকন্ডিশন করে রেখেছে যাতে আরামে গা জুড়িয়ে আসে, মোদ্দা কথা, 'আমি তোমার নিতম্বে লাগছি না তাই তুমিও আমার নিতম্বে লেগো না' সূচক প্রচণ্ড শিষ্ট ও শালীন ভাবধারা সমন্বিত নিশ্চিন্দিময় জীবন বিতাচ্ছে, হেনকালে তুমি হেব্বি পাওয়ারের টেলিস্কোপ-ফেলিস্কোপ দিয়ে রাতদুপুরে কী দেখলে

না-দেখলে, আচমকা নিজের ক্যালি বিকশিত করার জন্য তাকে নামধাম দিয়ে গ্রহের শিবিরে ভর্তি! যে, কী কাণ্ডই না কল্লুম, ফের একটি গ্রহ পেড়েছি।

এবার, যখন সে শিরোপাটি হজম করে মনে মনে নিজেকে এই সৌরজগতের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ভাবতে শিখে গেছে, কালের নিয়মে ঘেমো কলারটিও উঁচু হয়েছে পোয়াটাক, পাশ দিয়ে যাওয়া ইনস্যাট স্যাটাস্যাটের হাই-হ্যালোকে আড়ে চেয়েও দ্যাখে না, এবং বলতে নেই ঘুরঘুরন্তি নধর সেক্রেটারিও হয়েছে একটি, আহা, নাম তার শ্যারন—তখন, আচমকা, বিনা স্কাইল্যাবে ঘাড়ে টিন পড়ার মতন, ভারিক্কি চাড্ডি লোক খেয়ালখুশির বশে সুমহান রদ্দা মেরে তার মেডেলটি ছিঁড়ে নিলে! যাঃ, এবার চরে খা। কেন? না, আমাদিগের ভোটাভুটি হয়েছে। বাহবা রে গণতন্ত্রের মহিমে। তা হলে এবার থেকে এরকমটাই চলবে তো?

লোকজন একটা করে সেমিনার বাগাবে, আর ভাল কেটারারের দেওয়া লাঞ্চের পর হেউহেউ করে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে দুটি দুর্বোধ্য বাক্য আউড়ে যে যার রসুনগন্ধী ডান হস্ত তুলে ভোট-টোট দিয়ে সিদ্ধান্ত লিয়ে লেবে কে অদ্য হইতে বামন? এক দিনের খচাৎ সইয়ে ছাঁটাই হয়ে যাবে মেগাস্টার? এ তা হলে সাপলুডোর বাস্তব-গেম? কেউ জানে না কবে কোথায় গণতন্ত্রের সাপ ওৎ পেতে আছে, তুমি দিব্য উড়ছ, চকিতে কোঁৎ, ব্যস, সিধে নিম্নন্যাজের তলায়! য্যাখোন-ত্যাখোন ফ্লাইং চেকিং-এর ন্যায় হুট পুনর্মূল্যায়নের রিস্ক! বাপ! হঠাৎ মাইকে: স্নেহের হিজিবিজবিজ ও পাবলিকগণ, গতকাল প্রকাশু গুরুত্বপূর্ণ রুদ্ধদ্বার সভায় বিশেষজ্ঞ-দঙ্গল রঙিন টাই পরিয়া অসম্ভব ভাবগম্ভীর পরিবেশে ঠিক করিয়াছেএএন, আজ থেকে জ্যোতি বসু হয়ে গেলেন বামন-পলিটিশিয়ান! আর হ্যাঁ, সন্ধের ফিল্মাঁতেল-বৈঠকের দিকে শ্যেন-খেয়াল রাখুন, সত্যজিতের ওপর খাঁড়া ঝুলছে! নিজ আখাম্বা কীর্তিকাহিনি সিমেন্টের গাঁথনি আর যথোচিত পুটিং দিয়ে টাইট করে, তার ওপর গ্যাঁট-স্ট্যাচু হয়ে হাওয়া খাওয়ার (ও কিঞ্চিৎ কো-ল্যাটারাল বায়সবিষ্ঠা-সহনের) দিন তবে শেষ? কেউ আর নিশ্চিন্ত মনে ইতিহাসের টেক্সট বইতে ছ্যাপকা ছ্যাপকা পাসপোর্ট সাইজ ছবিটি তুলতে পারবেন নে কো!

কিন্তু দাঁড়াও দাঁড়াও, তাত্ত্বিক প্রান্তে এ পূর্বসংস্কারহীন ডাকাবুকো খোলাবাজার তো দিব্যি মোহময়ী: কেউই দলে সিওর নয়, ক্যাপ্টেনও এনি ডে বেবাক ছাঁটাই—তবে প্রশ্ন: গণতন্ত্রের এ হাল্লাপার্টি প্রকৃত প্রস্তাবে ঝাঁপাবে কি

শান্য সেফ ময়দানে? যেমন প্লুটো? বেস্পতির মতো বড় না, মঙ্গলের মতো টকটকে না, শুক্রের মতো ধ্রুব না। পেছনে সাপোর্ট নেই, ব্রিগেড ভরাতে জান কালা হয়ে যাবে, দে শালাকে নিরাপদে বামন করে! কারও কিচ্ছু এসে গেল না, এমনকী জ্যোতিষীরও না। কিন্তু কাল যদি নয়া পলিটিক্সে রগচটা খাণ্ডার শনি বামন হয়ে যায়? বা, আরও কেলেং, অতগুলো নেকলেস পরে থাকে বলে দুম করে অভিধা পেয়ে বসে 'ফিমেল-গ্রহ'? তখন তিরিক্ষি বড়ঠাকুরের মূর্তিকে শাড়িফাড়ি জড়িয়ে নজ্জানত যৌবনবতী 'শনিসোনা' মেটামরফিয়ে মোড়ে মোড়ে ফেনিবাতাসা দেওয়া হবে তো? শনির দৃষ্টি পড়েছে শুনে লোকে হাত-শরমে 'উরিয়্যা কী চাউনি রে বাঁউনি তোর' গাইবে? মোদ্দা ওয়ার্নিং: যাঁরা সত্যিকারের জায়েন্ট বলে পরিচিত, তাঁদের খ্যাতিগম্বুজ ফেমসৌধ যশোবাগিচা ক'স্কোয়ার মাইল, কোনও আন্দাজ আছে? এবং উদগ্র বডিগার্ডরাশি? ভয়াল ভক্তবিলিয়ন? রবীন্দ্রনাথকে বামন ডিক্লেয়ার করলে আধ সেকেন্ডে সেমিনার-হল পাউডার হয়ে যাবে সে খেয়াল আছে? অথবা সুচিত্রা সেনকে 'বামনি-তারকা' বললে সে বাক্য দাঁড়ি অবধি পৌঁছতে পাবে?

কিন্তু তিষ্ঠ তিষ্ঠ তিষ্ঠ—আরে, তাই তো! উল্টো দিক থেকে এই হুবহু প্রসেসটি যে ক'বছর ধরে দিব্যি চলতি! হ্যাঁ, এই জন্যই খেয়াল হয়নি গোড়ায়, এ গণতন্ত্র-স্ট্র্যাটেজি অনেক চালাক। পরিণত। উঁহু, সে কাউকে বামন বলে না। বরং করে কী, অচানক একটি করে হদ্দ বামনকে 'ওই রে, দানব!' বলে শূন্যে ছুড়ে দেয়। লোকে অমনি ছুট্টে 'ইজ ইট আ বার্ড? ইজ ইট আ প্লেন? না না, নয়া সুপারস্টার যাচ্চে রে' রবে সাষ্টাঙ্গ গড় করে। নগণ্য নাট্যকার, কদর্য কবি, অকথ্য অভিনেতা, ফেকলু ফড়ে তখন বি-গ্রেডের গ্রহ থেকে সহসা বিগ্রহ হয়ে দেদার মুচকি বিলোতে থাকে। আলো ঝলকায়, তাসাপার্টি কোমর হিলা কে নাচে, পাবলিক চরণাম্মেতো গিলবে বলে কুপন নেয়। এবং রণ-পা পরা বামনের ন্যায় এঁদের এই প্রাণপণ প্রোমোশনের ফলে, কার্যত, আসল-দানবরা বামন হয়ে পড়েন। কেউ লক্ষও করে না। ফলে ধীর ও নিশ্চিত ভাবে খুনিরা মন্ত্রী হয়, ধর্ষকরা নেতা, সিংহচর্ম-পরা গাধা এস এম এস বিজেতা। তাই, সরি চাইছি। হেঁড়ে গলা ফাটানু যা নিয়ে, তা তো অলরেডি ঐতিহ্য, ডাঁয়েবাঁয়ে। প্লুটো, তুই মর বাপ। এতটা আপ্লুটো হয়ে নিজেকেই কেমন বামনাই-গ্রস্ত মনে হচ্ছে এখন!

৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

জু

উঁহু উঁহু, করেন কী, বাঁদরকে ছোলা দেওয়া নট অ্যালাউ। শিক্ষামূলক ট্যুর। জোরে শ্বাস নিন। চার পাশে এক অদ্ভুত গহন ফরেন জগৎ, না? ওই যো, সাপ বুক ঘষটে ঘষটে পরিখা পেরোয়, গজগজিয়ে মরে, শিস্পাঞ্জি বোর হয়ে নিজ হিসি নিয়ে খ্যালে। আমরা খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে 'ওম্মা কত বড় হাঁ' বলে সটকাব না, বরং ঠায় ধ্যানে, চোখ আর চিন্তার ফোকাস বাগিয়ে জুম করে, ঢুকে যাব একেবারে ওই হাঁ-র ভিতরসড়কে। আহা, ফেন্ট হচ্ছেন কেন? আঁতেল ট্যুর, বলিনি? আবার ওদিকে ধায়! জু-গার্ডেন এসে শেষে পাখি? না। পাখি না। ওদের মধ্যে একটা ফাজ—না ফাজলামিও নয়—ফাতরামি আছে। গ্যাদাড়ে আত্মপ্রশ্রয়ে পটাস পটাস স্থান বদলায়। বসতে না বসতে ফের উড়াল। চ্যাপলিনের মতো ষোলো ফ্রেম পার সেকেন্ড, নিজ ভাবনার ঢেউগুলোর পেছন পেছন অবধি যাওয়ার মনোযোগটুকু নেই, অ্যান্টি-বোরডম প্রোজেক্টে নাম লিখিয়ে তেড়ে খলবল। নীল প্লাস্টিকের টিফিনবাক্সের গায়ে বৃষ্টি পড়ার মতো, এদের পলকা পালকে ফোঁটা ফোঁটা অনন্তের ছোঁওয়া ভগবানের ডাহা লস। না পাখি না। জন্তু। জন্তুদের এক নীরব মর্যাদা আছে। চরিত্র। সন্দীপন হলে জলহস্তী দেখে বলতেন, 'এত কুৎসিত, চোখ ফেরানো যায় না।' পাখির মতো চটকদার রং আর ফঙ্গবেনে নকশা মেরে, 'উলেবাবালে ছবই ছুন্দর ছবই হালকাফুলকা' স্লোগান চিপকে পাঠানো নয়। পাখি হচ্ছে প্রকৃতির গ্রিটিংস কার্ড। সারশূন্য, ঝলকবাজ, বোকাদের আদর্শ উপহার। চলো চলো হে মন পশুসকাশে।

জিরাফ মেট্রো রেলের দরজার মতো পা দু'খানি ক্রমাগত স্লাইড করে নীচস্থ ঘাস খাচ্ছে। লাও ঠেলা! পা ফাঁক করতে করতে ছেতরে পড়ে না যায় ব্যাটা, ব্যালে তো শেখেনি আফটার অল! গাছের খাওয়া এতটি সহজ যার, তলার

কুড়োবার বাসনা ক্যানে? জিরাফ রেগে খুন। দাঁতে ঘাস জড়িয়ে অনুচ্চ খিস্তি দেয়। যেন হদ্দ বোবা, স্রেফ গলে মে খিচখিচ বলে খাঁকর-ধ্বনি তুলল। এমনিতে প্রচার: সে ডাকে না, কথাটি কয় না। আজীবন ইশারায়, সংযমে চলছে, 'জিরাফো হে, মৌনী তাপস' টাইপ। আসলে দিব্যি ভাষা জানে। কলরবলর কিছু কম নেই গ্যারেজে। কিন্তু ডেঁটে চুপ থাকে। চালাক। দার্শনিক বলেছিলেন, বাঁদররা কথা বলতে জানে, কিন্তু বলে না, বললেই মানুষ তাদের ক্রীতদাস করে নেবে। দার্শনিক ভুল। বাঁদররা কথা বলে না, ঝাঁপিয়ে মানুষের মতন উকুন বাছে, মাথা সরিয়ে নিলে হুবহু অঙ্কমাস্টারের পটাং চড়। যুগলে ধর্মেন্দ্র-হেমামালিনী সাজে যুগ যুগ ধরে, নেকু লিপস্টিক মাখা থেকে আতুর ফুলশয্যা সকলই দেখায় বৃত্তাকারে আমোদগেঁড়ে পাবলিক দাঁড়ালে। এমনকী মানুষ-ভঙ্গি মেনে মুখের গন্ধে চুম খায়। চিলেকোঠা হতে নাগাড়ে চুরি করে আয়না, দাড়ি কামাবার নমনীয় বুরুশ। ফলে বাঁদর তো নকলিবাবু, দাস। দাসের মূল কেন্দ্র: উচ্চাভিলাষ। সে উদ্যানে বাঁদর স্বতঃই হুপহুপ। কিন্তু জিরাফ, ডিগনিটি জেনেছে সতত। কবি বিখ্যাত লাইনে ধর্মের অপোজিটে স্থান দিয়েছেন জেনেও, ঠোঁট টাইট। কক্ষনও ভাষা বলে না। ওই শালা দু'পেয়ে, ভুঁড়ি নিয়ে ভাবিত, রুমালে সিকনি মুড়ে পুনরায় পকেটে ঢুকিয়ে দেওয়া জাত যে ভয়াবহ, সে-নীতিবাক্য কবে থেকে বুঝে একেবারে সরসরিয়ে ঝাঁপ ফেলে, স্থিত। আসলে উঁচু থেকে দেখার অভ্যাস ইন-বিল্ট। শান্ত নেত্রপাতে এক ঝাঁকে সমগ্রটা, গোটা প্রেক্ষিতটা, রেটিনাগত। চকিত চমকে যাকে মেগাপ্রাপ্তি বা উইয়াম্মা উইয়াম্মা মনে হচ্ছে, তা যে সাঁঝ ফুরালেই হাঁ বড় করে অত উঁচা গর্দানটি ছেঁচে সাইজে আনতে মুহূর্তেক দেরি করবে না, অনর্গল কথা শুনলেই এফ এম-এ সেঁধিয়ে দেবে, অ্যান্টেনার মতো বেঁটে মিষ্টি শিংদুটিকে লোগো করে নেবে অনন্ত বাক্-পেঁচোমির, সে চক্কর পরিষ্কার। স্মিত বচন বলেছ না-বলেছ, মানুষ তোমার নিজস্ব সংলাপের লীলায় গাঁতিয়ে গুঁজে দেবে ওদের খেলার ঘাঁতঘোঁত। কুকুর বেচারা যেমন আজ বল ছুড়ে দিলে তিন তুড়ুকলাফে ফেরত আনে। কুকুরী বাদ দিয়ে প্রভুপত্নীর বিরহ যাপে। বাব্বা, জিরাফের বাপ-ঠাকুদ্দার প্রজ্ঞা প্রণম্য। জিরাফ তাই ভাষার সুখ স্বেচ্ছায় পরিহার করে। কিছুটা বুঝে, কিছুটা উলট-পারফরম্যান্সের দায়ে, ঘাস খেতে প্রাণান্ত হাস্যকর বনে। কমেডি তার ঢাল। আমি বাপু অযোগ্য, তাই নিও না নিও না মোরে তব ইঞ্জিনসফরে। নিজেকে রেগুলার কিছু টিটকিরি খাওয়ায় সে, চিরতার মতো। সুস্থ রয়।

জেব্রা সম্পর্কে অবশ্য চুটকি আছে, সে ঘোড়া-ই, ভুল করে বসে পড়েছিল পার্কের সদ্য-রং-করা বেঞ্চে। জেব্রাশিশু রোজ ঝগড়া করে, ও মা, চেটে উঠিয়ে দিলে আমার ঘাড়ের স্ট্রাইপ! ওরা বড় আদরে লালন করে ওই তকতকে দাগসমূহ। শান্ত ওরা, কেন গাধা নয় ঘোড়া নয় খামখা জেব্রা হতে গেল, এ নিয়ে বিস্মিতও। ঘোড়ার অবিশ্বাস্য কান্তি ক্যানভাসে বারে বারে অনূদিত, গাধার মহাদীর্ঘ যৌনাঙ্গ পাপে ঝলমল। ঈর্ষার ছিপ্‌টি জেব্রা সয়, কী করবে। দুপুরে পিঠ ঘষে পাথরে, নিষ্ঠুর জোরে। আবার সান্ত্বনা ভেবে বের করেছে, ঈশ্বরের দাঁড়িপাল্লা-থিওরি। এ মহাবিশ্বে ব্যালান্স থাকে। বিনিময়। অমন দবদবে ঘোড়ার পিঠে দাপিয়ে চড়ে নরট্রাইব, যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে ধাঁইসে বলি দেয়। কোঁকড়া কেশর আঁকড়ে ঝুপিয়ে টানে, মহিমময় পাঁজরায় গোড়ালির লাথি মারে ক্যাঁৎ, রাজকীয় পিঠডৌল জুড়ে তাদের অশিক্ষিত নিতম্ব ওঠে-পড়ে ধর্ষকের মতো। এ-ই তো ঘোড়া! সম্মান বলতে মানুষের তৈরি পুরাণ-ইতিহাসে ডবকা ল্যাবেঞ্চুস, ধনীর বেডরুমের মুর‍্যাল! ও হ্যাঁ, বীর্যবর্ধক ক্যাপসুলের প্রচ্ছদচিহ্ন! আর গাধা? হাসি লুকনো যায়? অমন গাঢ় দাম্পত্যদাপট অন্যত্র অ্যায়সা মিয়োনো চক্ষু বিয়োবে কে জানত! ধোপা তার পিঠে পুঁটুলির পর আরও পুঁটুলি ডাঁই করে, ফের আরও, আবার ক'পিস। সে কী হদ্দ ভীরু, হারার আগে হেরে বসে যাওয়া, নিজেকে জনম-দুখী ঠাউরে নেওয়া, মর্ষকামী গবেট! যেন সত্যিই, তার মাছি-তাড়ানো তিরতির-কাঁপা চামড়া অহেতুক প্রহার চায়, লাথি না খেলেই সে আকুল কৃতজ্ঞ, সকল শিরদাঁড়া নুয়ে আছে শুধু ক'মুহূর্ত অত্যাচার না পাওয়ার বিস্ময়ে আশীর্বাদে। আর পিশাচ-থাবড়া শুরু হলেই জাস্ট গুনে চলে প্রহর, ঘা, এ তো হবেই, এ তো কথাই ছিল, আয়ত ও নির্বিরোধ চেয়ে থাকা, অবান্তর ঘুলঘুলির দিকে, ক্ষান্তির দিকে। একবার হলদে দাঁত বের করে ঘ্যাঁ করা অবধি না। অন্তত ধুতিটুকু ছিঁড়ে নে। নিংড়ে সঙ্গম করিস, সে দৃপ্তি ক্রোধের মাস্‌লে আন। ছ্যাঃ। না, জেব্রা ভাল আছে। কালোয় দাগিয়ে তাকে স্বতন্ত্র লেবেল তো সাধে দেওয়া হয়নি? সে এসব থেকে দূরে বাবা। স্বস্তির বিকল্প নেই। চাই না জ্যোতি, রতি। আবহমান বিরতি, ভাল। বাঃ।

সিংহের ক্লান্ত লাগে। ঘাড়ে ব্যথা ধরে এই তাগড়া কেশরের ঝাড় বইতে। দিনভর গা-ময় ঝরছে অয়েলপেন্টিং-এর গুঁড়ো। কী মরতে যে সকলে তাকে আসতে-যেতে কুর্নিশ মারে! আরে ভাই, ঘুম পায় তার। বিচ্ছিরি অন্ত্যমিল

দেওয়া রাশি রাশি তুলোট কাব্য তার কীর্তি জপে হাল্লাক, হলদে হয়ে যাওয়া পয়ার কোন থাবা-চাটা স্তাবক যে ডেলি রেখে যায়! শিরশিরিয়ে ওঠে সরু কোমরের বেড়। যদি সত্যি কখনও অভিযানে যায়, তবে তো থিকথিক ভিড়। সবাই সবাইকে ফিসফিসিয়ে বলবে, এইবার বিস্ফোরণ। নিশ্চিত। দেখে শেখো, কাকে বলে পরাক্রম, তাকত। তখন সে থরথরিয়ে থেবড়ে বসে পড়ে যদি! নিট ধ্যাড়ায়! বহু বার ঢুলতে ঢুলতে শেল খেয়েছে সে, ভয়স্বপ্ন: মাইল মাইল সঞ্চরমান চিত্রল মৃগ, আর সে অবিমিশ্র ফেকলু। জেগে উঠেই অন্য জানোয়ারের ঝাঁপ খাওয়া দেখে তক্ষুনি বলে দেয় কোন মুভে ভুল, কোন ক্যানাইন আগে বসালে সে নিখুঁত মট্ গুঁড়োতে পারত টুঁটি। সিংহ আড়ালে রিহার্সালে বোঝে, তার পেশিতে অবিশ্বাস্য বজ্র, তার তন্তু বেহালার টানের ন্যায় এই জমজমে তো ওই দীঘল। সে ভগবান। কিন্তু যদি রক্তের ময়দানে ফট করে কিছু ভুল হয়ে যায়? না, গদমা ত্রুটির কথা নয়, একটা খুচ ছন্দপতনও তো সে অ্যাফোর্ড করতে পারে না। চুকলিখোর ভাম ঘোঁত করে নাকের মধ্যে এক রকম হাসল কি না, সে আলাদা, নিজের ক্লাসে হাত তুলে কী বলবে সে? নিজেকে কান ধরে কতক্ষণ দাঁড় করাবে কঙ্কালটিপির পাশটায়? তার চেয়ে এই যে সবাই ঘিরে আন্তরিক চকচক চোখে নিয়ে বলে, 'আপনি স্যর গা ছেড়ে বসে আছেন! একটি বার আড়মোড়া ভাঙলেই তো...', বেশ লাগে। নাক শুঁকশুঁক করে সে সিংহীকে বলে, যাঃ, যেমন বলেছি টো-টো ফলো করে জলদি চাড্ডি ধরে নিয়ে আয়। পরশুর মতো প্যাঁচে ভুল করলে, এক থাবড়া।

শিয়াল তিন প্রকার। খ্যাঁক, পাতি ও সুপার-ফি। যে কোনও আলটপকা টপিক লুফে ক্লাস ফাইভের ভাবসম্প্রসারণে সটসট নামিয়ে নেয় বলে তার ধূর্ত নাম রটেছে। চোয়ালের ছুঁচলো হাড়-বিন্যাসও অবশ্য এ ইমেজে লাই দেয়। শেয়াল বিষণ্ণ। কারণ যে কোনও শেয়ালীই তার নিবেদনকে প্রথমে ফচকেমি, দ্বিতীয়ে চতুরালি, ও শেষ পর্যন্ত অপমান হিসেবে নেয়। ফলে ওভারসাইজ পূর্ণিমাগোল্লার পটে তার আর্তনাদী সিল্যুয়েট মোক্ষম খচিত। সে চায় এক অনায়াস লংলাফে আস্তরণবাদ পেরিয়ে যেতে, কিন্তু দু'লাইন পড়তে না পড়তে খ্যাঁক করে হেসে ফেলা তার মজ্জায়, কারণ লাইনের ফাঁকে যে ভাবনাগুলো জেলিফিশের মতো স্প্রিংলাফে উড়ছে, তাদের অভ্যন্তরে কুসুম-কুসুম বলগুলি সে নিখুঁত দেখতে পায় ও কথা-জাগ্‌ল করার পাতি ম্যাজিক কিছুতে এড়াতে পারে না। ফলে সারা দুপুর সে বারে বারে বাথরুম যায় ও ফিরে এসে একটি

করে রঙিন জেল্লা বমি করে, সক্কলে ঠোঁট ব্যেপে মুগ্ধ হয়, শেয়াল নিজের এই অল্প চটক ও পোয়াটাক ফিলসফি চটকে গোল্লা পাকানোকে মাঝে মাঝে 'ছিঃ, চিপ হয়ে যাচ্ছিস' বলে গুদোমে নির্বাসন দিয়ে দেখেছে, নাঃ, জলে নিজের ছায়া পছন্দ হয় না কিছুতে। দু'পয়সার সিদ্ধাইয়ের লোভ কিছুতে এড়াতে পারবে না জেনে এবং বাঘও দূর থেকে 'বাব্বা, ডেঞ্জারাস বুদ্ধি' বলে কুর্নিশ করেছে শুনে সে অতএব গর্বের হাসি মুখে টাঙায়। লোকে বলে, ধূর্ত কথা ভাঁজছে।

ভাল্লুক অবশ্য বোঝেই না, কখন সে জ্বরের ঘোরে আছে, আর কখন নেই। সর্বক্ষণই গায়ে ঝিমঝিম ঝরে, ফুরফুর লাগে। যাকে যা খুশি বলে দেয় সে, ধুস। অপ্রিয় কথা হলে, লোকে ধরে নেয় প্রলাপ, প্রিয় হলে, টনটনে জ্ঞান। ফলে নিজের কথার পেছনে দাঁড়াবার দায় থেকে মুক্তি হয়েছে তার। এঁটুলির মতো নাছোড় রোগ যে এমন কোলে-ঝোল লাইসেন্স দেবে কে জানত। খাটনি নেই, দরাজ লোম, হাঁউমাউ করে গিয়ে পড়ো, সবাই জানে সদাশয় গপ্পে, মাথার ইস্ক্রুপ স্বল্প ঢিলে থাকলে লোকে যা ভালবাসে, আর কিছুতে না। নাকে দড়ি নিয়ে গলি-গলতায় কাঁকাল দুলিয়ে নেচেছে বটে, কিন্তু সে তো বিকার। যথাযথ বুট লেলিয়ে চেটেছে। বিকার। ওদিকে গ্লোরিওলা অতীত। দুর্ধর্ষ শিকার-কাহিনিও ছেড়েছে ইতিউতি। তবে? বিরাট বপু, জোরে হাঁক, ডাক কিছু বেশি, কারও ওপর খার থাকলে জ্বরের ভান করে গায়ে পড়ে যা ইচ্ছে খিস্তি ঝাড়ে ভাল্লুক। পরে 'মাইরি! বলেছি? এই শালা জ্বর আমায় খাবে। যাগ্গে, মহুয়ার পয়সা ছাড়' বলে বিনয়ের হাসিগাছটি ঠেসে দাঁড়াতে পিছপা নয়। জীবন একটা ক্যাজুয়াল ট্রিপ বই কী? অ্যাঁ? আরে ছোড়ো মুঝে, রোগী-মানুষ ইয়ার।

চিতা বাইরে থেকে যতই লীলায়িত ও নিশ্চিত পুংবাচক শট দিক, কাছে গেলে বোঝা যাবে, উঁহু, বালক-ভাব যায়নি। সে পুরুষ ঠিক নয়, শিশু। বা কিশোর। কোথায় অলস বধূদের গোলাপি হাই তোলা দেখে মুগ্ধ হবে ও ঝোপের নীচে তাদের ঠেলে উপুড় করবে সদ্যখরখর নখের দাপটে, না ব্যাটা নিজ শরীরের ফুটকিগুলোর আজব শেপ দেখে 'আরিঃ' বলে বিস্ময়ে দুপুর পোয়ায়। সে গাছ থেকে গাছে বিদ্যুতের মতো একটি রেখা হয়ে বাঁচতে চায়, থিরথির আলটাকরায় স্রেফ স্পিডের ঝাঁঝ। খুদে সাইজের এই প্রাণী চট করে পা-ফা তুলে নিজের নরম পেট চাটাপুটা করেই ফের দৌড়। পাগলা, নেশাড়ু

সে, আলোর ভল্ল পৌঁছবার আগে পুবদিকের নিশানায় ফার্স্ট যাবে। সামনের পা পিছনের পা ক্রিসক্রস ভঙ্গিতে তড়িৎ-স্প্রিন্ট টানা যেতে পারে, এই আবিষ্কার তাকে এমন ফুর্তি দিয়েছে, মোটামুটি হরিণকে ডজ দেওয়ার নয়া কায়দা ভেবেই মাঝস্বপ্নে বিড়বিড় বেড়ে ওঠে। গতি তাকে সর্বস্ব দিয়েছে, শুধু জীবন কখন স্লিপ করে যাচ্ছে, তার পোঁ-দৌড়ের এক্কেবারে সমান বেগে পেছন দিকে সাঁকসাঁক ছুটে হারিয়ে যাচ্ছে সিনারি—তার একাগ্র ও ধাঁইপেয়ে ব্রেন খেয়াল করে না। মুখে রক্ত লেগে আছে বললেই 'তাই না কি? এ মা!' বলে মুছে নেয়। তারপরেই 'আসছি কাকিমা, প্র্যাকটিস আছে।' গবা একটা।

উট সোনার কেল্লা খ্যাত। দেখে মনে হবে, মুখটি তুলে ঠিকঠাক, কিন্তু আসলে সে নিজ ঠোঁট চিবায়, কোঁৎ করে অনিবার বিরক্তি গেলে। নিজেকে কুৎসিত লেগেছে তার। অসহ্য। বহু বার পইপই ভেবেছে, বহিরঙ্গ বিসদৃশ তো কী! অন্তর তো আলাদা কম্পার্টমেন্ট, ছাপ লিক করছে কেন? কিচকিচে বালির ঝড় সে নিয়ত ঝেলতে পারল, এটুকু বুঝছে না, নিজ রূপে নিজেকে ভোলানো ক্লাউনিং? তবু অলস জীবন-দেউলিয়ার মতো নিষ্প্রভ বেঢপ চোখ, লম্পটের মতো ওল্টানো ঝোলা উগরে আসা ঠোঁট, ছিঁচকে ভোগের মতো হাসি, নিকোটিনের গা-গুলনো গন্ধের মতো সারা গায়ে বেমানান ছোপ, সিমেট্রিহীনতা—তাকে তিতকুটে রেখেছে। পেছনে লাগাতার কৃমির মতো তাকে জ্বালিয়ে খায়, ঘিনিয়ে তোলে রোদ্দুরের কুচি। এবং ব্যবহৃত ঝালরের মতো, নিজের লম্বিত আইল্যাশের মতো, তাকে ঘিরে রাখে চিটচিটে আত্মসন্দেহ। দশ হাজার ঘাস পেলেই সে ভাবে, কেন বারো হাজার চাইলাম না, আমার ধক নেই। বারো পেলে ভাবে, ছিঃ, এত লোভ কেন, দশেই তো তুষ্ট থাকা যেত। নিজেকে জল না খাইয়ে শাস্তি দেয় সে। নিজেকে লাথি দেওয়ার পাপ তার গা ফুঁড়ে বিকট কুঁজের মতো উঠে থাকে। তার সামনের দাঁত দুটি বিচ্ছিরি, বড়। তাদের ফাঁকে শিরশির করে আটকে থাকে স্বপ্রেমের কুচি। সারাদিন জিভের ডগা ধাক্কিয়ে সে না পারে নরমাতে, না পারে চাখতে। মুখ পেঁচিয়ে এক ধরনের হাসে, ঝাল ঝাল থুতু গেলে। চোয়ালে তার অনেক ঝঞ্ঝাট জমে থাকে ও সপাটে ব্যথা মারে।

সজারু কিন্তু খুশি। 'চললে ঝুমঝুম শব্দ হচ্ছে দেখেছ? তা হলে কাঁটা শুধু কাঁটা নয়, তরঙ্গ নিশ্চয়', সে জানায়। 'অন্যরা তো ভয়ে আকুল, অ্যাঁ, বাঘেও নাকি খায় না?' আমি বলি। সজারু স্মার্ট ও ছোট্ট, তড়বড়িয়ে পুলকিত। 'আরে

ভাই, কাঁটা কি বেছে খাবে? হ্যাহ্যাহ্যা।' সজারু আসলে ছোট্ট শশক বই কিচ্ছু না। নরম একটা মাটিশোঁকা মাস্তসোনা। কাঁটাজাঙাল তার মূল পরিচয় নয়। না। কাঁটা তো বাটা মাছেও থাকে। কিন্তু ওর ডিজাইনটা লক্ষ করলে দেখা যাবে, সমস্ত কাঁটার শার্প দিকটা বাইরে, ওর গায়েও একই সেম শরগুচ্ছ প্রোথিত, কিন্তু সস্নেহ কোমলতায়, নিরাপদ দিকটা। মানে কী হল? অন্যরা যখন বিঁধুনি খাচ্ছে, ও কিন্তু খোঁচার মুখ সচেতনে ঘুরিয়ে দিয়েছে, তিরচিহ্ন উল্টো দিকে, নিজে আছে পরম ঘেরাটোপে। অর্থাৎ 'টেনশন লেনে কা নেহি, দেনে কা হ্যায়'? না, উল্টো। নিজের ভিতর থেকে এমনই ধারাবাহিক ভাবে সে বের করে দিয়েছে গরল, সব আঘাতকে ছরছরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে বডি-বাহিরে, পেচ্ছাপের মতো, ধুলো ঝাড়ার মতো অপমান হোঃ থুঃ করে নিক্ষেপ করেছে পাশের নর্দমায়, এই চুপচুপ আভিজাত্য কখন সলিড বর্ম দিয়েছে চার পাশে। তাকে ছুড়ে মারা ও গদ করে বসে যাওয়া আপেল সে বহন করেছে ত্বকে, তা পচেছে, গন্ধ ছেড়েছে, পুঁজের মতো তরল নেমেছে অশুচিস্নানের ন্যায়, সে কিন্তু দিব্যি চলেছে ঝমরঝমর, ঘুমিয়েছে ঘুমঘুম। না না, নির্বিকার নয়, একদম নয়, সে এগুলির বীজ শুঁকে দেখেছে, খতিয়ে নেড়েছে, নিজেকে শিখিয়েছে সার, এবং ঠোঁটে ঠোঁট চেপে পিছলে দিতে পেরেছে কটু-রস। ঘুম থেকে উঠে দেখেছে, শলাকাগুলো ফুঁড়ে গেছে, কিন্তু হৃদি রয়েছে দিব্যি করতলের মতো আদরচেম্বারে। শেষপাত অবধি বাঁচিয়ে রাখা ডিমের বড়ার মতো, সজারু মন দিয়ে যত্ন করেছে নিজেকে। তার 'হুররে' বিন্দাসতা তাই গামবাটপনার সুদূর পারে। হায়নার ফ্যাকফ্যাক কষ বেয়ে পিক গড়ানো অশ্লীল আহ্লাদের সঙ্গে তার তুলনা ভুল। সজারু নিচুপানে আলাপী থাকে, এটা জেনেই, ওকে পাপোশ করলে তোমারই ছড়ে যাবে, তার কিচ্ছুটি না।

গন্ডার শুনেছে, সালভাদোর দালি বলেছিলেন, গন্ডারের পশ্চাদ্দেশ আর কিছুই না, দু'বার ভাঁজ করা সূর্যমুখী ফুল। সে মোটামুটি দু'তিন পা যায়, থমকে ভাবে, খত্তো ফের শান লাগাবে পরশু? একই পথে ফেরে। শিথিল বর্ম ঝুলে আসছে, শ্বাস গোপন করে ভাবে, কৌমার্যের প্রতিজ্ঞায় কী ঘন্টা লাভ হল? তার সমগ্র ইস্পাত জুড়ে শুধু আত্মরোধ, বল্টুতে লেখা বহুৎ ধ্রুপদী হেডলাইন, নাটে মটমট করছে ত্যাগের অহংকারের জং। সে যাদের আইকন, তারা মরেহেজে গেছে ভাবতে ভাবতে, স্ট্যাচুর মতো শোয়াবসা ভুল হল বোধহয়। গন্ডার কখনও-সখনও নিশ্চিত হয়, সূর্যমুখীর পোস্টার পিছনে না ফেলে

সামনে সাঁটলে মন্দ হত না। তার খঙ্গটি ধ্বজার মতো আঁট হয়ে গ্যাঁট বসে থাকে, কম্পাসের কাঁটার মতো অব্যর্থ একটিই দিকে ধায়। কে জানে এই নিখুঁত প্যারাবোলা তাকে ঝুলিয়ে দিল কি না। শেষ অঙ্কে দেবতার অভিশাপ কুড়োবে বুঝে সে ধীরে ঘাস ছেঁড়ে। অনেক স্বর্গব্যাপী ডুয়েল লড়েছে, নিশানকে স্যালুট দিতে সর্বাগ্রে উঠেছে তার তুমুল দাপ, বিউগিলবাচক উঁচু মুন্ডু নিয়ে ভিকট্রি স্ট্যান্ড থেকে নামতে নামতেই গন্ডা গন্ডা সস্তা বিলাস তাকে ডাক দিয়েছে, চেখেও দেখেনি। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জিতে কিন্তু প্রাইজ না-নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার উদাস হাঁটুনি তার সিগনেচার। কী সোল্লাস ভক্তির কোরাস আসত তখন পিছে পিছে! এখন মনে হয়, যে ঊর্ধ্বরেতা গাধারা হিস্টিরিয়া গড়ে তার মহিমা বাড়াল, তারা প্রকৃত পারভার্ট। সে নিজে তো বটেই। মেডেলের আয়নায় তার মুখ কেমন বেঁকে লম্বাটে হয়ে যায়। প্যারডি। লোহার ডাঁটিগুলো লগলগ করে আলতো হয়ে এল বুঝি। চামড়ার অনেক ভেতরটায় একটা উসখুস বুঝে খোবরানো গাছে পশ্চাদ্দেশ ঘষে সে। ছেঁড় শালা, পাপড়ির দল।

কেমন লাগল, সফর? অচিন অঞ্চল দেখে আমরা হেভি বিস্ময়-সফল, না? আরে ভাই, পশুপরিচিতি কি কম ডিপ? এখন চলুন সব নতমুখে ফিরি। ওরা ঝিমোবে। বিচ্ছিরি ঝুপসি ঘোলাটে সন্ধে নামছে পশুঘরে। ড্যাবা চোখের ওপর পিচুটির মতো। এবার মশার পিনপিনে ঝাঁক ঘিরে নেবে ধীরে। তিরিক্ষি বদমেজাজে, না-বোঝা মনখারাপে ওরা চেঁচাবে মাঝেসাঝে। টানা পিচপথ থেকে শোনা যায়। আমাদের অবিশ্যি বহু দূরে চিমসে হলদে আলোর বাড়ি। **ভাল।**

২৮ জানুয়ারি, ২০০৭

মায়ার পিদ্দিম

ও দিদি, আপনি কী করে পারেন গো! আপনি তো ভগবান! কেউ যখন বাঙালি জাতকে নিয়ে ভারী আফশোস করতে থাকে, আমি হাঁ করে চেয়ে থাকি! আরে, আমরা যে বাঙালি হয়ে লীলা মজুমদার পড়তে পাচ্ছি রে! এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর কী? আপনার ভাষায় না জন্মালে কী হত, ভাবতেও বুক হিম। একলা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আপনার লেখা মনে করে মুচকি মুচকি হাসছি না, সে আবার কীর'ম বাঁচা? জঙ্গলের মধ্যে সার্কাস শুরু হতেই সোনা টিয়া যেমন খোঁচা দিয়ে 'দ্যাখ, মাকু, দ্যাখ, মগডাল থেকে উল্টো হয়ে ঝুলছে কেমন দ্যাখ রে!' চেঁচিয়ে উঠেছিল, আমারও তেমনি গোল্লা চোখ আর ইয়াব্বড় হাঁ আর অ্যাত্তখানি রোদ্দুরের মতো আনন্দ নিয়ে রোজ আপনার রঙিন কার্নিভাল দেখে উথলে উঠতে ইচ্ছে। আচ্ছা, এই যে গোটা লেখায় এমন আশ্চর্য খুশি, একেবারে আলোয় আলোয় চুবে আছে সব, এ পেতে কী করতে হয়? আমরা তো সারাক্ষণ খিঁচিয়ে আছি। জিভেও আদ্ধেক সময় তেতো তেতো টের পাই। তখন একছুট্টে আপনার কাছে। একটা যা খুশি টেনে নিয়ে বসে পড়লেই হল। বাপ রে বাপ, কী ভাগ্যে বাঙালি হলুম বলো দিকি!

মালগাড়ি চেন ঝুলিয়ে টংলিং টংলিং করে যায় কে জানত? আমরা তো ভাবতাম ঘটাংঘং। কিন্তু আপনি যেই লিখলেন টংলিং টংলিং টংলিং, শুনেই মনে হল দূউরে একটা ঘণ্টা বাজতে বাজতে হারিয়ে যাচ্ছে, ছোটবেলার জন্য সব মনকেমন ওই আওয়াজটায় ধরা। আর কালোমাস্টার যখন সেই জানলার তলায় বিদায় নিতে এল? কী গলাব্যথা! 'এখন কালকের দিনটা ভালোয় ভালোয় কাটলে বাঁচা যায়। তাপ্পর একেবারে কপ্পুর হয়ে যাব, এ এলাকায় কেউ আমার টিকিটি দেখতে পাবে না—ও কী কত্তা, তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে নাকি?' কী অলৌকিক কিপটে আপনি, দিদি! মাত্তর এক-দু'টো কথায় গোটা বুক টনটন-টা আঁকশি দিয়ে টেনে এনে, দিব্যি পরের প্যারায় চলে যান!

মাঝের লাইনগুলো নিজের মনে মনে কত বানিয়ে নিতে হয়! খুব ভেবে ঠিক করেছেন, না? একটা আঁচড় কেটেই, ব্যস, লুকিয়ে যাব। এতটুকু এক্সট্রা কুচি পড়ে নেই, চাট্টি-পাঁচটি আখরে চোদ্দোপনেরোটা সমুদ্দুর!

আর কী ঝলসানো, ইয়ে, স্মার্টনেস বললে তো সবাই কেন কে জানে রাগ করবে, কিন্তু গল্পগুলো কীর'ম ঝপাং করে শুরু, তারপর নুড়ির ওপর ছটফটে ঝরনার মতো তিরতির করে ছুট, সটাসট বাঁক, আকাশের বল্লমগুলো ধরে হিরের কুচিতে চুরচুর করে লোফালুফি, আর ফুলের বোঁটা থেকে মধুফোঁটা চুষে নেওয়ার মতো, সুৎ করে শেষ। সব ডায়লগ আলাদা, চলন আলাদা, ঠাসা, চোস্ত, আর রাশি রাশি আনন্দে ভর্তি। পৃথিবীতে কে-ই বা আছেন, যিনি 'ধাই মা বলত, বিস্টির জলের ফোঁটা যেমন করে পুকুরের জলের সঙ্গে টুপ করে মিশে যায়, মরে গেলে মানুষের আত্মা ওইরকম করে ভগবানের সঙ্গে মিশে যায়' এই অপূর্ব টুলটুলে কথাটা লিখেই, তক্ষুনি একজনকে দিয়ে বলাতে পারেন, 'কী যে বলো, সক্কলের আত্মা একসঙ্গে কখনো মিশতে পারে? ও বাড়ির দুষ্টু জগার সঙ্গে ভগবান কখনো মিশতে পারেন? আমরাই মিশি না; ঝোপের আড়ালে বিড়ি খায়, এমনি দুষ্টু ছেলে!'

না না দিদি, কোটেশন দিয়ে বাড়াচ্ছি না। আরে আপনার আশ্চর্য হিরে-জহরত টিপি করে তুলে দিতে গেলে তো গোটা রচনাবলিটাই ছেপে দিতে হয়। কিন্তু হাত যে কী অসম্ভব সুলসুলোচ্ছে! এট্টু খেলি না, দিদি, র‍্যান্ডম বুক-ক্রিকেটের মতো এ-বই সে-বই থেকে, আর অমনি ট্যাম কুড় কুড় ট্যাম কুড় কুড় ভ্যাঁপোর ভোঁপোর ভোঁ—'এর মধ্যে কত কি যে সব ঘটে গেল যদি জানতে, তোমার গায়ের লোম ভাই খাড়া হয়ে গেঞ্জিটা উঁচু হয়ে যেত', আর সেই মাদুলিটা, যেটা একচল্লিশ বছর এক মাস দাদামশাইয়ের হাতে বাঁধা ছিল? 'গায়ে লেগে শেষটা এমন হয়েছিল যে মাঝে মাঝে নাকি মাদুলিটার উপরও চুলকাত!' কিংবা রেগে টং! 'সমরেশবাবুর ঝোলা গোঁফের ধারগুলো মুখের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। সেগুলো বের করে না ফেলেই গুম হয়ে বসে থাকলেন। গিলে ফেললেই তো হয়ে গেল।'

এখন আপনার কাছে শিখেটিখে আমার এমন হয়েছে, ব্যাটারির বাক্সের ওপর বসে ছোট্ট ছেলে চুল কাটছে আর অঝোরে কাঁদছে দেখে, ওর চোখের জলে চিপকে থাকা চুলগুলোর সুড়সুড় যেন পষ্ট টের পাই। হ্যাঁ গো। নিজের ছোটবেলা ভুলে যাওয়া মস্ত পাপ, না দিদি? আমি তো আদ্ধেক ভুলে মেরেছি, আর ভাবছি বহুদ্দিন খুলে রাখা হোমিওপ্যাথিক শিশির মতো, গন্ধটন্ধ সব উবে গেছে দ্যাখগে, হঠাৎ আপনার ছোটবেলাটা ছুঁইয়ে এমন সাংঘাতিক শিরশিরিয়ে

দিলেন, দিব্যি চোখটোখ বুজলে আর একটু নিশ্বাস বন্ধ করে চেষ্টা করলেই, হ্যাঁ, অশোকগড়ের ঘিঞ্জি গলি, খালিপায়ের নীচে কিরকিরে ধুলো, আর লোডশেডিঙে খেলা সেরে বাড়ি ফিরছি, অঙ্ক হোমটাস্ক ভেবে বুক দুরদুর করছে আর মশার ধূপ থেকে মন খারাপের ঝাঁজ উঠছে। একটু পরে মোমবাতির কাছে ঝুপসো পোকা আসবে। এই থানে ডুবডাব দিলে বড়বেলার সুবিধে খুব। এই ঠোকরকামড়ের দিনকালে রাতভর যে অপমান-টপমানে গা ঝমঝম করে, কান গরম হয়, সকালে উঠে সে সব ভেবে ফ্যাকফ্যাক করে হাসি পায়। সব আপনার ট্রেনিং।

প্রাণায়াম-টানায়াম কিচ্ছু না, কেউ যদি শুধু সিঁড়ির তলায় যে ইন্দ্রজাল কমিক্সগুলো লুকিয়ে রেখেছিল, আর আশ্চর্য বুটি বুটি ছিপি, আর মেজোমামাদের ক্যারম ক্লাবের একটা আস্ত এক্সট্রা রেড—সেগুলো দিনে দশবার ছুট্টে কোলে নেওয়ার আঁকুপাকু আনন্দটা সামান্যও চাখে, আর সেই ভামের মতন হুলোটা, ভারী কালো টেলিফোনের মতো ডাকত, সে-দিন শুধু পাঁচিল দিয়ে আসছিল কিচ্ছু করেওনি, তবু ওপরের জেঠু আধলা ছুড়ে তার কানের পাশটা থেঁতলে ফাটিয়ে দিল—এর বুক-মোচড়ানটা অ্যাত্তটুকুনও ছোঁয়, ব্যস, তার প্রোমোশন আটকে কোনও ব্যাটাচ্ছেলে নখ বসাতে পারবে না।

মুশকিল, আমরা তো সেধে হোয়াক করে উগরে দিয়েছি সেই লাল-নীল ঘুঁটি, কানের ঢাকনি চেপ্পে না-শুনতে শিখেছি টেবিলের ভেতর টেবিলভূতের কিটকিট, চোখে জলটল ঝাপটিয়ে ঘষটে দিয়েছি পোলট্রির জানলায় হাম্বুড়ো দেখা। দিদি, আপনি ধাঁ করে কোত্থেকে পেলেন আমার সেই না-লেখা ডাইরি? এমন টায়ে-টায়ে ফেরত দিলেন কী করে? আপনি লেখেন শিলং পাহাড়ের কথা, যেখানে গাছের গায়ে দাড়ি ঝুলছে, আমি বেঁচেছি ট্রাকের ধুলো ওড়া ডানলপ ব্রিজে, কিন্তু কী আঁতিপাঁতি চেনেন আমার এক আঙুলে স্কেল-ব্যালান্স করা দুপুর, ঠাম্মার সঙ্গে কেউ কথা বলে না ভেবে বার বার গলার কাছটায় কী একটা গিলে নেওয়ার রাত্তির, ওরে কেউ আমার কাছে এপ্রিল ফুল হবে না গোটা দিনটায়: সেই হাঁকপাঁক! আপনি আমার সেই আমিটাকে একেবারে টোবলা মাথা থেকে লাল পায়ের তলা অবধি চেনেন দিদি, কিন্তু আমি চিনি না। ফোটোয় দেখি, হাবলা মতো, কাজল ধেবড়ে কাঁদছে, কিন্তু আমি আর ওই বাচ্চাটা টোটাল অন্য লোক। এদের আবার করে মিলিয়ে দিতে পারে না কেউ। শুধু একজন ছাড়া।

প্রিয় ম্যাজিকদিদি, কী করে ছোটবেলার অঙ্কখাতার পেছনের

হিজিবিজিগুলো এই থ্যাবড়া আঙুলে ধরব বলুন? পাঁউরুটি যে শুধু কতকগুলো ফুটো দিয়ে তৈরি, স্রেফ ময়দা দিয়ে কয়েকটা ফুটো একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছে, এ কথা আপনি মনে করিয়ে দিতেই, 'ওঃহো, দেখেছ?' অথচ এক কালে খেতে বসে ডেলি বুঝতাম। বাপ-মা কী বুদ্ধু হলে ফুচকাআলুকাবলি ছেড়ে অখাদ্য পাঁউরুটি-দুধ ব্রেকফাস্ট দেয়, অ্যাঁ? তবে আপনার পাঠশালে ফের নিজেকে শিখছি, বেড়ে প্রোগ্রেস হচ্ছে। বাচ্চা দেখলেই আঁতকে উঠে চোখ গোল গোল করে বলি 'ও কী হে, তোমার ঠোঁটের ওপর গোঁপ গজিয়েছে দেখছি!' আর তারা পড়িমরি খচমচ করে আয়নার কাছে চলে যায়।

আচ্ছা, ঝগড়ুর সঙ্গে রুমু-বোগির অত জাপটেলেপটে থাকা, সারা দিন ওর কাছ থেকে গল্প শোনা, বাড়ির লোক পছন্দ করে না, না লীলাদি? ঝগড়ুর বউ একবার বলল না, 'তোমরা যাও, তোমাদের দিদিমা রাগ করবে। চাকর-বাকরদের সঙ্গে বেশি মেশা ভালো নয়।' কিন্তু ওদের মনটা তো তপতপ করছে। 'ঝগড়ু বোধহয় খুব বুড়ো, কানের কাছের চুলগুলো সব শাদা হয়ে গেছে, হাতের অনেকগুলো নখ ভাঙা, শিরাগুলো উঁচু-উঁচু হয়ে রয়েছে। রুমু একটা আঙুল দিয়ে ঝগড়ুর শিরায় হাত বুলিয়ে দিল।' এই যে একটা আঙুল দিয়ে শিরায় আদর করে দেওয়া না, এর মধ্যে যে কী একটা গলা ব্যথা করা অসম্ভব ওম রয়েছে! দিদি, কী করে একদম একসঙ্গে একটা কান্নার বীজ আর একটা কান্নাকে পেরিয়ে যাওয়ার বীজ ঝপাঝপ পুঁতে দেন গো? আপনার লেখায় কী কষ্ট, বাপ রে! চোখ ডবডব করে, তখন গলা খাঁকারি দিয়ে, রোদ পড়ে আসছে দেখে আলোটা জ্বালিয়ে নিয়ে, ফের পড়তে হয়। সারে সারে তাড়া-খাওয়া, হেরে-যাওয়া, শাস্তি-পাওয়া, শুধু শুধু গাল-খাওয়া, খেতে না-পাওয়া লোকরা সব চুপটি করে মুখ তুলে চেয়ে আছে।

আপনার তেলোয় হৃদয় নিংড়োবার কল দিদি। তাকালেই দেখতে পাওয়া যাবে, হ্যাঁ, ওই তো সন্ধেমেঘ বয়ে চলে যাচ্ছে, শিংওলা লোকটা এসে তড়িঘড়ি এদিক ওদিক তাকিয়ে বলছে 'এই শোন! আমাকে লুকিয়ে রাখবে? আমার পা ব্যথা করছে, তেষ্টা পাচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে। রাখবে লুকিয়ে?' ওর কপাল কেটে গেছে, টর্চের আলোয় দেখা যাচ্ছে।

আর ওই যে, নোংরা রোগা দশটা বাচ্চা, গায়ে জামা নেই, একটা খোনা, বাকিগুলো কথা বলে না, অহিদিদি-দের বেড়ার ওদিকে ঢিপিমতো হয়ে দাঁড়িয়ে ঠেলাঠেলি করছে, অহিদিদি ভাজা মশলার লোভ দেখাচ্ছেন, ডাকছেন,

পরির গল্প বলছেন, ওরা কাছ ঘেঁষটে আসছে, গোলাপি বাতাসা নিতে নোংরা নোংরা দশটা হাত পাতছে। পিঠেপুলি খেয়ে তো আনন্দ আর ধরে না। অহিদিদি বলছেন, 'ওগুলো কথা বলে না কেন রে?' আর ওদের পান্ডা বগেশ, না, বগেশ না, ও তো খোনা, তাই বঁগেশ, সে বলছে, 'জিবকাটাদের বড় লজ্জা মা।' পরে, অন্য বাড়ি উঠে গিয়ে, গয়লানির কাছে অহিদিদি শুনবেন, দুশো বছর আগে পৌষ পাব্বনের দিন বাসি পিঠে খেতে এসে হট্টগোল করায় এক নিষ্ঠুর সদাগর ন'টা বাচ্চার জিভ কেটে নেন, সবচেয়ে বড়টা পালিয়েছিল।

খেউ-খেউ করছে, ও তো কোকোকুকুর, যে বুড়ো হয়ে গেছে বলে টুটুনবুটুন আর খাটে নিয়ে শোয় না, বরং নতুন বিলিতি কুকুরবাচ্চা এনেছে, তার নতুন ঘুন্টি-দেওয়া লাল কলার এসেছে, সেই কলার দাঁতে কাটার জন্য এখনও আস্তাবলে বাঁধা আছে কোকো। তার দুধ-রুটি বন্ধ।

আর সেই যে মেলায় যেতে জোচ্চোর মতো লোকটার সঙ্গে দেখা হল রুমু-বোগির? লম্বা, হাড় বের করা, চোখ গর্তে ঢোকা, তার ঢাকনি পিটপিট করছে, ভুরু নেই, সোনার পেরেক ফোটানো লম্বা লম্বা দাঁত বের করে খিকখিক করে হাসছে? কী বিচ্ছিরি পিছল-পিছল, না? ঝগড়ু যখন চলো চলো বলে ওদের নিয়ে হনহন করে সরে যাচ্ছে, লোকটা বলল, 'ঘুম থেকে উঠে কী খেয়েছিলে দিদি?' 'ডিমসেদ্ধ রুটি কলা দুধ।' 'তারপর দুপুরে?' 'মাছ-ভাত।' 'আর আমি কী খেইছি জান? সেই কাল রাত্রে চাট্টিখানিক বকফুল ভাজা। তাও একজনকে ভাঁড়িয়ে, পাঁচটা মিথ্যে কথা বলে। মিথ্যে বলা ভারি খারাপ জান তো? কিনবে কিছু? সেই পয়সা দিয়ে আমি আলুকাবলি কিনে খাব।'

একটা সত্যি কথা বলব? আমি যে এত ভাল, মানে বেশ ভাল আর কী, সে অনেকটাই আপনার জন্যে। আগে, মানে আর্লি ছোটবেলায়, হেভি খারাপ ছিলাম। বোন বলল, দাদা তোর আইসক্রিম খাওয়া হয়ে গেলে আমায় চামচেটা দিবি? আমি দেব না যা বলে বারান্দার রেলিং দিয়ে হাত গলিয়ে, নর্দমায় ফেলে দিলাম। খুব আনন্দ পেতাম আমার কটরকটর কথায় অন্য কারও মুখ অপদস্থ হয়ে আমসি হয়ে গেলে। বামন ভিখিরিদের ভ্যাঙাতাম। তারপর আপনার কাছে ভর্তি হলাম। এখন, হ্যাঁ দিদি, আমার ভেতরেও আপনি একটা ছলছলে মায়ার দিঘি পুঁতে দিয়েছেন। সত্যি। অন গড। শুধু যে ছোট্ট মা-হারা নেড়ি বসে বসে নোংরা থাবায় কান চুলকুচ্ছে দেখলে ছুট্টে ঘরে নিতে ইচ্ছে করে তা না। আরও অনেক কিছু। জোনাকির আলোর মতো নরম তুপতুপে একটা আদর গড়ায় আপনার হাত দিয়ে। হ্যাঁ দিদি।

আপনার খোকাখুকুগুলো তো সব ছোঁয়া পেয়েছে। সোনা টিয়া কলের মানুষের জন্যে অবধি কী কাঁদছে রে, বাপ! যদি চাবি ফুরিয়ে এলিয়ে পড়ে থাকে আর শেয়ালে টেনে নিয়ে যায়! যে পেয়াদার ভয়ে ওরা সারা, সে ধাঁই করে গর্তে পড়েছে, টিয়া ছুটতে ছুটতে খালি দাঁড়াতে চায়, বলে 'ওর পায়ের ছাল উঠে যায়নি তো? আইডিন দিতে হবে না?'

আর ওই দেখতে পাচ্ছি, বিশু হাঁটছে মাথা ঝুলিয়ে। বিশুর বাবার সব মাইনে কে পকেট থেকে তুলে নিয়েছে বলে ওদের পুজোর জামাকাপড় কেনা হয়নি, গৌহাটিতে দিদিমার কাছে যাওয়া হয়নি। তারপর বনের মধ্যে গিয়ে বিশু দ্যাখে, আরে, পকেটকাটা বুড়ো! কিন্তু সে হদ্দ গরিব, আবার তার আস্তানায় ভাঙা ডানার, খোঁড়া ঠ্যাঙের পাখিদের রাখে, ল্যাংড়া বেজিকে আদর দেয়, ধেড়ে কালো সাপের শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে বলে তাকে গরম বিছানায় নেয়, অন্ধ শেয়ালকে আস্তি করে। বিশু বলে, তুমি ভেবো না বুড়ো, আমি কাউকে বলব না। জানেন দিদি, পড়ে গলার কাছটা দবদব করে, এক রকম গরম গরম ফোঁটা চোখ ছাপিয়ে পড়ে। আবছা দূরে দেখতে পাই, আপনি একটা দোলচেয়ারে বসে দয়ার পশম বুনে চলেছেন, আর মাটিতে সেই গোল্লা নিয়ে ছটফটে পুষি নির্ভয়ে খেলছে। ওতে ক্ষমার চাদর হবে, না?

এদিকে যা-ই বলি তা-ই বলি, জীবনে আমাদের মহা গোলমাল। কত্ত যে কালশিটের দাগ জামা খুললেই। সাইজে তো বেড়েছি দিদি, বাজার গিয়ে মাছের দরও জানাজানির ভান করি, কিন্তু বেতের চেয়ারে অবধি জোরে হেলান দিলে চামড়ায় ক্রিসক্রস দাগ হয়। লাগে। তখন তুমি বলছ কুমুর গল্প। পা সারাতে ও গেল দিম্মার কাছে, জানলার পাশে লেবুগাছে ঝটপট ঝটপট, আহা, ডানায় গুলি লেগে পড়ে আছে পাখি।

ঝুড়ি বেঁধে বাসা হল, হলদে মলম লাগানো হল, অল্প অল্প করে সেরে ওঠে পাখি, বদমাশ হুলোকে ঠুকরে হটিয়ে দেয়—আর কুমুও তাই দেখে বেশ করে হেঁটে নেয় গোটা ঘর, চুলে ফিতে দেয়, বলে একলা চান করবে। শেষ অবধি কুমুর পাখি একদম ভাল হয়ে ওই আকাশে, ঝাঁকের সঙ্গে শনশন ওড়ে। কুমুর কিন্তু একটা পা একটু ছোট হয়ে যায়। পুরো সারে না। তবু সে কাঁদে না। বলে, 'পা-টা একটু ছোট হলেও কিছু হবে না, আমি বেশ ভালো চলতে পারি।' হাত ছুড়ে ছুড়ে লোম-খাড়া গল্প-বলা বড়মাস্টারেরও তো একটা পা নেই, নাকি হাঙরে কেটেছে, বন্ধুরা টেবিলের পায়া দিয়ে কাঠের পা বানিয়ে দিয়েছে। হুঁঃ, ইচ্ছে করলেই আরও ভাল পা কিনে আনবেন, সে বরং আসল পা-র চেয়ে

ঢের ভাল, দেখতেও তফাত নেই, এদিকে আলপিন ফুটলেও টের পাওয়া যায় না!

তোমার মিটিমিটি হাসির মধ্যে, গালে গাল ঠেকিয়ে জ্বর দেখার মধ্যে, এই পরম কথাটি আছে। বাপধন, যত ঝাপটা আছড়াক, বুকের মধ্যে আনন্দটা কিছুতে নিবতে দিও না। এই মায়ার পিদ্দিম জ্বালিয়ে দিলুম, নরম নরম হাত দিয়ে আড়াল করে রেখো। থাবা তো আসবেই, বুক দিয়ে পড়ে, কাঁপা কাঁপা আলোকে ফের ঝলমলিয়ে নিতে হবে। কিছু নেই বললেই হল? সিঙাড়া আছে, নলেন গুড়ের নরমপাক আছে, এমনকী বললে-কইলে ঝগড়ুটে বোন অবধি আধঘণ্টাটাক বিলি কেটে দেয়। কানকাটা-টা যে পাড়ার ক্লাব অবধি রোজ এগিয়ে দিয়ে আসে, ন্যাজ নাড়ার একেবারে বিরামটি নেই, সে বুঝি কিছু না? আর আমরা আদ্ধেক সংকট খারাপ না আখেরে ভাল, তাও কি বুঝি ছাই?

কাল তোমার একশো বছর হবে, দিদি। শুনেছি আর কলম ধরতে পারো না। নাকি মনটাও ঘুমের দিকে। কিন্তু দিদি, যখন রাত্তিরে পা ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে বাড়ি ফিরি আর দেখি আলোটালো নেই, আর বাথরুমের ভাঙা জানলা দিয়ে রাস্তার হলদে আলো এসে পড়ে এক চিলতে পালকের মতো, আশ্চর্য ইশারার মতো, তখন বুঝি, বাঙালির হাজারটা দগদগে ব্যথার মধ্যে দিয়ে তুমি লীলা মজুমদার হয়ে বয়ে চলেছ। শেষ দিকটা আর 'আপনি' বললাম না দিদি, কেমন তো?

২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

হীরক রাজার দেশে ২০০৭

প্রহরী: ভারতেশ্বর রাজচক্রবর্তী পরাক্রান্ত প্রজাপ্রিয় বহুৎ গুণে ভর্তি হীরক রাজের সভা শুরুউউ! বাইরে ঝেড়ে আসুন গুটখা, পিত্ত, কফ। আর অবশ্যই, মোবাইল অফ!

(সব্বাই উঠে দাঁড়ায়)

কোরাস: গুড মর্নিং স্যর।

রাজা: মর্নিং তো বুঝলাম, কিন্তু গুড কীসে? এক ঘাটে জল খাচ্ছে বেড়ালে ও ফিশে? আসমুদ্রহিমাচল থাকবে এক পিসে? স্ট্যাট-মন্ত্রী, তোমার 'ম্যারাথন সার্ভে' আলো ফেলতে পারবে?

স্ট্যাট-মন্ত্রী: স্যর, প্রথম গ্রাফ-টায় আমরা দেখছি ৩৪%—

রাজা: চোপ!

স্ট্যাট: আঁজ্ঞে!

রাজা: এখানে কি অমর্ত্যবাবু বসে আছেন! ওয়েলফেয়ার কষবেন যিনি! আমরা বুঝি, কোনটা গ্রাফ আর কোনটা সাবাতিনি? শুধু লাস্ট লাইনটা পড় গাধা, স্টোরির মরাল-টা।

স্ট্যাট: 'দেশ ভাল চলছে না।'

রাজা: ইমিডিয়েটলি পাল্টা!

স্ট্যাট: ইয়ে, করে দিলাম, 'দেশের অবস্থা অপূর্ব।'

রাজা: ব্যস। Done। এইটা গলায় ঝুলিয়ে আমরা ঘুরব। তাপ্পর, রক্ষামন্ত্রী? কী খবর, ওদিককার? তালিয়াঁ না ধিক্কার?

রক্ষামন্ত্রী: জাঁহাপন, অবস্থা ফাটাফাটি।

বিদূষক: হেঃ হেঃ, হবে না? এসি ফাটছে, সেলফোনের ব্যাটারি ফাটছে, সিনেমায় অবধি ফাটাকেষ্ট-র ফায়দা।

রাজা: আর পাবলিক তো শালা বুড়বক, টায়ার ফাটলেও ভাবছে আল কায়দা।

এর মধ্যে লুটেপুটে নে, এর থেকে শ্যাম্পেন, ওর থেকে চোলাই। আর বেগড়বাই দেখলেই—

বৈজ্ঞানিক: মগজ ধোলাই!

রাজা: এক থাবড়া।

বৈজ্ঞা: অ্যাঁ!

রাজা: এটাকে কে ঢুকতে দিল রে, বুড়ো হাবড়া! তোর ওই মগজ ধোলাইয়ের ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়তে বেরিয়ে যাচ্ছিল জিভ। তার চেয়ে আড়ং ধোলাই অনেক এফেক্টিভ।

বৈজ্ঞা: কিন্তু আগের বার তো বললেন, এর কাছে কোথায় লাগে পিট্টি—

রাজা: সেটা ছিল নাইন্টিন এইট্টি! ও, ভাল কথা, ইয়ের কী হল, ওই উদয়ন পণ্ডিত—বিদ্রোহী ক্লাউনটার?

রক্ষা: ঝেড়ে দিয়েছি স্যর—'এনকাউন্টার!'

রাজা: বেশ করেছ। হারামজাদা, যার খাচ্ছে নুন, তার কাঠামোয় স্প্রেড করছে ঘুণ! আর ওর বউটা?

রক্ষা: মেয়েদের তো কম্বো-অফার, রেপ প্লাস খুন!

রাজা: ওয়াঃ। আর ওই ব্যাপারটা? ত্রিশূলের ডগায় ভ্রূণ?

রক্ষা: ওটা পুরো জমে ক্ষীর! 'সংখ্যালঘু ভার্সাস বাস্তুঘুঘু'—থুতু, খিস্তি, আকচাআকচি—কন্টিনিউয়াস লাগিয়ে রাখছি। তাপ্পর ক্লাইম্যাক্স বুঝে লেলিয়ে দিচ্ছি ক্যাডার প্লাস পুলিশ—মহল্লায় মহল্লায় লোক পুড়ছে দাউদাউ, আলোয় আলো, দিওয়ালি। মারতে মারতে দলা পাকাচ্ছি, মুখে হিসি করছি, আর্তনাদের তালে তালে তালি। নীচের দিকটা চিরে যাচ্ছি ওপর জ্যান্ত রেখে! আর সেক্স! ওয়া! স্বামীর সামনে বউকে ধরছে, বউয়ের সামনে মেয়েকে।

বিদূ: আর্ট, বাদশা, আর্ট!

সভাকবি: ওই ভ্রূণ নিয়ে নাচ-টা দুরন্ত লোগো।

বিদূ: নেক্সট এপিসোড কী করছ গো?

রক্ষা: একই, শুধু কমিউনিটি পাল্টে দিচ্ছি, সিম্পল। ভিলেন এবার ট্র্যাজিক হিরো, অন্যের গালে পিম্প্‌ল।

রাজা: গ্রেট! শুনলে তোমরা? কী হল, অর্থমন্ত্রী, গোমড়া? বিবেকে লাগল?

অর্থমন্ত্রী: না প্রভু, 'শাইনিং ইন্ডিয়া'-র যা গ্লো—ভাবছি...কয়েকটা দাগি মার্ডারার ইনভেস্ট করতে চাইছে...

রাজা: উঁহু উঁহু, ডোন্ট বি চুজি! খুনি হোক, মুনি হোক, পুঁজি ইজ পুঁজি।

অর্থ: না না, সে তো বুঝি। কিন্তু এদের ইয়েটা লিক করে গিয়ে...যদি বিরোধীরা ইস্যু—

রাজা: আরে ধুর ডরপোক! ইস্যু হচ্ছে হিসু। গন্ধ ছাড়বে কিছুক্ষণ, তারপর সব উবে গিয়ে, ফর্সা। পাবলিকের মেমোরির ওপর নেই ভরসা? নিঠারির শিশু-হাড় কোথায় গেল? মণিপুরের নাঙা মায়ের দল! বল!

বিদূ: ভ্যানিশ!

রাজা: তবে! জাস্ট গড়ে দিবি একটা তদন্ত প্যানেল। আরে ভাই, নকুলদানা সাইজের ব্রেন, দু'শোটা চ্যানেল, দিনে ছ'টা ব্রেকিং নিউজ, তাপ্পর রাখি সাওন্ত এলেই সব ফিউজ—এই তো সামারি। রিপিটেড বলে বলে কোটেশনের মতো লাগছে আমারই। করো যত ঘাপলা-ই, যদ্দিন দিয়ে যাচ্ছ সচি-সৌ—

সভাকবি: আর কচি বউ—

রাজা: হ্যাঁ, বিশ্বসুন্দরী সাপ্লাই—জনগণ গিলবে আর ঢেঁকুর তুলবে! হপ্তা ভরে লাইভ খাবে বচ্চন-নেমন্তন্ন। ভয় কীসের...oh, no!

(ঝড়ের মতো আঁতেলের প্রবেশ)

রাজা: ইইক্স! কী কাণ্ড! সিকিওরিটি! মেটাল-ডিটেক্টর! কমান্ডো!

(পেছনে ছুটতে ছুটতে ঢোকে রক্ষী)

রক্ষী: সরি স্যর, গায়ে গন্ধ দেখে আমি সবে পিওনকে বলছি 'ধমকা', ভিজিটর'স রুম থেকে স্প্রিন্ট টানল আচমকা—। তবে এক্ষুনি ঠুকে দিচ্ছি। এই, ব্যাটাকে ধরি, সর।

আঁতেল: কী! তৈরি করছি শাসক-নাশক আদানপ্রদানের দীপ্ত পরিসর, and you wanna slug me!

বিদূ: ওঃ, ছেড়ে দে, এ কিস্যু করতে পারবে না, বাগ্মী!

রাজা: বলো হে, দেড়েল অতিথি!

আঁত: রাষ্ট্রানুমোদিত বয়ানের বিপরীতে আত্মসমীক্ষণক্ষম পরিকল্প গড়লেই যে অবদমন-বহিষ্করণের মডেলে ঘুলিয়ে দিচ্ছেন প্রতীতি, কেন বুঝছেন না এ হল বদ্ধাঞ্চলে প্রতিদমনস্পৃহার স্বতশ্চল আকাঙ্ক্ষা—অথরিটির পরিকল্পিত বিপর্যাসের প্রতিস্পর্ধী সুরেলা পল আংকা, বা 'হিরোশিমা মন আমুর', 'ক্যাসাব্লাঙ্কা'...অবশ্য যে দেশকল্প প্রক্ষেপিত অধুনা ডায়াস্পোরা-য়—

রাজা: একটি ঠাটিয়ে খাবি কানের গোড়ায়! ব্বাপ, কী চিজ!

কবি: নিঘ্‌ঘাত কম্পারেটিভ, বা ফিলিম স্টাডিজ।

বিদূ: কিংবা নিয়েছে উঃআঃধুনিকতা ৯৯ বছরের লিজ!

কবি: বাংলায় বলতে বলুন না, রাজেন্দ্র!

রাজা: না না এদের ছকটা আমি জানি। জিগাচ্ছে, ওরা যদি রাষ্ট্রবিরোধী ভয়াবহ স্যাবোটাজ চালায়, কেন সেটা স্পনসর করবে না কেন্দ্র।

রক্ষী: কোথায় গুলি করব স্যর? জেনিটাল না ফেস?

রাজা: আরে ধুর, এরা হার্মলেস। তেরোটা তত্ত্বচিন্তা, চোদ্দোটা ফ্যাকশন। যৌবন গড়িয়ে যাবে নিতে নিতে অ্যাকশন। শেষে লিফলেট বিলোবে, যখন ইন্ডিয়ায় আসবে মাইকেল জ্যাকসন। যা দেড়েল, লিটিল ম্যাগ বের কর, টাকা দেব। পেট পুরে বিপ্লব খা, আমি জোগাব ভোজ্য*।

{*শর্তাবলি প্রযোজ্য}

(আঁতেলের প্রস্থান)

রাজা: হুঁ, কালচার-মন্ত্রী, তুমি কীর'ম ফাঁসি যেতে চাও, গ্রুপে, না সোলো?

কালচার-মন্ত্রী: কেন স্যর! কী হল!

রাজা: ক্যানো ছ্যার! শালা, বয়ে যাচ্ছে প্রাইম টাইম, আর তুমি বসে আছ যোগেশ মাইম! বাঁচাচ্ছ আমার টাকা! তোমায় সুপারহিট এলিমেন্ট দেওয়া হল—ওপরে স্যাফ্রন, যেন সন্ন্যাসীর অ্যাপ্রন, নীচে বট্‌ল গ্রিন, যেন সুইট সিক্সটিন, আর মধ্যিখানে ডাইনামিক স্পোক ভর্তি চাকা—তার হীরক জয়ন্তী-তে সিম্পলি নো ধামাকা!

কাল: কেন স্যর আমি তো যথাসাধ্য—

রাজা: কী করেছিস? ছত্তিরিশ বার জনোগণো আর পিড়িং পিড়িং বাদ্য? কই, ময়দানে লেসার শো? টিভি-তে ফিলার তিন-চারশো? গান কই, গান? দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে এ আর রহমান।

কাল: ঠিক বুঝিনি এতটা বিগ স্কেলে—

রাজা: বিগ! বিগের বাবা বিগার! সিপাই বিদ্রোহের হেন বছর, পলাশির তেন বছর—সমস্ত রাউন্ড ফিগার! ওঃ, কোথায় দেশটা সুইপ করবে মাস-হিস্টিরিয়া, যেন QSQT কিংবা ম্যায়নে পেয়ার কিয়া...আলোকসজ্জায় ক্ষুদিরামের ফাঁসি, মঙ্গল পাণ্ডের গোঁফ... তা না, ওফ্‌ফ্! ওরে গরু, দেশময় যেই সেন্টু ঝালাপালা...সুড়ুৎসে পাপোশের নীচে তাবৎ ঘোটালা! লোকে আমায় চড়াত সিন্নি...

বার্তামন্ত্রী : স্যর, কিছু ফোন-ইন নিই?

রাজা: এই এক আপদ! স্ক্রিন করেছ? কী বলছে, প্রথম কলার?

বার্তা: জিগেস করছে, খেয়েছেন কত ডলার। দেশটা কি আমেরিকার কলোনি?

রাজা: আর তাকে তেড়ে চার-অক্ষর বলোনি! কাটো ফোন! ধড়ে মাথা না গরুর পেছন ওটা! পরেরটার কী ইয়ে? সেই এস সি-এস টি কোটা?

বার্তা: না মহারাজ। বলছে, আজকাল বৃষ্টিতে এত পড়ছে কেন বাজ?

রাজা: অ্যা-ই—এই হচ্ছে ইম্পর্ট্যান্ট কল। কোত্থেকে? ওয়েস্ট বেঙ্গল?

বার্তা: হ্যাঁ স্যর, কী করে বুঝলেন?

রাজা: বুঝব না? আআঃ, এই একটা স্টেটের মতো স্টেট! অ্যাডমায়ারেব্‌ল! রাস্তায় রাস্তায় শপিং মল, ঘরে ঘরে কেব্‌ল—ব্যস, ঘেমো মধ্যবিত্ত কাঁকাল বেঁকিয়ে নৃত্য। এবার কার ঝুপড়ি পুড়ল, গো-ঠ্যাঙান খেয়ে উগরে এল কার পিত্তি, কে কার ভবিষ্যৎ, কীসের কী ভিত্তি—চুলোর দোরে! ওদের শুধু চিন্তা, সুচিত্রা সেন কি পাবেন দাদাসাহেব ফালকে? সাধে বলে, ওরা আজ তা ভাবে, যা আমরা ভেবে উঠব কালকে? যাক, কল-টা নাও, পরিবেশ-মিনিস্টার।

বার্তা: ইয়ে, ফোনের বাকি লিস্টটার...

রাজা: হ্যাঁ দেখি। অ্যালাউ—ক্রিকেটে আই সি এল-এর গোঁত্তা। কাট—শয়ে শয়ে চা-বাগান কর্মী, চাষির আত্মহত্যা। বাঃ—বাত সারাতে কী আসন, প্রেসিডেন্সির স্বশাসন, মরে যাচ্ছে কেন এত হাতি। বাদ—জয়েন্টে জালিয়াতি। কিরণ বেদি-র ব্যাপারটা নো কমেন্ট। ব্রেসিয়ারের একশো বছর পূর্তি, সরকারের কি নেই ফুর্তি—এক্সেলেন্ট! এটা 'কলার অব দ্য ডে'!

বৈজ্ঞা: শাহেনশা, নয়া আবিষ্কার, পাবলিকের জন্য ঘুমপাড়ানি বুলেট!

রাজা: হিহিহি! Too late! ওর জন্য গুলি লাগে না বুড়ো মদ্দ, স্রেফ আমার গোব্‌দা পাদপদ্ম!

বৈজ্ঞা: পায়ের গুলি!

রাজা: ইয়া। যত বার জনগণ চক্ষু তুলি জানাতে যাবে খার-টি, তার হাঁ-মুখে ক্যাঁৎ করে লাথি মারবে পার্টি। এই প্রাণায়াম চালিয়ে যাও টানা বছর-থার্টি, ব্যস। পাছু উল্টে পাবলিক অ্যায়সা ঘুম দেবে, স্বয়ং নেতাজি এসে ডাকলেও, 'ডিসটার্ব কচ্চিস কে বে!'

বিদূ: লাথির জয় জগৎময়।

রাজা: কিক কি না?

রক্ষা: কিক।

কবি: কিক।

কোরাস: কিক। কিক। কিক।

রাজা: ফুডু! অনাহারের রিপোর্ট তো খুব ব্রাইট নয় দেখছি? ভুখারা কি কুড়িয়ে পাচ্ছে চাউমিনের ডেকচি?

খাদ্যমন্ত্রী: ওটা স্যর কিচ্ছু করা যাচ্ছে না, কইমাছের জান! বিশ্বাস না হয় গ্রামে কমিটি পাঠান! কুৎসিত থেকে রূপসী—হোলসেল উপোসী! তবু ট্যাংটেঙিয়ে সেঁটে আছে, এঁটুলির দল! প্রাণে জাম্বো-ফেভিকল!

বিদূ: তো কী খেয়ে হচ্ছে মোটু? স্রেফ H_2O আর O_2?

খাদ্য: চাল না পেলে ঘাস খাচ্ছে, ঘাস না পেলে মাটি! মাটি না পেলে খেয়ে দেবে চড় কিংবা চাঁটি! গোটা দেশটা অনশন-এক্সপার্ট! তবে স্যর, হাল ছাড়িনি, বিছিয়ে চার্ট-ফার্ট রোজ বসছি ডেস্কে। আপনি জিগান পরিবেশ-কে!

পরিবেশমন্ত্রী: ইয়ে, আমারও ওই, মানে, কতকটা একই স্টোরি। হরিবোল-টা হয়ে গেছে, বাকি বলহরি। বিষধোঁয়ায় ফেলে দিচ্ছি লাংস-এ কালচে চড়া, লট কে লট, বলতে পারেন, হাঁটুন্তি মড়া। ধপ করে ফাইনাল পড়া-টা পড়ছে না কেন, আমি বুদ্ধিহীন।

বিদূ: কেউ হয়তো প্রম্পট করেনি, 'ওরে, লাস্ট সিন!'

রাজা: যাকগে, যা-ই হজম দিক, সেঁকো বিষের চচ্চড়ি বা দুব্বোঘাসের ডালনা, এরা তো ইটার্নাল না! ওদিকে এডু-র দারুণ রোল! ওর কাজ নয়, তবু করে দিচ্ছে পপুলেশন-কন্ট্রোল!

শিক্ষামন্ত্রী: থ্যাঙ্কু। আসলে এই বেঁটে বজ্জাতগুলোর ক্রিম-চকচক ত্বচা, কিন্তু ভেতরটা পচা! মরকুটে! এই বয়স থেকে ঢুকছে অর্কুট-এ, বগলে বেব্লেড-বার্বি...আমার ইনস্ট্রাকশন সিধে—বাথরুমে দেরি, চুলে টেরি, হোমওয়ার্কে তেড়িমেড়ি—ঝাঁপিয়ে পড়ে মারবি! এবার, জাস্ট ছ'আট ঘণ্টা স্কেল পেটালে, বন্ধ রাখলে বাক্সে, যদি চোখ ওল্টায় ঝড়াকসে, বলুন, হাবলা-দুবলা কিতনা! এদের তো বাঁচাই উচিত না!

রাজা: রাইট! কী রে, কালচার, কিছু ভেবে পেলি? তোর প্রথম টাস্ক কী?

কাল: আজ্ঞে একটি ডাঁটো স্বাস্থ্যবতী, টাইট শাড়ি, ভিজে-ভিজে ঠোঁট, গলাটা হাস্কি। সে টিভি-ব্রেকে আওড়াচ্ছে দেশপ্রেমের বুলি।

রাজা: এই তো, ওয়ার্ম-আপ করছে খুলি। তবে শাড়ি-ফাড়ি খুলে নাও। স্ট্রেট আইটেম-নাম্বার।

কাল: অ্যাঁ! একটা তো জায়গা চাই থামবার...

রাজা: থামবে! এটা কে রে! শামুক না গাধা? স্টার্ট নিতে না-নিতে থামার ইরাদা? ইন্ডিয়া এখন লিড করছে হে! স্টেরয়েড ঠুসে নাও টিংটিঙে দেহে!

কাল: তাইলে ছাপছি রঙিন প্যামফ্লেট, কভারে মন্দির-মসজিদ-গির্জা। পাতা ওল্টালেই লো-অ্যাঙ্গলে সানিয়া মির্জা।

রাজা: এগো! তোর হবে! অলরেডি দেশপ্রেমকে বনসাই করে ঠুসে দিয়েছি টবে। কবি, একশো কোটি ভেড়ুর কাছে হোয়াট ইজ দেশ?

কবি: এস এম এস!

রাজা: এগজ্যাক্টলি! লোকে চোখের সামনে তড়পে মরছে, ঘা-ভর্তি মাছি নিয়ে কাঁপছে আঁস্তাকুড়ে, জল চাটছে নর্দমায় ঘিস্‌টে! সব দেশপ্রেমী পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। মোবাইল টিপে তাজ-কে তুলছে সাহেবদের লিস্টে।

প্রহরী: স্যর, ফের ভিজিটর!

রাজা: এবার কে, রোলাঁ বার্থ?

প্রহরী: না, দুটো বহুরূপী।

রাজা: এসে গেছে! ডাক ডাক ডাক! কুইক, দুটো রক্ষী গার্ড কর দরজার গোড়া। ও ব্যাটারা ঢুকলেই টেনে খুলবি জুতোজোড়া!

(চাউস চুল-দাড়িওলা, অদ্ভুত-শুঁড়ওলা-জুতোপরিহিত দুই বহুরূপীর প্রবেশ। প্রহরীরা পায়ে হুমড়ি)

বহুরূপী ১: এ কী! এ কী! এ কী! পেন্নাম করছে দেখি!

বহু ২ : আমার আবার শ্রদ্ধা দেখলেই র‍্যাশ বেরোয়! রেসপেক্টে অ্যালার্জি। এই তো, গজাচ্ছে ফোঁড়া! রাজা, প্লিজ ফিরিয়ে দিন জুতোজোড়া, আর্জি!

রাজা: তা বললে কী হয়? এ আমাদের অতিথি-বরণ প্রথা। স্লাইট ভদ্রতা। তা, মহাশয়দ্বয়, ঘোর গরমে এই অ্যামাউন্ট অব চুল-দাড়িময়! কুটকুট করছে না? আগে কেটে ফেলুন। সভাঘরের অ্যাটাচ্‌ড আছে সেলুন।

বহু ১+২: ইঁ! বলেন কী? না না! আছে গুরুর মানা! আমাদের ব্রত খুব শক্ত। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ভক্ত।

রাজা: উঃ! ভিটভিটে ডান! অ্যাই প্রহরী, শালা জেড ক্যাটিগরি! টান!

প্রহরী: কী টানব হুজুর?

রাজা: কী আবার? ফল্‌স চুল আর দাড়ি! টান তাড়াতাড়ি! ছিঁড়ে নে গাল! ছদ্মবেশ ধরেছে, তা-ও সস্তা মাল! ইইঃ, বহুরূপী!

(দু'জনেরই চুল-দাড়ি কাড়া হয়)

কোরাস: আঁইক্‌স! বাঘা আর গুপি!

রাজা: কী হে, গাইন প্লাস বাইন? জানো না বেসিক আইন? ভিসা ক্যানসেল সত্ত্বেও ঢুকলে ধড়-টি বেলাইন?

বিদূ: দেখুন স্যর, ঠিক লাদেন-এর মতো এই পাজিরা। যেই ভাববেন আপদ চুকেছে, ফের আল-জাজিরা।

রাজা: কিন্তু এখানে অদ্যই শেষ হাজিরা। বল, কী চাস?

গুপি: মানে, রাজামশাই, আপনি তো রক্তচোষা অর্থপিচাস, তাই আমরা নুকিয়ে নুকিয়ে ঠিক করেছি—উক্স! (*বাঘা কনুইয়ের খোঁচা মেরে থামায়*)

বাঘা: ইয়ে, হিরুদা, আপনি তো উদার, চিকন...এট্টু গান শোনাব। কী কন?

রাজা: হাহাহা! কী কারবার! একই স্ট্র্যাটেজি বার বার? একদম গেঁয়ো! সদিচ্ছা বেশি, থট কম! অন্তত দেখে নিবি তো 'রেবেলিয়ন ডট কম'।

কবি: গান তো দারুণ রিলিফ, মসিয়েঁ?

রাজা: দেব দু'ঘা বসিয়েঁ? এই সব গর্দভ পুষি আমি, ঘুষের টাকা লোন দিই? জানিস, ওদের পেটে পেটে কী খতরনাক ফন্দি? গান হবে, তাল হবে, সমস্ত লোক স্টিল, গোটা ক্যাবিনেট পিছমোড় বেঁধে থাপ্পড়-ঘুঁষি-কিল, হেঁচড়ে-ঘেঁসড়ে বাইরে নেবে, ওয়েট করছে ভ্যান, স্ট্রেট ধাপায় নিয়ে ফেলবে উপুড়—এইটা হচ্ছে প্ল্যান! কিন্তু ছুঙ্কুমোনা, তোমাদের ওই প্ল্যানের দুধে ঝলমলে গোচোনা! ওই ভ্যানের ড্রাইভার যে, বহুদ্দিন বহাল রাজকার্যে, আমার টপ-ক্লাস খোচড়। সে জন্যই তোদের ব্লু-প্রিন্ট আমার পকেটে খাচ্ছে মোচড়। তাইলে এবার? কে হবে খানখান? আর কে গাইবে এন্ড-গান?

বাঘা: আঁ! আপনি সব জানেন?

রাজা: সব খবর রাখা, সব ব্যবস্থা পাকা, সব তত্ত্ব ছাঁকা। বল, ফাঁসি কবে, কালই?

বাঘা: ইয়ে, হয়েছে কী, আমরা না, বাথরুম যাচ্ছিলাম, দিয়েছি ভুল তালি...

রাজা: ছোঃ, বিদ্রোহী ফেলল কেঁদে? ওরে! এদের মাথা মুড়িয়ে, উল্টো গাধায় চড়িয়ে, দূর করে দে!

(*গুপিবাঘা-কে প্রহরীরা নিয়ে যায়*)

কোরাস: স্যর, ওদের ছেড়ে দিলেন!

রাজা: আরে ভাই, আমি কি যে-সে ভিলেন? এর পর আছে ওদের সিডি-কে প্রাইজ দেওয়ার প্ল্যান।

কোরাস: অ্যাঁ!

রাজা: হ্যাঁ, ওইটা বরং বখেড়া হয়ে গেছে, ওই কী একটা লেখিকার বিরুদ্ধে ব্যান। মৌলবাদীগুলো ছিল বেশ আস্থাভাজন...

রক্ষা: কিন্তু রাজন! ঠিকই তো করেছে, বাক্‌স্বাধীনতার ফটরফটর তো...

রাজা: তোর ঘিলু মে প্রি-হিস্টোরিক গর্ত! আগের ওঁয়ারা বলত, ডেঞ্জারাস

ধারণা তুমি অ্যালাউ করতে পারো না। কিন্তু আমি বলি, জাস্ট বয়ে যেতে দে। ওয়েট। অপেক্ষা। রাষ্ট্রের হাতে প্রচুর সময়। বসে কেক খা।

রক্ষা: সরি, স্লিপ অব টাং হয়ে গেছিল।

রাজা: আর কক্ষনও না হয়। মনে রাখবে, ইগনোর দেওয়ার চেয়ে বড় কিচ্ছু নয়। কোনও যুদ্ধ, কোনও অ্যারেস্ট, কোনও রেষারেষি—জোরালো নয়, ইনডিফারেন্সের চেয়ে বেশি। একদম চিল্লাবে না, কোব্‌তে কার? ভিডিয়ো কার? পাত্তা না দিতে দিতে, লোক ভাববে, অঃ, মিডিওকার।

কোরাস: শিরোধার্য, মহর্ষি! শিরোধার্য!

বিদূ: অমৃত-প্যারাগ্রাফ! আছে ভোলবার জো?

মহিলামন্ত্রী: স্যর, আমি একটা—

রাজা: কথা বলবি? কেন, যথেষ্ট হচ্ছে না ঘুষ কি? না শ্যাম্পুতে খুশকি?

মহি: না স্যর, মেয়েদের ইস্যুটা নিয়ে জেনুইন প্রোটেস্ট হচ্ছে। ভ্রূণহত্যা, তাপ্পর পণ না দিলে কেরোসিন, রাস্তাঘাটে মেয়েরা বিপন্ন...

রাজা: তা মেয়েছেলে হয়েছেই তো পুরুষের থাবা খাওয়ার জন্য! লোভের লজেন্স আস্ত! উসখুস করছিস? কিছু বলবি, স্বাস্থ্য?

স্বাস্থ্যমন্ত্রী: হ্যাঁ স্যর! আগে তো হাসপাতাল মানে ছিল কুকুরের ঘৌ, বেড়ালের লাফ? উই আর প্রাউড অব আ নিউ ফিচার। অজ্ঞান রোগিণী দেখলেই মলেস্ট করছে স্টাফ!

রাজা: ব্রাভো! এক দিন তোদের হসপিটালে যাব! দেখেছ, সেক্স-স্টার্ভড কান্ট্রিকে কীর'ম দিচ্ছে সার্ভিস...

মহি: ফেল করছে আমার নার্ভ...ইস! থ্রেট নিয়ে জড়ো হচ্ছে দল...

রাজা: খিকখিক। তো কী করব বল? লাফাব? তোর ওই শতফণা 'এন জি ও' কী করবে ক্ষতি? এক দিন ধর্নায় আনবে মেধা, এক দিন অরুন্ধতী। ব্যস, নুচি জল! প্রোটেস্ট ডিল করা শিখবি? লুক অ্যাট ওয়েস্ট বেঙ্গল! 'আই পি টি এ' থেকে 'আয় পিটিয়ে...' ওওঃ, কী স্টেট! ইভ টিজিং-এর প্রতিবাদীগুলো—পোঁয়াপাকা দামড়া গুলো—থানায় ডেকে অ্যায়সা হ্যারাস, মেরুদণ্ড হেঁট!

বিদূ: অধিপতি, তাইলে কখনও ইগনোর, কখনও হ্যারাস...?

রাজা: ক্যাডাভ্যারাস, অ্যাঁ! হ্যাহ্যাহ্যা! আরে, পেরিয়ে গেছে বছর সাতাশ, এখন অনেক ম্যাচিওর বাতাস! বোঝ, আমি তো ভগবান রে! বেণু বাজাই বা প্রলয় নাচি, আমি তো ফুল তুলবই। আমার কীসের রুল-বই? একে রাখব মুম্বই, ওকে ফেলব কাশ্মীর, এর ভাগ্য সত্যজিতের, ওর সফদর হাশমি-র।

বিদূ: স্যর, শুধু ইগো-র ব্যায়াম নয়, এ তো ডিপ থিংকিং-এর কোশ্চেন...

রাজা: অ্যাই, অ্যাদ্দিনে তোমার মাথায় আসল বুদ্ধি বসছেন। আমি সুপার-ওয়াসিম আক্রম। প্রতিটা ডেলিভারি আলাদা, নতুন, অন্য! কোনটা রিভার্স সুইং, কোনটা ইয়র্কার, কোনটা ছাড়ার জন্য—বুঝতে দেব না, ছকে পড়ব না, আরে কবি, ওয়ার্ড-টা বলবি তো?

কবি: আনপ্রেডিক্টেব্‌ল, স্যর—আন্দাজাতীত! আপনাকে রিড করবে, কোনও অপোনেন্টের সাধ্যি না—

রাজা: ওই জন্যই 'মগজ ধোলাই' বাতিল, বুইলি কিনা? ওটা ছিল ওয়ান-ট্র্যাক, গোঁয়ার। এক বার মন্ত্র সেঁধিয়ে দিলে বের হবে না তো আর! ইদিকে আমি খেলছি মাল্টি। সকালে বলব আমেরিকা বাজে, বিকেলে খাব পাল্টি! বুড়ো বৈজ্ঞানিক—ক্যাজুয়াল হও, তোমার মধ্যে পারফেকশনিস্টের প্যানিক।

বৈজ্ঞা: আপনি ব্রহ্ম, স্যর। প্রুভ্‌ড! দেশের সিচুয়েশন ব্যাড থেকে ব্যাডার।

রাজা: তবে! পাবলিকের আদ্ধেক কেন্নো, বাকি আদ্ধেক ক্যাডার।

বিদূ: সব শালার মেরুদণ্ড গুঁড়ো!

রক্ষা: পাউডার পুরো, এক্সেলেন্সি! ছেলে থেকে বুড়ো।

রাজা: হাঃ, কী বানায়েছি বিপুল! ল্যাদাড়ুস পিপুল! জঞ্জাল ভ্যাট-এ ফ্যালে না, জাঙিয়া রোদে ম্যালে না, অফিসে ফাইল ঠ্যালে না, বল সোজা ব্যাটে খ্যালে না। টাকা কামায়, জিমে গা ঘামায়, কিন্তু চাইনিজ খেয়ে আঁচায় না, ধর্ষণ দেখলে বাঁচায় না।

কবি: তবে এদের কী গতি? প্রজাপতি!

রাজা: এদের? পুলিশ কাটবে, টেরর ফাটবে, ফোড়ন চাটবে আমলা। এরা ই এম আই ছাড়বে, কমিশন ঝাড়বে, হারবে মিথ্যে মামলা। এরা পাঁচটায় চেলসি, ছটায় এল সি, সাড়ে-সাতটায় তিন-পাত্তি। খাবে ভাতের সঙ্গে ডালের সঙ্গে মালের সঙ্গে লাথি! কাঁদবে কেঁউ কেঁউ কেঁউউউ!

বিদূ: বলো, লাথির জয় জগৎময়।

রাজা: কিক কি না?

রক্ষা: কিক।

বৈজ্ঞা: কিক।

কোরাস : কিক। কিক। কিক।

২৬ অগস্ট, ২০০৭

অন্য অন্য

খাড়া বড়ি থোড়

সতর্কীকরণ : এখানে তাবৎ আলোচনাই মূল স্রোত নিয়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রবণতা নিয়ে। অর্থাৎ এখানে 'বাঙালি' মানে অধিকাংশ বাঙালি। পাবলিক আর কী। আপনি বাদ।

'বাঙালির বিনোদন বিষয়ে বেশি বলা বাতুলতা। বস্তুত বিনোদনই এই বিবদমান, ব্যবচ্ছেদকামী, বিছানাবিলাসী বৃহৎবর্গের বার্ধক্যের বারাণসী, বঞ্চনার বন্দে মাতরম, বিকেলের বোরডম-বিনাশ।'

বিনায়ক বসুরায়, বাঙালির বয়স বাড়ছে

আমি মধ্যবিত্ত বাঙালি। তাই অনাহার বা হিরের খনি নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা সৌরভ গাঙ্গুলির পড়তি ফর্ম। কিন্তু লেখালেখি করতে গিয়ে তো তা স্বীকার করলে চলে না, তখন বিশ্বায়ন এনে ফেলতে হয়। ছোটবেলায় যে কোনও রচনা লিখতে গিয়ে যেমন দুম করে 'অনির্বচনীয়' আর 'পরিপ্রেক্ষিত' ঠুকে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকতাম, এখন তেমনি দু'চার পিস 'বিশ্বায়ন' আর 'খোলা বাজার' লাগালেই অনর্গল হাততালি। বিশ্বায়ন মানে কী? ফ্র্যাংকলি, আমি জানি না। কিন্তু আমি ছাড়া সকলেই দেখছি জানেন। এবং নানাবিধ জানেন। কারও কাছে সে বচ্চনাতীত হিরো, কারও কাছে প্রাণঘাতী ভিলেন। এবং এ-প্রান্ত বা ও-প্রান্তে নিতান্ত অজান্তেই যেহেতু ঢুকে পড়তেই হবে, সেহেতু আন্দাজের দু'একটা খুচরো ঢিল আমার পকেটেও আছে। তাই ছুড়ে আমি বুঝি, বিশ্বায়ন মানে কিছু মানুষের সাংঘাতিক মোটা মাইনের চাকরি পাওয়ার সুযোগ, আর সব মানুষের বাড়ি বসেই অপসংস্কৃতি ভোগ করার সুবিধে।

অপসংস্কৃতি কী? যাতে সেক্স আছে, তা-ই অপসংস্কৃতি। মানে, যে সিনেমায় বা মিউজিক ভিডিও-তে। বই হলে চলবে না। বই পড়া উঠে

গিয়েছে। তো বাঙালির বিনোদনের বিনম্র ও বিশুদ্ধ বাতায়নে বিশ্বায়নের বিধ্বংসী বিপর্যয় বিকট বোমা বিস্ফোরণ বাগালো কি না, তা-ই নিয়েই বাগাড়ম্বর।

বিনোদন কয় প্রকার? টেলিভিশনপ্রকার। ঈশ্বর যেমন সকলের টিকিই নিজ তর্জনীতে বেঁধে রেখেছেন: আস্তিককে তার বিশ্বাস, নাস্তিককে তার অবিশ্বাস ও অজ্ঞেয়বাদীকে তার সন্দেহ অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি টেলিভিশনই সেই অমোঘ দীন-ই-ইলাহি যার কাছে এসে অন্য সব শিল্প-মাধ্যম বাপ-বাপ বলে এক দেহে লীন হয়ে যাওয়ার আর্জি জানায়। আপনি কোন সিনেমা দেখতে যাবেন তা নির্ভর করছে টিভিতে কোন সিনেমার 'প্রোমো' আপনার সবচেয়ে ভাল লাগল, তার ওপর। কোন ক্যাসেট শুনবেন তাও ঠিক করে দেবে আপনার প্রিয় মিউজিক ভিডিও। আর বেশি দিন নেই, পিংপিঙে কবি আর হুমদো ঔপন্যাসিকেরা বই বেচার একমাত্র উপায় হিসেবে ছোট ছোট কবিতা/উপন্যাস অংশপাঠের ক্যাপসুল 'ফিলার' হিসেবে চালাবেন চ্যানেলে চ্যানেলে। লিটল ম্যাগাজিনরা স্পনসর করবে আঁতেল-অনুষ্ঠান স্লট (ভোর চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা)।

আর টিভি-র নিজস্ব যারা ছানাপোনা, অর্থাৎ সিরিয়াল ও বিজ্ঞাপন, তাদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তো প্রবন্ধাতীত। কোন বাঙালিশাবক বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন যে নিজের পরিবারের সমস্যা তাঁর কাছে 'এক আকাশের নীচে'র পরিবারের সমস্যার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? কিন্তু প্রকৃত ধমাকা অন্যত্র। খেয়াল করে দেখবেন, স্কুল কলেজে পাড়ায় তাবৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিতর্ক বা তাৎক্ষণিক বক্তৃতা তুলে দিয়ে তার জায়গা নিয়েছে অন্ত্যাক্ষরী আর কোরিওগ্রাফি (ডাক নাম 'বুগি উগি')। এমনকী আপনার ডিওডোর‍্যান্ট-সমৃদ্ধ প্রেম বা ডিস্কোথেক-এ উদ্বাহু শিম্পাঞ্জি-নৃত্যও নির্ধারিত ও নির্মিত হয় টেলিভিশন-দর্শন দ্বারাই, সে আপনি zানতি পারুন আর না-ই পারুন।

তবে লিটল ম্যাগাজিনের কথাটা মজা করে বলছি। সত্যিকারের ভাল লেখাপড়ার দিন শেষ। যাঁদের এ প্রসঙ্গে দশদিনব্যাপী শীতকালীন মোচ্ছবের কথা মনে পড়ছে, যখন বেপরোয়া মিনিবাসও পার্ক স্ট্রিটে আস্তে হয়ে গিয়ে বুক ফেয়ার বলে তারস্বরে চেঁচায়, তাঁদের বলিহারি। 'আমজনতার শিল্পসমাদর' গোছের সোনার পাথরবাটি যদি থাকেও, তা এই হট্টমেলায় নিজের পোর্ট্রেট আঁকিয়ে, চালে নাম লিখিয়ে, কচুরি আইসক্রিম সাঁটিয়ে, নাম করা পাবলিশারদের প্যান্ডেলে প্রতিমাদর্শনের লাইনে দাঁড়িয়ে, সম্বচ্ছরের কোটা

একটা করে রহস্যরোমাঞ্চ সিরিজ বাচ্চাদের হাতে গুঁজে দিয়ে ধুলো খেয়ে বাড়ি ফেরা হন্তদন্ত গেরস্থ-দম্পতির ঝুলিতে নেই। যদি থাকত (অর্থাৎ বইমেলার শনি-রোববারের ভিড় যদি হত বাঙালির গ্রন্থপ্রীতির সূচক) তা হলে আর কলেজ স্ট্রিটে গাড়িঘোড়া চলতে হত না। পাড়ার সিনেমা হল-এ নুন-শো-তে কবি সম্মেলন হত। ছেলেপুলের নাম রাখা হত কমলকুমার। যে কোনও নয়া পার্বণে চোখকান বুজে সবার রঙে রং মেলাবার এই বিপজ্জনক প্রবণতাই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেরও দফারফা করল বলে। ডেলিগেট পাস পাওয়ার জন্য উন্মত্ত কাঙালপনা, এদিকে বুনুয়েল আর বাঘা তেঁতুলের তফাত জানি না, এ জিনিস চক্রবৃদ্ধি হারে সহস্রগুণ বাড়তে বাড়তে 'এক দিন সশব্দে ফেটে পড়বে নন্দন-চত্বরে।

কিন্তু এখানেই নিহিত আছে এক তুলকালাম প্যারাডক্স। বাঙালির এই পরমহংস-মাফিক দুধ থেকে জলটুকু শুষে নেওয়ার ক্ষমতা, এই স্রোতে নেমেও বেণী না ভেজাবার আকুলতা, এই পবিত্র পল্লবগ্রাহিতাই একাধারে তার আত্মঘাতের কুড়ুল এবং তার রাংতা-মোড়া রক্ষাকবচ। সীমাবদ্ধতাকেই শক্তি করে তোলো, দুর্বলতাই হোক তোমার জোরের জায়গা, দাড়িওলা দার্শনিক বলেছিলেন। অফসাইডে সতেরোটা ফিল্ডার থাকলেও সে দিক দিয়েই চার মারো।

কিন্তু এ সবের আগে আমরা চট করে বুঝে নেব 'রিমোট অভিযোজন'-এর তত্ত্ব। অভিযোজন হচ্ছে ভিন্ন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার কৌশল। যখন যেমন, তখন তেমন হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা। এই কাজের জন্য ক্যাকটাস কাঁটা গজায়, সুন্দরী গাছ শেকড় উঁচিয়ে রাখে, নববধূ শ্বশুরালয়ে ধীরে কথা কয়। রিমোট অভিযোজন বিশ্বায়ন-উত্তর এক আশ্চর্য শারীর-মানসিক প্রক্রিয়া। রিমোট কন্ট্রোলের বিভিন্ন সুইচে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চাপ দেওয়ামাত্র আয়তাকার পর্দায় যে চ্যানেল ফুটে উঠছে, মুহূর্তঝলকে দর্শকের সমগ্র সত্তার সেই চ্যানেলোপযোগী রূপ পরিগ্রহ করা। সহজ ব্যাপার। বাঙালি দর্শক যখন যে চ্যানেল দেখেন, তখন তাঁর মনটাও সে চ্যানেলের শর্ত, ধর্ম, বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিমেষে নিজেকে ছাঁচে ঢেলে নেয়। যেমন যখন ইংরিজি সিনেমা দেখি, নায়কনায়িকার প্রগাঢ় আশ্লেষ ও চুম্বন খুব স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নিই কিন্তু বাংলা সিনেমায় নাক ঘষাঘষি করলেই আঁতকে উঠি, কিংবা হিন্দি সিনেমায় হেলেন উরু-দেখানো নাচ নাচলে দিব্যি লাগে কিন্তু বাংলা সিনেমায় ঠিক ওই রকমটা ঘটলে ভুরু কুঁচকে ওঠে। প্রাচী, নিউ এম্পায়ার, আর রক্সি-তে আমরা

আলাদা আলাদা, তিন রকম, মন নিয়ে ঢুকি। সেই মনগুলোর সংস্কার, শাসন, মাত্রা ও পরিমিতির ধারণা ভিন্ন। রিমোট হাতে এই মনবদল ঘটে সেকেন্ডের ভগ্নাংশে, ঘটে যেতে পারে অবিশ্বাস্য দ্রুতলয়ে, অনন্ত বার। স্টার মুভিজ দেখার সময় আমরা ভায়োলেন্স-তৃপ্ত হলিউডি, শেখর সুমন দেখার সময় অলজ্জ ভাঁড়ের ভ্রাতৃসমিতি, এফ-টিভি ফুটে উঠলে প্যাশন-উপাসক ফরাসি এবং সি টি ভি এন-এ ফিরে এসে ফের পাতি, ভেতো বাঙালি।

এখানেই মজা। পাতি বাঙালির চৌহদ্দি আদৌ সম্প্রসারিত হচ্ছে না। ইংরিজি সিনেমার স্মার্টনেসের পরক্ষণেই বাংলা সিরিয়ালের লজ্‌ঝড়ে কর্মকাণ্ডেও আমরা সমান স্বচ্ছন্দ। হৃদয়ে কোনও ঝাঁকুনি লাগে না। পার্টিশনগুলো এতটাই পোক্ত যে ও-ঘরের রান্নার ঘ্রাণ এ-ঘরে এলেও, হাঁড়ি কঠোরভাবে আলাদা। নতুন নতুন হুজুগে ও যুগ-পরিবর্তনে আমরা যতই বল্গাহীন যোগদান করি না কেন, যতই নতুন নতুন জিনিস, চিন্তা, মোড়ক, মড়ক, মহৌষধির সংস্পর্শে আসি না কেন, এক অদ্ভুত, অগভীর, নিস্তরঙ্গ আয়াস আমাদের আয়ত্ত যা আমাদের স্থিত রাখে নিজ কুলুঙ্গিতে, গ্রীষ্মে-শীতে। বিনোদনের উপকরণ বেড়ে যাচ্ছে হু-হু করে, ছাদের জটিল অ্যান্টেনার বদলে ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে সরল তার বয়ে আনছে বহির্বিশ্ব, বহুবিচিত্র ছক্কাপাঞ্জা চোখ ধাঁধিয়ে কান ঝাঁঝিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু মরমে পশছে না। যদি পশত, বাঙালির নিজের শিল্পে ও শিল্প-পছন্দে তার প্রকাশ ঘটত। বিনোদনের দুনিয়া বদলেছে। কিন্তু বাংলা বিনোদন সম্পর্কে বাঙালির ধ্যান ও ধারণা মার্কামারা রকমের জগদ্দল।

কানাঘুষো হল, আমেরিকা আমাদের ভিতরমহলে উপস্থিত। আমেরিকা মানে, পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতি। আগে কালাপানির ওপারকে বলা হত 'বিলেত', এখন বলে 'আমেরিকা'। তো, এই বৃহত্তর আমেরিকার সিনেমা সিরিয়াল মিউজিক ভিডিও যে ধাঁ-করা বিশ্বটি রচেছে, তার মূল উপাদান হল ভাবনা, বিষয়বৈচিত্র, প্রয়োগকৌশল। ভাবনায় ওরা প্রাণপণ পরিণতমনস্ক। প্রেসিডেন্টকে বিদ্রূপ করে শুইয়ে দিচ্ছে, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে চাবকে লাল করছে, মহাপুরুষদের নিয়ে লোফালুফি খেলছে, সামাজিক অনুমোদনের তোয়াক্কা না করে নিজের নির্লজ্জ কামনাবাসনার কথা চিৎকার করে জানাচ্ছে, মানুষ মানুষীর সম্পর্কের পেলব আস্তরণ ছিঁড়ে খুঁড়ে দুষ্টব্রণ খুঁটে রক্তারক্তি করে তবে শান্তি। এ সবের জন্য যে রসবোধ, সহনশীলতা, সপ্রতিভতা ও একটা পর্যায় অবধি সততার দরকার, তার কোনওটাই ধারণ করার ক্ষমতা বাঙালির

নেই। অসম্ভব ভালবাসা সত্ত্বেও উমা মহাদেবের বীর্যের তেজ সহ্য করতে পারেননি, সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলেন। বাঙালিরও, সেই আধারই নেই। তার পছন্দ মেদুর, আলাভোলা, ভবন্দোলা সংস্কৃতি। সে চায় প্রচলিত ধারণার অনুগমন, পুরাতনের পুনঃপ্রবর্তন। থোড় ও বড়ি দিয়ে আবার কী খাড়া হল দেখার জন্য তার উৎসাহ উথলে ওঠে। এবং তার বিনোদনের গায়ে কোনও কাঁটা বা খোঁচ থাকলে চলবে না। নিরুপদ্রব, নিরাপদ, সবাইকে তোষণ করে চলা, গা-বাঁচানো, নেকুপুষুমুনু শিল্প সে করে এবং করায়। সাবধানে থাকে, কারও পা মাড়ায় না, শুধু সেই সাপ গোটা দুই মারে যার শিং বা নখ নেই। এইভাবে মধ্যবিত্ততার গুটি বুনে, তার মধ্যে পাশ ফিরে শোয়।

এদিকে আমেরিকা এনে ফেলেছে গুচ্ছের ঘরানা, ধরন। স্টার মুভিজ-এ যে কোনও এক দিনের মেনু লক্ষ করলেই দেখা যাবে প্রত্যেক সিনেমার জন্য ওরা একটা করে খুপরি নির্দিষ্ট করেছে। কমেডি, সায়েন্স ফিকশন, রোম্যান্স, অ্যাকশন, ফ্যান্টাসি, আরও দেদার খেলনা। যা লেবে তাই চার আনা। এই খুপরিগুলোর কিন্তু পরস্পর মুখ-দেখাদেখি বন্ধ নয়। একে অন্যকে ওভারল্যাপ করে, আত্মসাৎ করে, ভ্যাঙায়, মিলেমিশে নতুন খুপরি বানায়, আবার কেউ সবাইকে অস্বীকার করে। সিরিয়ালেও তাই। এখানে বিকিনি-পরা স্পাই, ওখানে মধ্যযুগীয় জাদুকর, এ সিরিয়ালে মহাকাশযানভর্তি উদ্ভট প্রাণী, ও সিরিয়ালে আইবুড়ো উকিলের হাসির হয়রানি। দশকর্মভাণ্ডার না সাজালে এ যুগে ব্যবসারও ক্ষতি। সেজন্যেই সাড়ে বারোটা থেকে স্ট্যালোন শুধু পেটাচ্ছে, একটাও কথা বলছে না, আড়াইটে থেকে ডাসটিন হফম্যান তড়বড় করে কথা বলেই চলেছে, আদ্ধেক উচ্চারণ বোঝা যাচ্ছে না।

বাংলা সিরিয়াল/সিনেমায় আবার নামটামগুলো শুধু বদলায়, বাকিটা এক। এক সমস্যা, এক সমীকরণ, এক সমাধান। একভাবে আসে, একভাবে যায়, জামাকাপড়ের রং বদলায়, সিন বদলায় না। যেন একটাই মেগা-যাত্রাপালা চলেছে ইতিহাস জুড়ে। ওই বুদ্ধিহীন, কল্পনাহীন, অশিক্ষিত, লাউড, একেশ্বর পাঁচনই আমরা রইরই করে গিলছি ও উদ্গার তুলছি, আরও চাইছি কলাই-করা বাটি বাড়িয়ে। কিছু ব্যতিক্রমী চেষ্টা আছে। তাও কয়েকটার সামনে আতসকাচ ধরে দিলে কেঁচো খুঁড়তে তারকভস্কি বেরোবে না গ্যারান্টি কী? আর টেকনিক? ক্যামেরা, কৌশল, টানটান, ঝকঝকে, ঝিংচ্যাক উপস্থাপনা? কিচ্ছু না বলা ভাল। বাঙালির স্বভাব সম্পর্কে শুধু এটুকু মন্তব্যই যথেষ্ট যে সে এইচ বি ও, এ এক্স এন, জি ইংলিশ বেয়ে চ্যানেল পরিক্রমার শেষে থিতু হয় সেই

পুণ্যভূমিতে, যেখানে দু'জনের কথোপকথনের সময়ে দু'জনেই তাকিয়ে থাকে একই দিকে, অর্থাৎ ক্যামেরার দিকে। একজন আবার আমাদের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসে সুমহান শূন্যতার দিকে তাকিয়ে পেছনের লোকটার সঙ্গে কথা বলে যায়, আর পেছনের লোক কথা বলে সামনের লোকের পশ্চাদ্দেশের সঙ্গে। সুতরাং, হে বালকবৃন্দ এবং স্নেহের হিজিবিজ্‌বিজ্‌, কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই। উড়ালপুলে ভয়ের কিছু নেই।

তবে ফর্ম বা কনটেন্ট নয়, আদত ঝামেলা, অবশ্যই সেক্স। এই যে 'অপসংস্কৃতির আক্রমণ' বলে প্রাণপণ আপত্তি ও লাফালাফি চলছে, এত ত্রাসের কারণ একটাই। যৌনতা। অভিযোগ সোজাসাপ্টা। বিদেশিরা রটিয়ে দিচ্ছে যে যৌনতা জীবনের একটা স্বাভাবিক, অনিবার্য অঙ্গ এবং কোনও পাপ বা গা-ঘিনঘিনে জিনিস নয়। কী সাংঘাতিক! যেখানে আমরা চিরকাল সোৎসাহে 'কীরকম সিনেমা রে? কটা 'নোংরা সিন' আছে?' আর ফিল্ম ক্লাবের গ্রাম্ভারি সদস্যরা লাইনে দাঁড়িয়ে গলা নামিয়ে 'দাদা, জানেন না কি, 'কিছু' আছে?' জিজ্ঞেস করে এলেন, বাবা মা লেট নাইট ফিল্মের 'খারাপ' দৃশ্যের সময় ছেলেমেয়েকে ক্রমান্বয়ে চাদরচাপা দিতে লাগলেন, 'ভায়াগ্রা কী বাবা?' জিজ্ঞেস করলে স্মার্টলি উত্তর দিলেন 'নায়াগ্রার পাশের জলপ্রপাত', সেখানে ওই সব আজেবাজে ব্যাপারকে সহজ ও সুস্থ বলে চালিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত সত্যিই কদর্য ও সমাজবিরোধী।

অমানুষ বিদেশিরা অবশ্য এখানেই থেমে নেই। তারা জানিয়েছে যৌনতা নরনারীর সম্পর্কের অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, নেচে গেয়ে ফাটিয়ে দিয়ে প্রকটতম শারীর উচ্চারণে তারা বলেছে এটি জীবনের সবচেয়ে আনন্দদায়ক ব্যাপারের একটি, তাই 'আয় ভাই যৌনতা করি'। এ অবশ্যই অক্ষমণীয় ও সমূলে পরিত্যাজ্য। আমরা তো সর্বদাই নকশাল আন্দোলন, রবীন্দ্রসাহিত্য, আর্থসামাজিক সংকটে প্রেমের ভঙ্গুরতা, প্রাথমিকে ইংরিজির প্রচলন বা মুখ্যমন্ত্রীর এলাকায় ডাকাতি-র মতো ভাল ভাল জিনিস নিয়ে ভেবে চলেছি ও বিনোদন রটাচ্ছি। যে কোনও বাঙালি তামাতুলসী ছুঁয়ে বলতে পারে যৌনতার মতো নোংরা ও অকিঞ্চিৎকর বিষয় তার হৃদয়ে একবারের বেশি দু'বার উপবেশন করেনি। (বেঁটেখাটো শিশুসকলকে সযত্নে চৌকাঠে ডেলিভারি করে গেছে দায়িত্বশীল সারসপাখিগণ।) বিদেশিদের প্রচারে বাঙালি বিগড়েছে কি? কখনওই না। যদি বলেন ঋতুপর্ণ ঘোষের সিনেমায় চুম্বনদৃশ্য আছে, তা হলে উক্ত দৃশ্যের সময়ে দর্শকের মুখচোখকে আমি সাক্ষী মানব। 'ঠিক আছে ঠিক

আছে বুঝেছি তো, এতটা আবার কী দরকার ছিল' গোছের আড়ষ্ট উত্তেজনাভরা সেই বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি। কোনও সিনেমা বা সিরিয়াল কেউ দেখাতে পারবেন যেখানে স্বেচ্ছায় একাধিক যৌনসম্পর্কে লিপ্ত চরিত্রকে দর্শক ভাল চোখে দেখেছেন? 'পরমা' (বিশ্বায়নের আগে) বা 'দেখা' (বিশ্বায়নের সময়) দেখতে যতই ভিড় হোক, এদের মূল চরিত্র সম্পর্কে দর্শকের মতামত জানার জন্য খুব কান পাতার দরকার হয় না। বিশ্বায়ন আমাদের ক্যামেরা অ্যাঙ্গল বদলাতে পারল না আর যৌনতা সম্পর্কিত সংস্কার পাল্টে দেবে, এ ভাবনা বালখিল্যপনা।

অতএব সব কাউন্টে নট গিল্টি। গিল্টি হোক অথবা সোনা হোক, এ আমাদের সম্পদ, আমাদের স্বকীয়তা। সিংহদরজার ফুটো দিয়ে আড়েধারে দেখেছি তার ঝলমলে ভল্ল, শিরস্ত্রাণ; কিন্তু পরিখা পেরিয়ে আগন্তুক ঢুকে আসবে অন্দরে? নৈব নৈব চ। তাই বিশ্বায়নের ঝাঁ-চকচকে ভাইরাসে আমাদের কোনও হেলদোল নেই, মস্তিষ্কের আলস্য, হৃদয়ের আবদ্ধতাই আমাদের টিকা, জয়টীকাও বলা যায়। নতুনকে সপাটে প্রত্যাখ্যান, গড্ডলিকাপ্রেমই আমাদের বাঙালিয়ানার বিমা। আমাদের বিশ্বায়নে শামিল হওয়া অনেকটা মেলা দেখতে যাওয়ার মতো। সাময়িক নাগরদোলায় মাথা ঘুরবে, মশলাপাঁপড় খেয়ে বুক জ্বলবে, দু-একটা ফঙ্গবেনে পুতুল শোকেস-বন্দি হবে বেশ কিছু দিন, কিন্তু ওই অবধিই। যদি ভাবো বউ হারিয়ে আসব মেলার ভিড়ে, তা হলে ভাই বাড়াবাড়ি কমেডি করছ। আঁচলে আর ধুতির খুঁটে অনপনেয় গেরো দিয়ে রেখেছিলাম যে!

ক্রোড়পত্র 'বিনোদন', ১৭ অক্টোবর ২০০১

অই লইয়া থাক

প্রথমে ঝটপট সরল সমীকরণগুলো। পুরনো পুজো কাকে বলে? মা দুগ্গার টানাটানা কান অবধি চোখ, একচালায় ঠাসাঠাসি গাদাগাদি চার ভাইবোন, সবুজ রঙের বেঁটে বদখত অসুর। নতুন পুজো কাকে বলে? ধাঁ চকচকে আলোবিলাস, বোমকে দেওয়া প্যান্ডেল, ঐশ্বর্য রাই-দুর্গা, সলমন খান-অসুর, কোথাও অসুর বলতে নিদেন ওসামা বিন লাদেন। পুরনো পুজো ভাল কেন? কারণ তা পানসে ও প্যাঁচামুখো, অর্থাৎ গ্রাম্ভারি ও ঐতিহ্যবাহী। নতুন পুজো খারাপ কেন? কারণ তাতে দেদার মজা। এই হল গে ফাজিল সামারি। এবার, সিরিয়াস ঘ্যানঘ্যান।

'মেরে পাস পয়সা নেহি হ্যায়, লেকিন মেরে পাস সচ্চাই হ্যায়!' বড়লোক (সুতরাং কুটিল) ভিলেন সপাট ধরাশায়ী। দার্শনিক লেভেলে জিতে গরিব হিরো বেরিয়ে যাচ্ছে। পেছনে পড়ে রইল ময়ূরপঙ্খী ডায়লগের গুঁড়ো। ভরপেট হাততালি। শিস। মাসিমার অশ্রু। স্বাভাবিক। বেচারার কিচ্ছুই নেই। এর পর যদি 'সততা'-র মতো এক অধরা বায়বীয় বস্তুর দোহাই না পাড়া যায়, তো ব্যাটা আয়নার সামনে দাঁড়াবে ক্যামনে? আমজনতা গরিবগুর্বো। তারা লাফিয়ে উঠে চাখবে এই ঝাড়াঝাপটা সমীকরণ: আমার একেবারে কিচ্ছুটি নেই, এ তো আর মেনে নেওয়া যায় না, তা হলে নিশ্চয়ই মহৎ ঝাপসা কিছু একটা আছে, যা মারকাটারি ও প্রকৃত ফাটাফাটি। এই তত্ত্বানুযায়ী আর কয়েক স্টেপ এগোলেই বোঝা যাবে কেন কলকাতার 'প্রাণ' আছে। ফুটপাথ নেই, জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা নেই, শৃঙ্খলা নেই, নিরাপত্তা নেই, নারকীয় ট্রাফিক জ্যাম, পাশবিক ভিড়, অনর্থক মিছিল, অনিশ্চিত উড়ালপুল, ভদ্রসমাজের অযোগ্য শহর। সুতরাং 'প্রাণ' না থেকে উপায় কী? 'প্রাণ' সি পি এম-ও দেখাতে পারে না, তৃণমূলও দেখতে পায় না। অতএব 'মেরে পাস ছ'পার্সেন্টের বেশি রাস্তা নেহি হ্যায় লেকিন, হুঁ হুঁ বাবা, 'প্রাণ' হ্যায়।' আসলে এই আবছা অ্যাবস্ট্রাক্ট

নাউন আর ধোঁয়াটে যুক্তিপরম্পরার সৃষ্টিই হয়েছে অজ্ঞ ও দেউলিয়া ডায়লগবাজির জন্য। এই ছাঁদেরই আর একটি জ্বলজ্বলে ফাঁদ: 'আগেকার পুজোয় আড়ম্বর ছিল না বটে, কিন্তু 'আন্তরিকতা' ছিল।'

এই থলথলে নাইভ চিন্তাপ্রক্রিয়াটি এবার ছাড়তে হচ্ছে বস। 'অনাড়ম্বর' মানেই 'আন্তরিক' নয়, 'দৈন্য' আর 'মহত্ত্ব' এক নয়, গ্রামের লোক মাত্রেই সরল নয়, ভিখিরি হলেই কেউ চরিত্রবান হয় না, 'সর্বহারা' আর 'ধোয়া তুলসীপাতা' সমার্থক নয়। জ্যালজ্যালে বাংলা ছবি আর গ্রুপ থিয়েটারের শুভ্রতা ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠুন। 'আগেকার' মানেই পবিত্র, ধূপধুনোর গন্ধওলা, তুলসীমঞ্চ টাইপ, এদিকে পূর্ণকুম্ভ সেদিকে লালপাড় গরদ, উদাত্ত পারফেক্ট সংস্কৃত, আর টিমটিমে পঞ্চপ্রদীপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে ঢলোঢলো সন্ধ্যা রায়ের মুখ—এমত সিনারি নাও হতে পারে। ফ্রেমের ওদিকটা একটু মুন্ডু বাড়িয়ে দেখুন: ইলেকট্রিসিটি নেই, নাকের নথ খাবলে ছিঁড়ে পালিয়ে যাচ্ছে চোর-ছ্যাঁচোড়, বেনের মথাঘষার দোকানে বিশাল আড়াইপ্যাঁচ লাইন, এই শুরু হয়ে গেল ঠেলাঠেলি, কোঁদল আর তেড়ে খিস্তি, দোকান উপচে রাস্তার ধারে বসে গেছে সিঁদুর চুপড়ি মোমবাতি পিঁড়ে কুশাসন, বাইয়ের দালাল যাত্রার অধিকারী আর গাইয়ে ভিখিরিরা চেঁচিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিচ্ছে, বাবুদের বাড়ির চোগাচাপকান লড়ানো দারোয়ানরা বাউন্ডুলেদের কোঁৎকা মারছে আর ফেরেব্বাজদের স্যালুট, শামিয়ানার নীচে থেকে থেকে দপদপাচ্ছে নেশাখোরদের হাসির হর্‌রা আর আড়খ্যামটার গর্‌রা, সঙ্গত করছে রাস্তার খেঁকুরে কুকুরবাহিনী, এদিকে মেঘ-টেঘ ঘনিয়ে ভ্যাপসা গরম ছড়িয়ে ম্যালেরিয়াসমৃদ্ধ জনপদে টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হল। হেনকালে 'ব্যোমকালী কলকাত্তায়ালি' হুপুই তুলে গুড়ুম করে তোপ পড়ে গেল সমারোহে।

আসলে এ প্রাচীন রোগ, নস্টালজিক ছিঁচকাদুনি: ফ্ল্যাশব্যাক মানেই শুধু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট লাবণ্য, খানাখন্দের দিকে আমাদের চোখ পড়ে না। অথচ বর্তমানের দিকে এমন তিরছি নজর, নিজে প্যান্টালুন্‌স ওয়েস্টসাইডে ঘুরে ফাটিয়ে দিচ্ছি, দুহাতে শপিং ব্যাগ আর সস-গড়ানো কশকশে কাবাব-রোল, এদিকে রাস্তায় ভিড় দেখলেই 'শালার পাবলিক বেরিয়ে পড়েচে দেকেচো!'

গুরুদেব তো বলেই গেছেন, 'সে সময়েও তখনকার-সেকালের লোক তখনকার-একালের লোকের ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধিক করিয়া তামাক টানিত!'

এত ভাষা না খেলিয়ে এবার সরল কথা বলি। ধুতির পদলে পরব জিন্‌স,

চিঠির বদলে পাঠাব ই-মেল, উপন্যাসের জায়গা বেবাক দখল করে নেবে তুখোড় মেগাসিরিয়াল, এ টি এম যন্ত্র থেকে সরসর করে আপনে আপ বেরিয়ে আসবে কড়কড়ে নোট, আর পুজোর বেলায় চাই সিপিয়া টোনের ব্রুহাম-ফিটন কলকেতা? পুজোয় স্পেশাল ঘোড়াটানা ট্রাম আর সারা রাত ঠাকুর দেখার পাঁচবেহারা পালকি (চারজন বাহক, একজন রিজার্ভ) শহরময় টইটই করে বেড়ালেই কি চরিত্র উল্টে যেত? সত্যিই কি আপনার মনে হয়, মানুষ দিব্যি ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছিল পবিত্র ও অযৌন, কদিন আগে দড়াম করে তার হৃদয়ে উপবেশন করেছে ভোগলিপ্সা আর বাণিজ্যপ্রবণতা?

ধরুন, ১৮৭০ সালের কুকুর আর এখনকার কুকুরদের মধ্যে কি কোনও চরিত্রগত তফাত হয়েছে? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু মডার্ন কুকুর ডাইনে-বাঁয়ে দেখে অফিস টাইমের পার্ক স্ট্রিট পেরোতে শিখে গেছে। মানুষের বেলাতেও কাঠামোটা একই। আগে হরতুকি খেত, এখন জেলুসিল চোষে। যুগ বদলেছে, হুজুগ কিচ্ছু বদলায়নি। হুজুগের উপকরণ বেড়েছে, মিডিয়ার দৌলতে তার পরিচিতি ও তাই নিয়ে হইচই বেড়েছে। বেড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ, গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, তেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ভেঁপু বাজিয়ে চান করতে যাওয়া যাঁদের ট্রেডমার্ক, তাঁদের আয়োজিত পুজোর উত্তাল বাঁদরামো আর বেধড়ক বেলেল্লাপনার সঙ্গে আমরা এঁটে উঠতে পারব বলে মনে হয়? এককালে চৌরঙ্গি ফাঁকা ছিল, বালিগঞ্জে বাঘ বেরোত। ওইটুকু জেনেই আপনি রোম্যান্টিক হয়ে পড়লেন। শান্তিপুরে তখনই যে পাঁচ লাখ টাকার পুজো হত, ষাট হাত উঁচু প্রতিমা হত, ভাসানের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জন দিতে হল, তাই নিয়ে গুপ্তিপাড়ায় আবার 'মা-র অপঘাত মৃত্যু হয়েছে রে!' বলে গণেশের গলায় কাছা বেঁধে আর এক বারোইয়ারি মোচ্ছব লাগিয়ে দেওয়া হল, সে খবর আমরা রাখি? আরে মশাই, পুজোর সময়ে শুধু ডুরে শান্তিপুরি উড়ুনি আর ধূপছায়া চেলি, 'অ্যালবার্ট' ছাঁট আর 'ফিরিঙ্গি খোঁপা'র কেতা নয়, রোজ রোজ ফাংশন হত। বম্বে থেকে নৃত্যপটীয়সী কাঁচুলি পরা মিস অমুক আসতেন না বটে, কিন্তু খ্যামটা চলত সারা রাত, অনেক সময়েই খ্যামটাওয়ালিদের পরনে উক্ত বস্ত্রটিও থাকত না। প্যালা পেতে গেলে 'কিস' দিতে হত। কবিগান, কেত্তন, বাইনাচ, খ্যামটা, খেউড়, হাফ-আখড়াই প্রতিদিন রাতভোর অবধি টুবুটুবু রসে আসর মাত করে রাখত। সে সব গানের বয়ান শুনলে 'বাবারে-ক্যাবারে' বলে সেই যে কানে আঙুল দিয়ে দৌড় দেবেন, আর ভুলেও জীবনমুখীকে গাল দেবেন না।

নেশাভাঙ-এর ফিরিস্তি শুনলে এখনকার ড্রাগখোর জেনারেশনকে মুহুর্মুহু চুমু খাবেন। একবার ধোপাপাড়া আর চকের দলের গানের লড়াই-এর অনুপান হিসেবে ছিল দেড় মণ গাঁজা, দুই মণ চরস, বড় বড় সাত গামলা দুধ, বারোখানা বেনের দোকান ঝেঁটিয়ে ছোট বড় মাঝারি এলাচ, কর্পূর, দারুচিনি, সঙ্গে মিঠে, কড়া, ভ্যালসা, অম্বুরি ও ইরানি তামাকের গোবর্ধন পাহাড়। এ ছাড়া ঠাটবাট? গা-জোয়ারি দেখানেপনা? স্রেফ কলাবউ চান করাতে গিয়ে রানি রাসমণি এমন ঢাক ঢোল পেটালেন যে সাহেবের কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় রানির পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হল। জবাবে রানি দ্বিগুণ ঢোল-সহরৎ নিয়ে বেরোলেন। আহিরিটোলার রাধামাধববাবুর পুজোয় তিনটে মোষ একশো ভেড়া ও তিনশো পাঁঠা বলি দেওয়া হত, কুমারটুলির অভয়চরণ মিত্রের বাড়িতে মহাষ্টমীর মহানৈবেদ্যের চূড়ায় যে মণ্ডাটি বসানো হত, তার ওজন দশ-বারো সেরের কম নয়, পুজো প্রায়ই দশমীতে শেষ হত না। সাত-আট দিন প্রতিমা রাখার পর চার দল ইংরিজি বাজনা, নিশেন-ধরা ফিরিঙ্গি, খানপঞ্চাশেক ঢাক, আশ-সোটা-ঘড়ি নিয়ে পাড়া জাগিয়ে ভাসান দিতে যাওয়া হত। কেউ কেউ নৌকোর ওপর প্রতিমা নিয়ে বাইচ খেলিয়ে বেড়াতেন! আমুদে ছোঁড়ারা নৌকোর ওপর ঢোলের সঙ্গতে তুমুল নেত্য জুড়ত।

খুব চেনা লাগছে না? কয়েকটা হাল আমলের 'সমিতি-সঙ্ঘ' বসিয়ে দিলেই বর্ণনাটা প্রায় আপনার-আমার পাড়া ঘেঁষে যাবে না? আসলে ব্যাপার সেটাই। চাড্ডি কম্পিউটার বসেছে, আটপৌরে শাড়ি পরার ধরনকে দেবদাস-স্টাইল বলা হচ্ছে। গুজবে কান দিবেন না, পৃথিবী পাল্টায়নি।

না না, পাল্টেছে। ভণ্ডামি কমেছে, ঢাক ঢাক গুড়গুড় কমেছে। দুর্গাপুজোকে ধর্মকর্মের নাড়ি ছিঁড়ে সৎ ও সরাসরি ভাবে অবাধ সামাজিক হুল্লোড়ের মেলায় মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তুমি আসলে চাও অখণ্ড পিকনিক আর মাথায় বেঁধেছ জ্যোতির গোল থালা, এই 'পেটে খিদে মুখে লাজ' সিনড্রোমটিকে নড়া ধরে পগার পার করে দেওয়া গেছে। এখন 'পেটে খিদে মুখে খিদে, কই ব্যাটা কী দিবি দে!' পুজো মানে মহৎ হুলুস্থুল: ডিসকাউন্টে দারুণ জামাকাপড়, তকতকে রঙিন সাহিত্যপত্রিকা, নতুন গান, দেশবিদেশ বেড়ানোর ছুটি, আলোয় আলোময় রাস্তাঘাট, দেদার রগরগে খাওয়া, প্রেমের মানুষের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে ঠাকুর দেখা, কচিকাঁচাদের অনেক রাত্তির অবধি স্বাধীনতা, সোজা কথায় যথাসাধ্য আহ্লাদ চেটেপুটে নেওয়া। একেই সংস্কৃতে বলে 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি...' (বঙ্গানুবাদ: আমায় যেন

সেজেগুজে হেব্বি দেখায়, যেন যাকে চাই তাকে তুলতে পারি, পাড়াময় ধুনুচিদক্ষতার সুখ্যাতি হোক)। এতদিনে পুজো আর্ট। প্যান্ডেল-প্রতিমা-আলো মিলে একটা গোটা শিল্প প্রদর্শনী। প্রাইজ পেতে গেলে অন্য পুজোর চেয়ে আমাকে আলাদা করতেই হবে, তাই অনিবার্য ইনোভেশন। ফলে প্রতিটা পুজোই এক-একটা চমক, আলোকসজ্জার অভিনব থিম, প্যান্ডেলের আশ্চর্য জাঁক, প্রতিমার চোখধাঁধানো মেটামরফোসিস। এক একটা পাড়া যেন এক একটা বাহান্ন পর্বের সিরিয়াল। একই স্টার, আনকোরা গল্প। আর তুচ্ছ ভাঁড় দিয়ে যিনি আপাদমস্তক মণ্ডপ গড়তে পারেন, তাঁর সাধনা যে কোনও ফরাসি ইনস্টলেশন শিল্পীর চেয়ে কম কীসে? নেহাত 'ভাঁড়'-এর ইংরিজি জানা নেই বলে পোস্টমডার্নরা তাঁকে নিয়ে প্রবন্ধ লিখলেন না, নইলে 'ইন্টারভেনশন'-এর বৃন্দাবন দেখিয়ে দিতেন।

আসলে যেসব চৈতনফক্কাগণ নিরানন্দের মধ্যে গ্ল্যামার খুঁজে পান আর মজা মাত্রেই অশালীনতা মাপেন, তাঁরা এই নব্য ন্যায় বুঝবেন না। এখন দুর্গাপুজো শুধু দুর্গার পুজো নয়, রূপসী পেট্রন লক্ষ্মীর পুজো, পূর্ণযৌবনা শিল্পী সরস্বতীর পুজো, কুল ক্যাসানোভা কার্তিকের পুজো, পেটুক কিন্তু বুদ্ধিমান গণেশের পুজো, বাইসেপ ফুলে-ওঠা মাংসাশী সিংহের পুজো। এমনকী অসুরের পুজো। ('সাব-অলটার্ন' শব্দটা এখনও শোনেননি বুঝি?) শুধু সুর, শুধু সিমেট্রি দিয়ে শিল্প তৈরির ধারণা সেকেলে। অসঙ্গতকে, বেখাপ্পাকে যিনি আত্মসাৎ করতে পারেন তিনিই পিকাসো। তাই আমাদের সমগ্রের আরাধনা, অমনিবাস-পুজো। সুর, বেসুর, সুরা, সুরৎ, সুড়সুড়ি সকলকেই মেলাবে, ফেলবে না কাউকেই, জগতের আনন্দঘণ্টে মিশে যাবে সব আনাজ, পয়েন্ট কাউন্টারপয়েন্টের বুনোনে সিম্ফনি পোঁ পোঁ দৌড়বে ক্রেসেন্ডোর দিকে। এবং এটা ঘটবে ঘোষিতভাবে। অপরাধবোধ ছাড়া। 'মাসিমা মালপো খামু' আর নয়। 'মাসিমা পথ ছাড়ুন, সুচিত্রা স্যান-রে দেখুম।' অঞ্জলি দিই না। প্রণাম করি না। প্রেম করি। মোগলাই খাই। আমারও পুজো। আগে রাজারাজড়া পয়সা দিতেন, এখন স্পনসররা দিচ্ছেন। তাতে তো কিচ্ছু অশুচি হয় না। আখের ছিবড়ে দিয়ে মণ্ডপ হচ্ছে। ক্ষতি কী? বাঁশ দিয়ে মণ্ডপ হয়। বাঁশ একরকমের ঘাস। আখও একরকমের ঘাস। অব্রাহ্মণ কেউই নয়, যদি সত্যকুলজাত হয়। তাই চণ্ডীপাঠও চলবে। র‍্যাপও। অভিজাত দিলীপকুমার থাকবেন। উড়নতুবড়ি শাম্মি কপূরও। সব স্ব স্ব মহিমায় এবং নিজস্ব পুলকে। কবি-লোফার -বাবু-শোফার সবাই অলীক হ্যালোজেনসম্পাতে সমান মায়াবী, গা-ময় অভ্রের

চিকচিক, আলুথালু হাসি, প্যান্টের ছ'পকেটের দু'পকেট সাফ। অতএব, এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন। তুমি আলোর বেণু বাজাও। আমি সিটি দিই।

আর এততেও যদি পেত্যয় না যাও, চিড়ে না সিক্ত হয়, তা হলে হে পৈতেবান, তোমার জন্য রইল সেই চিরপুরাতন চুটকি। সুমহান দিওয়ারের সামনে দুই বাঙাল ভ্রাতার কথোপকথন:

লম্বা ভাই: আমার কাসে (কাছে) বাড়ি আসে (আছে), গাড়ি আসে, শাড়ি আসে, নারী আসে, এমনকী ফ্রেঞ্চকাট দাড়িও আসে। তর কাসে কী আসে?

বেঁটে ভাই: আমার কাসে মা আসে।

লম্বা ভাই: হ, অই লইয়া থাক।

পুজো ব্রডশিট 'হালচিত্র', ১২ অক্টোবর ২০০২

ছোট আছো ছোট থাকো

আমরা, যারা ছোটবেলায় ভাবতাম মহাত্মা গাঁধী ইন্দিরা গাঁধীর বাবা, তারা প্রজাতন্ত্রের মানেই জানি না। স্বাধীনতা দিবস তো আছেই, তা হলে আবার এই ছাব্বিশ তারিখটা কী ও কেন, এ নিয়ে ইস্কুলে টিফিন টাইমে বিস্তর গুলতানি। কেউ বলে এদিন ভারতের ফ্ল্যাগ ডিজাইন হয়েছিল, কেউ বলে সংবিধানের গাবদা সংস্করণ রেডি হয়েছিল। আমাদের ইতিহাসচেতনা বলে, এই বচ্ছরকার দিনে সকাল সকাল উঠে পাঁঠা কিনে আনো, দেরি হলে রাং পাবে না। কিছু মানুষ এদিন আবার পিকনিকে গিয়ে দেশের কথাও বলেন।

কেউ কেউ বাঁধানো দাঁত সামলে, ফুসফুস ভর্তি ইতিবাচকতা টেনে, 'অয়ি যুবসমাজ এবে ঘাড়ে লও হে জয়পতাকা এবং ড্যাঙডেঙিয়ে এগিয়ে চলো প্রগতির দিকে' গোছের বাণী বিতরণ করেন। হে পিতামহ, সে গুড়ে পরিপূর্ণ বালি। আসলে ভাবসম্প্রসারণ-সমৃদ্ধ কৈশোরে হৃদয়ে যে র‍্যাপিড-রিডার গেঁথে গেছে, আমরা তার আওতার বাইরে যেতে পারি না। তাই 'দেশ' বললেই 'সুজলাং সুফলাং', 'ভবিষ্যৎ' বললেই 'সূর্যোদয়', 'আইভ্যান' বললেই 'হো', আর 'যুবসমাজ' বললেই 'মুখে হাসি বুকে পেশি কথা কম কাজ বেশি' মুষ্টিবদ্ধ বিপ্লবমুখী স্ট্যাচু। যুবক-যুবতী মাত্রেই নাকি একগুচ্ছ শুভমানুষ, শিক্ষায় অক্সিজেনে ভরপুর, যারা নিয়ম করে পুরাতনকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে নূতনের আবাহন করছে। আরে বাবা, আমাদের যুবসমাজ মূলত দু'প্রকার। এক, যারা ফি রাত্তির কোঁত করে অ্যান্টাসিড গিলছে; দুই, যারা সকালে উঠেই এস এম এস-এ অশালীন রসিকতা দিকে দিগন্তরে পাঠাতে ব্যস্ত। প্রথম দল অবসন্ন, দ্বিতীয় গোষ্ঠী অকর্মণ্য। হয় পতাকা বহিবার শকতি নেই, নয় পতাকার প্রতি ভকতি নেই, অতএব বস্তাপচা সংজ্ঞায় মাথা ঠুকে রকতারকতি করে কাজ কী? চাদ্দিকে চক্ষু মেলে তাকানো ভাল।

বেড়াল দেখলেই ব্রেক কষবে, পুলিশ দেখলেই পালাবে, আর গুরুজন দেখলেই প্রণাম করবে। খনার বচন। শেষোক্ত দেখাদেখিটার দিকে নজর দেওয়া যাক। গুরুজনদের এই হোলসেল শ্রদ্ধাটা কেন প্রাপ্য? তাঁদের কীর্তিটা কী? স্রেফ এই যে, তাঁরা আমাদের আগে জন্মে গেছেন। তাতে কি বিরাট কোনও বাহাদুরি আছে? উক্ত কাণ্ডটির পিছনে কি তাঁদের প্রবল প্রতিভা ব্যয় করতে হয়েছে? ১৭৮০-তে জন্মালেই ১৭৮১-র মাথায় চাঁটি মারার যোগ্যতা জন্মায়, এই সূত্র মানলে তো রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়স্ক পকেটমারকে রবীন্দ্রনাথের হুমড়ি খেয়ে প্রণাম করা উচিত। এই অসার প্রথাটি কিন্তু খামখা চালু হয়নি। এই নির্বিচারে প্রশ্নহীন মান্য করা আসলে মেনে নেওয়া, মানিয়ে চলার সূচক। শিরদাঁড়া নুইয়ে এই প্রণতি শুধু বুড়োদের প্রতি নয়, বুড়োমির প্রতি; যা চলেছে, যা চলে এসেছে, তার প্রতি; তা-ই চালিয়ে যাওয়ার যে নিঃশব্দ অঙ্গীকার ও প্রশ্রয় বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়াচ্ছে, তার প্রতি। আমাদের ছেলে-ছোকরারা বুড়োদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, ইয়ার্কি দেয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু বুড়োরা যৌবনের উপর যে প্রতিশোধ নিয়েছেন, তা ভয়ঙ্কর। তাঁরা পরতে পরতে জাল বিছিয়ে যৌবনকে জরাগ্রস্ত করে দিয়েছেন।

তারুণ্যের ধর্ম কী? স্পর্ধা, ঔদ্ধত্য, রেয়াত না করে ভেঙে লোপাট করে দেওয়া। এর সরল মানে অসৌজন্য নয়, রাস্তায় চলতে চলতে পিছন-পকেট থেকে 'নিপ' বের করে চুমুক দেওয়া নয়, যুবভারতী গিয়ে চেয়ার ভাঙা নয়। এর মানে শিক্ষা ও যুক্তির সাহায্যে প্রথাকে, রীতিকে, দস্তুরকে অনবরত প্রশ্ন করা ও প্রয়োজনে তেড়েফুঁড়ে সেগুলি চুরমার করে দেওয়া। কিন্তু তা করতে গেলে দায় নিজের ঘাড়ে নেওয়ার ধক চাই, চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার সাহস চাই, কেন ভাঙছি ও নতুন কী গড়ব সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা চাই। সবাই নাইটক্লাবে যাচ্ছে বলে আমিও যাব, এই ভিত্তিতে যে আপাত-বিদ্রোহ, তা গড্ডলিকাপ্রবাহেরই ল্যাজের দিকটা, নতুন ভেড়ায় পুরনো উল।

বুড়োমি মানে কী? স্থিতাবস্থা ভেঙে দিতে ভয়, কোনও ঝুঁকি নিতে ভয়, পুনরাবৃত্তি ও প্রশ্নহীনতার স্বস্তির আচ্ছাদন সরে যাওয়ার ভয়, একলা চলার ভয়। এই ভয়ের কত রকম প্যাটার্ন যে ছোট থেকে আমাদের সত্তায় বুনে দেওয়া হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কখনও আগ বাড়িয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে না, মিছিলে যাবে না, গেলেও মাঝামাঝি থাকবে, যাতে পুলিশ সামনের

বা পিছনের দিকে লাঠি চার্জ করলে তোমার ঘাড়ে না পড়ে, লোফাররা আওয়াজ দিলে বুকের কাছে বইগুলো আড়াল করে মাথা নিচু রেখে মোড় পেরিয়ে যাবে, বস অপমান করলে হাসিমুখে সয়ে যাবে, রাস্তায় পড়ে থাকা অ্যাক্সিডেন্টে মৃতপ্রায় মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে না, বাপি সেনের সাহসিকতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে খবরের কাগজে চিঠি লিখবে কিন্তু নিজের ছেলেকে বোঝাবে হঠকারিতা করতে গেলে মাথায় বিয়ারের বোতল খেতে হয়, নিজের মেয়েকে বলবে, তোমার চুল টানলে আবার দাঁড়িয়ে থেকো না সাক্ষীগোপাল হয়ে!

তা বলে কি কখনও ন্যায় প্র্যাকটিস করবে না? চোরকে বেঁধে গণধোলাই চলছে দেখে জোর দু'ঘা কষিয়ে আসবে, পঞ্চায়েত যদি ডাইনিকে নগ্ন করে ঘোরায়, দৌড়ে দেখতে যাবে, মন্ত্রীর গাড়ির পোঁ শুনলেই বাসে বসে শাসকদলকে খুব গালাগাল দেবে। ভীষণ ভালবেসে যে ভয় ও ভণ্ডামির মশারি মা-বাবা আমাদের চারিধারে টাঙিয়ে চমৎকার গুঁজে দিয়েছেন, সে খুঁটি সারা জীবনে উপড়ে ফেলা যাবে কি না সন্দেহ।

এর একটি যমজ লিস্টি আছে। সেখানে অন্যায় রুখতে গিয়ে মার খেয়ে বাড়ি ফেরার ভয় নয়, ভিড়ের মধ্যে আলাদা হওয়ার ভয়। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ খোঁচা নিকনেম সওয়ার ভয়, কৈশোরে কাফকা-কমলকুমার জেনে যাওয়ার ভয়, সচিন তেন্ডুলকরকে পাত্তা না দেওয়ার ভয়। এমনিতেই শিক্ষা ও মৌলিক চিন্তার প্রতি একটা ঘৃণার তরঙ্গ আমাদের সমাজে নিয়ত বহমান। স্বতন্ত্র ও সাহসী ভাবনার গন্ধ পেলেই হিংস্র ভাবে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া ও ঠুকরে মারা আমাদের প্রচলিত স্পোর্টস। 'আমরা বাবা খুব সাধারণ!' ঘোষণান্তে এমন তীব্র দর্পের সঙ্গে বক্তা তাকান যে, অসাধারণ হওয়ার কল্পনাতেও হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে যায়। বাপ আমার, আর যা-ই করো, পরম্পরাকে চ্যালেঞ্জ কোরো না, ভিড়ের আরাম ছেড়ে যেও না, জপো: 'আমি তোমাদেরই লোক, মোর নাম মোটামুটি খ্যাত হোক।' ছোট থেকে ছোট থাকতে শেখো, হবে বনসাই বলবে বটবৃক্ষ, তবে না হট্টমেলা!

এই মগজ ধোলাইয়ের গুঁতোয় আমাদের মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি, আমাদের ছেলেরা জ্ঞানবৃক্ষের পাত কুড়োতে না কুড়োতেই বুড়ো। বাইশ বছরের দেহে বাহাত্তর বছরের মন নিয়ে আমাদের জিন্‌স-চমকানো যুবকযুবতী ঘুরে

বেড়াচ্ছেন। এ কথা ঠিক, বাহ্যিক আস্তরণ ভয়াবহ ঝিংচ্যাক, সেখানে ঝংকার-বিট অনুযায়ী লাগাতার আলো জ্বলছে নিভছে। বিয়ের আগে চুম্বন চলছে, ফ্লার্ট করাকে আর্টের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কথায় কথায় গাঁজা খেলে আর বাড়ি ফাঁকা পেয়ে ব্লু ফিল্ম দেখলেই কালাপাহাড় হওয়া যায় না। মস্তির পর্দাটিকে ঝট করে সরিয়ে নিলেই পানাপুকুর স্পষ্ট প্রতীয়মান। এদের দিল আসলে চাহতা হ্যায় সনাতন সতীপনা, বয়সে বড় প্রেমিকাকে শেষ দৃশ্যে মরে যেতে হয়। ক্যান্টিনের অশালীন কাঠে থরে থরে রক্ষণশীলতা খোদাই করা। লিভ-টুগেদার অকল্পনীয়, সম্বন্ধ করে বিয়ে 'ইন থিং'। প্রাক্-বিবাহ যৌনতা ঠিক হ্যায়, কিন্তু মোনোগ্যামির মডেলটি শিরোধার্য। হলিউডি ছবি দেখে ইংরিজি চার-অক্ষরীর বন্যা বইয়ে দিচ্ছি, কিন্তু এ-সেকশনের যে মেয়েটি বহু পুরুষে অভ্যস্ত তার জন্য বরাদ্দ বাংলা খেউড়। কটাক্ষময়ী আড্ডার মূল আলোচ্য, তাকে বাগাতে পারলে তো বহুত সাবাস, তবে প্রণয়িনী হিসেবে চাই বি-সেকশনের নতমুখী লাজুক ললনাটিকে। যে এমন বই পড়ে যা আমি বুঝতে পারি না সে 'আঁতেল', যে মেয়ে সিগারেট খায় সে 'বাড়াবাড়ি ফেমিনিস্ট' (প্যান্ট পরলে শুধু ফেমিনিস্ট), যে গায়ক অনেকগুলো বিয়ে করেছেন তিনি 'মানুষই না', যে মেয়ে ছেলেদের পিঠ চাপড়ে সমান তালে ফক্কুড়ি চালাচ্ছে সে 'রোমিং টাইপ', যিনি সিরিয়াসলি রাজনীতি করেন তিনি 'ভুলভাল'।

তাই আমাদের যুবক সিনেমাকার করেন মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের পায়ে-ধরা ছবি, যুবক কবি হতে চান প্রতিষ্ঠিত প্রবীণের জেরক্স কপি, যুবতী সুপারস্টার বিয়ের পরেই কেরিয়ারে কুড়ুল মারেন, যুবক পুলিশ জানেন লোকাল কমিটি থেকে ফোন এলেই ধর্ষণকারীকে ছেড়ে দিতে হবে, যুবক ব্যবসায়ী ঘুষের সুটকেস হাতে সতত তৈরি। এক কালে যুবা প্রধানমন্ত্রী হাসিমুখে তরতরিয়ে সিঁড়ি ওঠার সময় এবং স্যাম পিত্রোদার মতো টেকনোক্র্যাটকে মূল পারিষদ নিয়োগ করায় আমরা ভেবেছিলাম একুশ শতক আবার আগেভাগে না এসে পড়ে। তারপর অবশ্য মাতাশ্রী এবং দাদুশ্রীর থোড় বড়ি চর্বণে তাঁর বিশেষ বিলম্ব হয়নি। আর হালফিলের উন্নততর দলের তরুণতর মুখ্যমন্ত্রী 'মুখেন মারিতং জগৎ'-এর যা ফর্মা দেখাচ্ছেন, মনে হয় না 'কেরানি ক্যাডার ভাই ভাই' চক্কর ভাঙা তাঁর সদিচ্ছায় কুলোবে। চতুর্দিকে শুধু সায় দেওয়া আর আনুগত্য আর বদ্ধাবস্থা বজায় রাখার আকণ্ঠ মজা।

দেশ গড়তে কী লাগে? বার্নার্ড শ বলছেন, 'দেশপ্রেম হচ্ছে সেই ধারণা, যা বলে—তোমার দেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ, স্রেফ তুমি সেখানে জন্মেছ বলেই!' দেশপ্রেম কাজে লাগে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আর সানি দেওলকে নিয়ে সিনেমা করার সময়। সকলে নিজের কাজটা দক্ষতার সঙ্গে ও সৎ ভাবে করে গেলেই দেশ আপনি গড়বে। সে কাণ্ড সোনার পাথরবাটি। আর দেশকে কোয়ান্টাম লিপ দেওয়ার জন্য, জগৎসভায় বাহারি আসন দেওয়ার জন্য চাই স্রোতের ঘাড় ধরে নদী উলটো দিকে বইয়ে দেওয়ার কলজে। সে জিনিস জন্মলগ্নেই ছ্যাঁদা করে দেওয়া হয়েছে। অতএব হে পুণ্যদিবসের লেকচারপ্রবণ দাদু, আমাদের চকচকে ত্বক আর হাঁপানিহীন দৌড় দেখে ভুলবেন না। আমরা সবাই বুড়ো। নইলে মোদের দেশের সনে মিলব কী শর্তে?

ব্রডশিট 'দেশের দশ', ২৬ জানুয়ারি ২০০৩

কলিকাতার বর্ণপরিচয়

কুকুরের পার্ক স্ট্রিট পেরনো দেখেছেন? ট্রাফিক সপ্তাহের এগালে ওগালে থাবা। প্রথমে ডান দিক দেখে তুরতুর ঠ্যাং বাগিয়ে স্প্রিন্ট, তারপর ডিভাইডারে উঠেই তীব্র স্পিকটি নট। আশেপাশের গুচ্ছ পা মাঝে মাঝে চান্স নিচ্ছে চুক্কি খাচ্ছে, কিন্তু সে প্রখর আইনি, সবুজ লাল হবে, তবে পিচে পড়বে সামনের পা। কলকেতা শহর বাবা, পশুপাখি দেখেই আক্কেল সিধে হয়ে যাবে, সাপখোপ অবধি বালিগঞ্জ স্টেশনের পেছনটায় নাকি ঠিকঠাক পয়সা পেলে টিফিনবাক্স থেকে উঠে জিভে ছোবল দেয়। অতএব, সমঝে খোঁটা দেবেন বস। শহর সোজা নয়। ফট করে চাড্ডি নোংরা রাস্তা দেখে চলতি নিন্দেপাঁচালি গাওনা লাগালেন, রাস্তায় গড়ানো ইউরিনস্রোত ডিঙি মেরে মেরে নাকে হ্যাঙ্কি চেপে পেরিয়ে ভাবলেন ইঃ ডার্টি মেসি ক্লামজি সিটি, ভেবে দেখুন দাদা, সিটি সেন্টারেও যাই, সিটিও মারি। ভাসানে নাচব তো চোখ বেহ্মাতালুতে, আবার অ্যাকাডেমিতে ডায়লগ দেব না, বুঝতে গিলতে একুশ তারিখ পেরিয়ে যাবে, ফ্লাইট মিস। না না ইউজুয়াল সংস্কৃতির অজুহাত দিচ্ছি না, আপনাদের ওপরচালাক লোকদেখানি গ্ল্যামারবাজি তুড়ি মেরে পারি, ভাঁড় ভেঙে

অ শহরে ফের একটা উড়াল পুল হবে শুনে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন

আ ফের একটা উড়াল পুল হবে শুনে শহরের লোক যা বলে চেঁচান

ই শহরের অধিকাংশ লোক যে টিভি দেখেন, কমার্স-এর আগে যা বসালে ব্যবসা জাতে ওঠে, আরশোলা দেখলে শহুরে মেয়েরা যা বলেন

ঈ দুটো আরশোলা দেখলে শহুরে মেয়েরা যা বলেন

ওয়েস্টসাইড-উডল্যান্ডস গিয়ে পাত্তি-ফতুর হয়ে ফনফনে চটি আর কটিতটের ধটি কিনে আনছি, এমন লাক, জুতোর সঙ্গে মুজো ফ্রি। সিরিয়াল করতে সিঙ্গাপুর যাত্রা, চায়ের দোকান খুলতে পূজা বাত্রা। 'ওগো শুনছ' থেকে 'হে লিস্‌ন না', ছাগলতাড়ানি বৃষ্টির হ্যাঁচ্চো থেকে অ্যাকোয়া-নির্ঝরের লীলায়িত ঝুপ্পুসে অন্যের এঁটো সুইমসুট, এ কলকাতার মধ্যে আছে আর একটা কলকাতার মধ্যে আছে...একেবারে জমজমে মেলার আজব খেলেনা বাক্সের ভেতর বাক্সের ভেতর বাক্স, শেষ ঢাকনিটি খুললে গুণমণির বীজ, পুঁতবে ছাইগাদায়, কিন্তু ফুল যখন হাঁকড়াবে, কী তার রং, কী খোশবো!

সহজ করে বলি, কলিকাতা নেই কলিকাতাতেই। ইহার এক পদ নিউ ইয়র্কে, এক পা সোমালিয়ায়। এক হাতে তার সানাই বাজে, ও-হাতে সাইরেন। হাজার বছর ধরে পথ হাঁটতে হবে না, গোড়ালির গাঁট ব্যথা করে সপাট মাইলখানেক দাবড়ালেই দেখা যাবে, হাজার বছর, হাজার সময়লক্ষণ, মৌর্য যুগ-চৌর্য যুগ, রেললাইনে প্রাতঃকৃত্য সারছে যুগ এবং রিংটোনে বাচ্চার কলকলানি লোড করছে যুগ—সব কে সব শান্তিপূর্ণ গেরস্থালি করছে গায়ে গা লাগিয়ে, ঘাড়ে গরমাগরম শ্বাস। সম্বচ্ছর অতিকায় রামধনু-মোচ্ছব: হরেক শেড: খয়েরি, কচি কলাপাতা, বাদলা অন্ধকারে ট্রামের শেড তো আছেই। হেই দেখছ সকালে কোট-প্যান্টালুন এসি চারচাক্কা, তো হুই সন্ধেয় বাড়িতে লুঙ্গি-খালি গা-মুড়িনঙ্কা। কলকাত্তাইয়া ভিখিরি তো, সট করে আঁখ মেরে বলতেও পারে, ডায়েটিং করছি।

অতএব, এ বান্দা একতারায় ফলবে না। সিম্ফনি লাগবে, ব্যান্ডপার্টি। এই গোটা ছেচল্লিশ ব্যঞ্জন থরে থরে সাজাতে আমরা, যাকে বলে, ও মা ও পিসি ও শিবুদা। কী অবিশ্বাস্য আমোদের সাড়ে বত্রিশ ভাজা! তার মধ্যে চিকচিক

উ লাগলে, ইংরিজি মিডিয়ামরা যা গিলে নিয়ে 'আউচ' বলেন

ঋ ট্যাশদের দেখলে ক্যাবলাদের গা যা দু'বার করে করে ওঠে

ঊ খুব লাগলে ইংরিজি মিডিয়ামরা যা বলেন

ঌ যাকে প্রশ্রয় দিলে লিখতে হত ক৯কাতা

করে উঠছে নতুনতম রূপ, বৃষ্টিবিন্দুর ওপর রোদ্দুরের বল্লমের মতো, গজাচ্ছে নতুন কলকাতা। নতুন তার হাঁকডাক, নতুন কলারতোলা গেঞ্জি, নয়া খড়খড়ে রুমালে নাক পুঁছছে। টিভির পর্দার তলাটা দখল করে রেলগাড়ির মতো চলেছে শেয়ারের দাম, সারা সন্ধে সাইবারকাফে গিয়ে সবেগে ই-প্রেম ও ই-প্রত্যাখ্যান, বাংলা ব্যান্ড গায়ক উদ্বোধন করে আসছে নয়া হোম-লোন স্কিম। এক ছাদের তলায় চার-পাঁচটা সিনেমা হল, ছ'তলা দোকান, পাশাপাশি র‍্যাকে পেঁপে আর উত্তমকুমার, সাহায্য করতে ইংরিজি বলা ধড়ফড়ে ইয়ুথ, বলে না দিলে বাথরুম খুঁজে বের করে কার সাধ্যি। জন্মদিনে নতুন গাড়ি পেয়ে ধক্কাস-ধক্কাস বাজনা চালিয়ে স্পিড ভেঙে টিউশনি ছুটছে ক্রু-কাট ছেলে। বেড়ালে রাস্তা কাটলে ঘ্যাঁচ করে থেমেও যাচ্ছে অবশ্য। জ্যান্ত নাগরদোলা, কলিকাতা যার নাম, যে তামাশা দেখবে তো খোঁকাখোঁকি দৌড়ে এসো, সঙ্গে আনো মাসিমেসো, চলকে যাবে জান, ওই শুন শুন হে তার নতুনের আহ্বান।

নতুন যে বিশ্বটি আপনার ইচ্ছে থাক না-থাক হু-হু ঝাঁপিয়ে পড়ছে আচমকা পশলার মতন, আসুন, বুঝে নিন তার রংরলিয়া। কোথায় আদতে পুরাতন আইসপাইস খেলছে, তা-ও। 'ইয়ে দোস্তি'র যেমন ঝলমলে/স্যাড, দুইই হয়, নতুনেরও হর কিসিম। করুন স্নান নব শাওয়ারজলে, কানে দিন নতুন সেলফোন, প্রথমটা টালমাটাল হলেও চড়তে শিখুন এসকালেটরে। তারপর তো আছেই চুলচেরা, এ কি আদৌ ভাল না মন্দ, অ্যাত্ত ডিওডোর‍্যান্ট, তবু জামায় কেন গন্ধ! অথবা, স্রেফ ও সিম্পলি, হারারারারা, নয়া বর্ণমালা, আজু কী আনন্দ!

ক্রোড়পত্র 'এখন কলকাতা', ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪

এ বাঙালির প্রিয়তম শব্দ। যে কোনও কিছুর পরিবর্তে বসে। যেমন, 'এই এ, এ-র ওপর এ-টা আছে, দে তো'।

ও ২৫ তারিখ প্রোপোজ হলে, ২৬ থেকে ক্যান্টিনে প্রেমিকের নামের বদলে যা বলতে হয়

ঐ 'কেমন আছ' জিজ্ঞাসা করলে কলকাতার লোকেরা যা উত্তর দেন

ঔ কলকাতার কুকুর কবিতা লিখলে যে মিল অবশ্যম্ভাবী ছিল

ওম শান্তি ওম

লেপ একটি গৃহপালিত পশু। সত্যি বলতে, সব পোষা সন্টুমনু-র মধ্যে সেরা হচ্ছে লেপ। তাকে খাওয়াতে হবে না, ঘোরাতে হবে না, ল্যাম্পপোস্টের ধারে ইয়ে করতে নিয়ে যেতে হবে না, কিন্তু কিচ্ছু না-র বিনিময়ে হামলে আদর যা করবে, ওঃ, মনে হবে, অন্তত রাত্তিরবেলায় যেন সারা বচ্ছর শীতকাল লেগে থাকে ঠাকুর। ঠান্ডা শিরশিরে ফুঁ-র মতো হাওয়া এল কি এল না, একটি বার খাট-বাক্সের আঁধার থেকে বের করে, বারান্দায় রোদ্দুর ডলে, যেই না রাত্তিরে গায়ে দিয়েছ, স্পষ্ট বুঝতে পারবে ওম কাহাকে বলে। কেন প্রাচীন মুনিঋষিরা সর্বক্ষণ ওই মন্তরটি জপে হাল্লাক হতেন। ওম-এর পরে যে মণিপদ্মে হুম হয়, মোটেই উচিত হয় না। বরং তনুপদ্মে চুম হতে পারত। কিংবা ইতিমধ্যে ঘুম।

লেপ হয় লাল রঙের। মানে, অন্য রং কেউ গায়ের জোরে করতেই পারেন, কিন্তু তাকে জাতে তোলা হবে না। তার ওপরে মা পরিয়ে দেবে সাদা রঙের ওয়াড়, আর পুঁটলি পাকিয়ে তাকে রেখে দেওয়া হবে খাটের পায়ের কাছটা। রোজ রাত্তিরে খাওয়ার পর কনকনে জলে হাতমুখ ধুয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে তাকে দেখলেই মালুম হবে, ঈশ্বর আছেন! মুখ দিয়ে একটা উৎকট উল্লাসের শব্দ করে এক টানে লেপটাকে চিৎ করে, তার মধ্যে সড়াৎ সেঁধিয়ে যেতে হবে। তারপর ঠান্ডা ঠান্ডা পায়ের আঙুল বোনের গায়ে ঠেকালে সে 'উউ, ভাল হচ্ছে না বলছি দাদা' বলে চেঁচাবে, আর বোনের ঠান্ডা আঙুল গায়ে ঠেকলে তাকে রামচিমটি দিতে হবে। হুটোপাটি প্রবল হলে, মা মারতে ছুটে এলে, দু'জনেই লেপের মধ্যে গোটাটা ঢুকে গিয়ে, বিছানায় সাঁতার, আইসপাইস। আমার পিঠ ভেবে মা যেটাকে মেরেছে, সেটা বোনের পিঠ! ডবল ক্যাঁওম্যাঁও!

লেপের মধ্যে মাথা অবধি ঢেকে শুয়ে থাকতে আমি পারি, বোনের দম আটকে আসে। মা-ও রেগে যায়, 'ও কী, মরার মতন!' আমি শুনি না। লেপে

ঢুকলেই মনে হয়, কী নিরাপদ তাঁবু! পৃথিবীর কোনও কিছুই আমার ক্ষতি করতে পারবে না আর। ভূতে দেখতে পাবে না, চোরে নিয়ে যেতে পারবে না, পরীক্ষার ভয় অবধি বাইরে অপেক্ষা করে করে ফিরে যাবে, খুঁজে পাবে না কিচ্ছুতে। স্বপ্নগুলোও কুচকুচে নিরুপদ্রব স্ক্রিন পেয়ে সবচেয়ে ঝলমল করে ফুটে উঠবে। এই রাতটুকু, আমার সঙ্গে, আমার মেলামেশার রাত শুধু। দুপুরবেলা লেপ গায়ে দিলেও মনে হবে, এক খণ্ড আরামভর্তি গোল রাতই বুঝি নামিয়ে নিলাম জবরদস্তি। অবশ্য বোন হেভি বদমাশ। ছুটির দিন দুপুরে আগে খাওয়া শেষ করে লেপ দখল করে শুয়ে থাকে। একেবারে স্কেল দিয়ে মেপে, ঠিক মাঝামাঝি। কিছুতে সরবে না। বাধ্য হয়ে পুরো লেপটাই হ্যাঁচকা মেরে টেনে নিতে হয়। তারপর ঝগড়ার শেষে উল্টোবাগে শুয়ে, এক বার ও জোরে লেপ টানবে আর আমার পেছনে ঠান্ডা ঠান্ডা লাগবে, এক বার উল্টো।

বিয়ের পর লেপের পদ পরিবর্তন হয়ে যাবে। পদবি পরিবর্তনও বলা যায়। তখন যদি বলো, লেপের মধ্যে বসে টর্চ ফেললে মনে হয় আমিই চাঁদের পাহাড়ের অভিযাত্রী, অন্য মানে দাঁড়াবে। লেপ তখন থরোথরো আড়াল, আর আশ্চর্য নিষিদ্ধ ডার্করুম খেলার বাহন। অবশ্য অচিরে এ ইন্দ্রজাল ভাঙবে। নিদ্রাকালে 'এ কী কনকনে লাগছে কেন' বিস্ময়ে চটকা ভেঙে মালুম হবে, এ স্যাঙাতটিও ঘুমের ঘোরে মহার্ঘ লেপটি টেনে নেয়। তখন নিশ্চিত গাঁট্টাটি হাতে চলে এলেও, তক্ষুনি সংবরণ করতে হবে। ছি! আমার না স্যাক্রিফাইস করা উচিত! এদিকে নিরঙ্কুশ জয়ের গন্ধ পেয়ে সে আরও খানিক লেপ টেনে নেবে, ঘুমের ঘোরে, অল্প অল্প ফিরতি টানতে গেলেই 'উঁউঁ' করে আপত্তি জানাবে, একমাত্র গোটাগুটি তাকেই বুকে টেনে নেওয়ার আদিখ্যেতা না দেখালে, এ রাতে আর দাঁতকপাটি ও ঠকঠকানি ছাড়া উপায় নেই। বিরাট ক্রাইসিস। সিজনের মতো, সম্পর্কেও, দিন যায় ও শৈত্য বাড়ে। কাঁপতে কাঁপতে আত্মত্যাগের চেয়ে হ্যাঁচকা টানে জয়লাভ অধিক লোভনীয় মনে হয়। 'টাগ অব লেপ'-এর চোটে শেষমেশ বাপ-মা'র দান-খয়রাতের অপ্রিয় প্রসঙ্গ। শাশুড়ির বুদ্ধি থাকলে যে দুটো সিঙ্গল লেপ দিতেন এতে আর আশ্চর্য কী? কিন্তু ও-পক্ষে আছে অশ্রুসজল মেলোড্রামা। 'মা তো আর ভাবেনি, আমরা সিঙ্গল সিঙ্গল হয়ে যাব এত তাড়াতাড়ি!' যাব্বাবা, এসব কথা উঠছে কোত্থেকে? কিছু কিছু জিনিসে আবার ভাগাভাগি হয় না কি? হর-পার্বতীরও টুথব্রাশ আলাদা ছিল, যদ্দূর সম্ভব।

এই জন্যেই শাস্ত্রে লিখেছে, আত্মসম্মান এবং লেপ কিছুর বিনিময়েই ছেড়ো না। বাস্তবিক, বিয়ের আগে পা পরে, লেপের ন্যায় ধারাবাহিক উঁচু মানের আদর আর কেউ দিল না। কক্ষনও হতাশ করবে না, এমন আর একটি জিনিস চার্লি চ্যাপলিন ছাড়া মহাবিশ্বে কিছু গজিয়েছে কি? লেপকে আদুড়ই করো, বা রংবেরং দিয়ে ঢেকে দাও, ভাঁজ করে পরিপাটি রাখো, আর হাড়ুলবাড়ুল নিংড়োও, তার হেলদোল নেই। শুধু তোমারই জন্য এ ধরাধামে এসেছে সে। কী নিঃশর্ত আলিঙ্গন, কী নিঃস্বার্থ সেবা! গরম লাগলে পায়ের কাছটায় ফেলে দাও, কিচ্ছু বলবে না, আবার যেই টেনে নেবে, 'ধন্য আমি বুকের পরে' বলে সহস্র মমতা শত প্রেম অযুত আশ্লেষ সহ, উঠে আসবে। তুমি চাইলে, নাক অবধি ঢাকবে, তুমি না-চাইলে গোড়ালি। পৃথিবীতে এরকম পলিটিকালি ইনকারেক্ট আনন্দ কয়েকটা আছে বলেই না এখনও বেঁচে থাকা সুখের!

ক্রোড়পত্র 'শীত পড়ল', ১৫ ডিসেম্বর ২০০৭

কলাবতী

যেখানে আ-হাওয়া আর শাঁ-হাওয়া ঢেউয়ের ঝুঁটিতে তপ্ত বিলি কেটে মেঘ শুঁকতে উড়ে যায়, সেই রূপসায়রের জলের ঠিক আধ ইঞ্চি ওপর থেকে আমরা যদি অত্যন্ত ধীরেসুস্থে অক্সিজেন ও আতসকাচ সমন্বিত এক ডুবুরি-কাম-গোয়েন্দা নামিয়ে দিই, সে সাগরবিছনায় নেমে দেখবে, নীল বালুতে অল্প গেঁথে গম্ভীর পেন্ডুলামের মতো অবিরাম দোল খাচ্ছে বিশাল ঢোল ও ডগর, ইতিউতি হাটের মুলিবাঁশ, ছেঁড়া সামিয়ানা, দোকানির আনমনা রুমাল। আরও এগিয়ে, যেখানে গেরস্থর ফেলে যাওয়া কানা বেড়ালের মতো জেগে আছে কলাবতীর আঁধার প্রাসাদ, তার তোরণ ভেঙে পড়েছে এক দিকে কাত, শুশুক খেয়ে গেছে স্ট্যাচুদের হাত, রাশি লাল-নীল টুকুন মাছ আর লতরপতর গাছ-আগাছ সরিয়ে 'ও কে যায়, কে যায়' সী-সী হী-হী বায়ুর মতো সময়ের শিস বুকের ভেতর হি-ম নিতে নিতে ডুবুরি ঢুকে যাচ্ছে, খোবরানো সিঁড়ি ঘুরে ওই উঠল দোতলায়, দ্যাখে, লাট খেয়ে নকশাজাফরিতে গুমরে আছে খাঁচা, হ্যাঁ, শুকের লাক্সারি-পিঞ্জরই বটে, কিন্তু পালক এখনও, গালচের মতো বিছিয়ে, ভেজা চুপচুপ, কিন্তু শুকনো পালকের মতোই তাদের ফোঁপানির দোষ। গোয়েন্দা আর কী করে, উঠবে পড়বে, আনমনা অভ্যাসে উঁকি মারবে কলাবতীর বিছনাঘর, তারপর দু'বার ঝাঁকি দেবে সুতোয়। আমরা 'ওই উঠেছে উঠেছে' হাঁকুপাঁকু গিয়ে দেখব, মাথাফাথা নেড়ে বেচারা বলছে, আতসকাচ ফেলে এলাম দাদা। বড্ড মায়া ওখানটায়। গুলিয়ে উঠছে কেমন। জোয়ান আছে?

দক্ষিণাবাবুর পদাবলিতে ম্যাডামের এন্ট্রি ফাটাফাটি। অন্দরমহলে হাঁফাতে হাঁফাতে দাসীর খবর: অ ম্যা, তোমরা একেনে বসে সিঁথিপাটি করচ

হ্যাকোনো! হুদিকে নদীর ঘাটলায়, খী বলব তোমাদের, হেই পেল্লায় শুকপক্ষী নৌকো, তার বৈঠেগুলো রুপোর, হালখানা আস্ত হিরের! নায়ের মধ্যে নাকি মেঘ-বরন চুল কুঁচ-বরন কন্যা বসে সোনার শুকের সঙ্গে কথা বলছে। আর কী, পাঁচ ভিলেন-রানি উঠি পড়ি আথিবিথি তীরে পৌঁছে দেখেন, যাঃ, এই জাস্ট তরী ছেড়ে দিয়েছে। রানিরা লোভ চেনেন, হাতে চোঙ পাকিয়ে চিৎকার, 'নিয়া যাও কন্যা মোতির ফুল।' নেবে না ঘণ্টা, রাজকন্যা উল্টে বললেন, 'মোতির ফুল মোতির ফুল সে বড় দূর, তোমার পুত্র পাঠাইয়ো কলাবতীর পুর। হাটের সওদা ঢোল-ডগরে, গাছের পাতে ফল। তিন বুড়ির রাজ্য ছেড়ে রাঙা নদীর জল।' প্রথম দু'লাইনে কায়দা করে নিজ-নাম ডিজক্লোজ, পরের দু'লাইন টোটাল হেঁয়ালি। সব হেঁয়ালির মতো, ওটাই কিন্তু, হুঁ হুঁ বাওয়া, আসল। ওতেই দেওয়া আছে পৌঁছঠিকানা, এবং, বুদ্ধিমানদের জন্য, সে রুটে কী কী ফাঁদ হাঁ করে আছে, তা-ও। এসব ক্লু বোকা রানিদের গামবাট রাজপুত্ররা বুঝবে ঘোড়ার ডিম, বুদ্ধু আর ভূতুম কিন্তু ক্যাচ করবে সটাসট। (হ্যাঁ, হাঁফ ছাড়লেন তো এতক্ষণে, আজ্ঞে, এটা 'ঠাকুরমার ঝুলি'র বুদ্ধু-ভূতুমের গল্প, সেই প্রিয় বাঁদর আর পেঁচা)।

এবার, ওপরের ছোট্ট ঘটনাটি খোঁচাতে আমাদের বুদ্ধির শলাকাগুলো বের করি চলুন। একটা লোক ঘটা করে এসে একটা ঘাটে নৌকো বাঁধল, সে নৌকোর ঐশ্বর্য দেখে পাবলিকের চশমা চড়কগাছ, তারপর দোজ হু ম্যাটার এসে পৌঁছতে না পৌঁছতে হু-হা পাততাড়ি গুটিয়ে ভাগলবা। কেন? লক্ষ করুন। মহিলা সুবিধের নয়। যাতে লোকের চোখ ধাঁধায় ও টাটায়, সেজন্য তুমি বৈঠে থেকে হাল অবধি তোমার অবিশ্বাস্য সম্পদের বিজ্ঞাপন ছড়ালে, ভরদুক্কুরবেলা রইরই করে খবরটা চাউর হতে সময় দিলে, তারপর কোথায় রানিরা আসবে, রাজা, খাতির করে রাজ-গেস্ট-হাউস, শেষে বাছাই রাজপুত্তুরের সঙ্গে বিয়ে। তবে ইমপ্রেস না করেই তুমি পালাও কেমনে? কলাবতী আসলে, এবং এখানে বোল্ড ছাপা উচিত, সে—ই তখনই জানতেন, দুর্ধর্ষ ইমেজ বানাতে মারকাটারি জরুরি: মিথ। কামনা ও কৌতূহল ওছলাতে আবছাপনার জবাব নেই। হাঁদারাই গোড়া থেকে দাঁত বের করে স্টেজে আসে। ভোঁদারাও। কলাবতী 'টিজার' বাগিয়ে চম্পট, এবার গুজবে তাঁর বর্ণনা রোববারের লুচির ন্যায় ফুলবে। চিক-ফিকের আড়াল দিয়ে দেখা তো গেছে স্রেফ গায়ের দুধে-আলতা রং আর পিচ ব্ল্যাক চুল, এবার ফ্যান্টাসি লড়াও

ইলাবতী-লীলাবতী ফিগার। বউ করতে রানিদের লাপালাপি গ্যারান্টি। কী মসৃণ স্ব-ঘটকালি! খবরও নিখুঁত নেওয়া, গুনে গুনে পাঁচ পাঁচটা রাজপুত্র এ রাজ্যে, যাওয়ার সময় নিজের নাম-ঠিকানা দিয়ে, 'আনতে পারে মোতির ফুল ঢো-ল ডগর, সেই পুত্রের বাঁদী হয়ে আসব তোমার ঘর।' অর্থাৎ, কনটেস্ট। নিজেকে একটি অমোঘ ও ব্রেন-জাগানিয়া অ্যাডভেঞ্চারের শেষে অবিশ্বাস্য প্রাইজ হিসেবে উপস্থাপিত করা এই মেয়েটিই কি অ্যাড এজেন্সির প্রমাতামহী নন? কিন্তু দাঁড়ান দাঁড়ান, এখানে একটি বিষণ্ণ তারসানাই অপেক্ষা করছে চিল-আর্তনাদের জন্য। সোমত্ত ছুকরির নিজেকে নিজের বিয়ের ঠিক করতে হয়, কথা বলার জন্যে এক শুকপক্ষী ছাড়া ভূভারতে কেউ নেইকো, তোরা মেয়েটার চোকের জলটা কেউ বুঝলি না র‍্যা?

অ্যাগ্রেসিভ মার্কেটিঙের মেয়েটি একা কিন্তু, সত্যি। বাড়ি ফিরে লিপস্টিক মুছে, কাঁদে খুব। বেসিনে ইকড়িমিকড়ি কাটে, কল খোলা, খেয়ালও নেই। মাথার ওপর মাইল মাইল অগাধ জল, হা-চুপ কালচে নীল। ওরই মধ্যে জ্যোচ্ছনা ফুল ফুটেছে, তারই একটা বিম ধরে মেয়ের শ্বাসের ভুড়ভুড়ি উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে। শুক অত বোঝে না, বলে, মেঝেতে অমন পা ঘষছিস কেন, মেয়ে? ও কী, মকর-দাঁতের চিরুনি যে গেঁথে যাচ্ছে মাথায়, পোড়ারমুখি! জট ছিঁড়ছিস ওভাবে! শুকের মন ভাল, বেস্ট ফ্রেন্ডের আদলে নৌকোর মুন্ডু বানিয়েছেও রাজকন্যা, কিন্তু আফটার অল, পাখি ইজ পাখি। ডানা লীলায়িত, বক্রোক্তির ঠোঁটও আছে, তা বলে বয়ঃসন্ধির গোলমেলে প্রশ্নগুলোর উত্তর কী জানে? মন দিয়ে পালক খোঁটে। ওকে বলা যাবে, সেই সীমাহীন লাজস্বপ্ন, স্থলের রাজ্য দিয়ে আলোয় হাঁটছি, কিচ্ছুটি পরে নেই? কী পাখি? সেক্স? নিরাপত্তাহীনতা? ঠ্যাঁটা তাকিয়ে থাকে। ভাল করে খাও, কন্যা, জলদি ঘুমিয়ে পড়ো। তাই, যখন রাজপুত্ররা প্রত্যেক ফাঁদে ফেল মারল, শেষে সব বাধা টপকে বাঁদর-বুদ্ধু এসে দেখল প্রাসাদের তেতলায় কলাবতী হুতোশ করছেন শুকের কাছে, তাঁর পিছনটিতে দাঁড়িয়ে খোঁপা থেকে মোতির ফুলটি এই নিল রে নিল, শুক না আঁতকেই দিব্যি গাল-গলা ব্যেপে অ্যানাউন্স: চি'ন্ত না'ক আর, মাথা তুলে চেয়ে দেখ, বর তোমার! আরে, ইন্টার-স্পিশিস ম্যারেজ আদপে কী, বোঝেও না গাধাটা (না কি যতই আদর দাও, এখানে পশু-পাখি ফ্র্যাটার্নিটি অ্যান্টি-মানুষ সাবঅলটার্ন উল্লাসে থরোথরো?)। ওই জন্যেই গাড়ল তোর নামে সুখ-এর প্রিন্টিং মিসটেক।

'কলাবতী, চমকিয়া পিছন ফিরিয়া দেখেন, বানর!' ব্যস, বেণী এলিয়ে, কাঁকন ছুড়ে ফেলে, মেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ঠাকুর, কী করেছিলাম ঠাকুর! কিন্তু, শর্ত তো সকলই পালিত। ফেলুরাম সৎভাইরা গুমঘরে পচছে, বুদ্ধু তিন বুড়ির দাঁত এড়িয়ে, রাঙা নদীর ঘূর্ণি পেরিয়ে, কাঁথা-বুড়ির হাত ছাড়িয়ে, মোতির ফুল শুঁকছে এখন। কলাকন্যা উঠে, বাঁদরের গলে মালা দিলেন। তাঁর কি লেনিন পড়া ছিল: টুডে'জ এথিক্স ইজ টুমরো'জ এসথেটিক্স? আজকের নীতিই কালকের কান্তি? না কি সহজাত অন্তর্দৃষ্টিতে বুঝেছিলেন, বাইরের সত্য আর ভিতরের সত্য ওয়ান টু ওয়ান যায় না? বুদ্ধু বলল, 'এখন তুমি কার?' কন্যা এ-পায়ের বুড়ো আঙুলের নখে ও-পায়ের ওই খুঁটতে খুঁটতে বললেন, 'আগে ছিলাম বাপের-মায়ের, তার পরে ছিলাম আমার; এখন তোমার।' ট্রান্সফারটা তার মানে সটান ফ্রম বাপ-মা টু স্বামী নয় কিন্তু, খেয়াল করুন, নিজের শিকড়ে দাঁড়িয়ে উনি নিজেকে দিচ্ছেন। তারপর সহসা, হ্যাঁ, সমর্পণ-মুচলেকার পরেও, ফের পরীক্ষা। আনসিন।

কন্যা কৌটোর মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। আর ব্যস, ব্যাটা শয়তান শুক ধড়াম করে ঢোল-ডগরে ঘা। দেখতে দেখতে রাজপুরীর মধ্যে প্রকাণ্ড হাটবাজার। কৌটো আরও হাজারটা হোলসেল কৌটোর মধ্যে সুড়ুৎ মিশে গেল। কিন্তু এ তো হাঁদা রাজপুত্র না, যে জগৎ দেখেনি আর বডিগার্ড নিয়ে ঘোরে, এ হচ্ছে তাড়া-খাওয়া ধুলো-সওয়া বাঁদর। লেভেল-ক্রসিঙের হকার দেখে আঁখ পচেছে। তারা আলু-বেগুন ছড়িয়ে বসে, ট্রেন এলে মুহূর্তে গুটিয়ে যেন কেউ না কিচ্ছুটি ছিল না রামায়ণের যুগ থেকে। তকতক করছে লাইন। রেল-ন্যাজ স্টেশন পেরিয়েছে কি পেরোয়নি, ইনস্ট্যান্ট বাজার ফের। বুদ্ধু সোজা গিয়ে পরিত্রাহি ঢোল-ডগর বাজাতে আরম্ভ করে দিল। ডানে ঘা দেয় তো হাট বসে, বাঁয়ে ঘা দিলে, ভেঙে যায়। (এখানে বামপন্থীদের বাজার-বিরোধিতার ইঙ্গিত আছে কি না, সেমিনার ভাবুন, দ্রুত।) চোখ বুজে নতুন বর মহাসুখে বাজনা বাজায়, দোকানিরা দোকান ওঠাতে-নামাতে হয়রান, প্রত্যেকের স্লিপ ডিস্ক হয়ে গেল, গতরব্যথায় কাতর হয়ে 'রাখুন রাখুন, রাজকন্যার কৌটা নেন' বলে পালাতে পথ পায় না।

এর পরেও শেষ না, কন্যা বললেন, খিদে পেয়েছে, গাছের পাতার ফল এনে দাও। ভাল মনে সফল বানর ধায়, টিপিন করবে আর বউ খাওয়াবে, কিন্তু 'ও বাবা, এক যে অজগর—গাছের গোড়ায় সোঁ সোঁ করিয়া ফোঁসাইতেছে!'

বুদ্ধুর কোমরে সুতো জড়ানো ছিল (ওই সুতোর আগা ধরে ভুতুম বসে আছে জলের উপর), সে গাছের চার দিক পোঁ রাউন্ড মেরে, তীব্র মাঞ্জায় সাপ ব্যাটাকে জড়িয়ে না, ভোঁ দৌড়। সাপ কচাৎ পিস পিস হয়ে গেল। টেকনিকে মুগ্ধ কন্যে এতক্ষণে বললেন, 'আর না, সব হইয়াছে। এখন চল, তোমার বাড়ী যাইব।' এইখানে আমাদিগের আপত্তি প্রেজেন্ট করি। বস, তোমার শর্ত সব মেনে ঘেমেনেয়ে একটি প্রাণী এল, ম্যাচ জিতল, তুমি নিজে বললে তুমি তার, বেচারি রিল্যাক্স করে ফুলশয্যার সোহাগছবি রচছে, এবার কী করে ফের দুটো একজামিন দায়ের করো? এটা তো ফাউল, না? মাঠের ধারে ডেকে ট্রফি দিয়ে, তারপর স্টাম্প করে দিলে? অবশ্য না না না, খেয়েছে, আমাদেরই ভুল, দুটিরই রেফারেন্স আছে তো বটে হেঁয়ালিতে। সে ক্ষেত্রে বুদ্ধুকে তো থাকতে হবেই অণু অণু মুহূর্ত রুদ্ধশ্বাস পিছন-পায়ে অ্যালার্ট, সাফল্যের ইউফোরিয়ায় ভুললে চলবে না। হরর ফিল্মে যেমন হেরে যাওয়ার পরেও শেষ বার হড়াম করে মনস্টার জেগে ওঠে, এখানেও হরবখত চিল-প্রস্তুত, টানটান। এ মেয়ের পরীক্ষা নিরন্তর চলবে। 'আমায় টেক্‌ন ফর গ্র্যান্টেড কদাপি নিও না', ভালবাসার উচিত-তম পাঠ মালাবদলের স্পট থেকেই শুরু করে দেওয়া এই মহিলা কি আমাদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্রবতী নন? বারেক সন্দেহের জন্য, সরি, ম্যা'ম।

পরে যে দেওর-ভাসুরের চরম অত্যাচার, হত্যার হুমকি, সব সয়েও আকণ্ঠ বুদ্ধু-অনুগতা থাকবেন পরম সতী কলাবতী, সংকট দূরে যাওয়ার পরে এক দিন ফট করে দেখতে পাবেন বাঁদরের ছাল, পোড়াতেই বোঝা যাবে আসলে বুদ্ধু দেবতা-উপম সুন্দর, সে কথা কম বলব। উনি তো অসুন্দর বুঝেই তাঁকে নিয়েছিলেন। মন দিয়েছিলেন, ওষ্ঠ দিয়েছিলেন, ধবধবে গ্রীবা আর্চ করে, অধর স্ফুরিত করে, রোমশ থাবা সয়েছিলেন নিয়ত। কবে কে শাপমোচন লিখবে, তার জন্য বসে না থেকে।

ও হ্যাঁ, ডুবুরি আর এক বার নেমেছিল। আর ওঠে না। কাপ্তেন ভাবলেন, ব্যাটা সাতফণার গভ্‌ভে গেল বুঝি এবার। চ্যাঁচামেচি হল, 'বলি ও, তোর হাড়মুড়মুড়ি হল না হুমোয় নিল?' বিকেল পেরিয়ে, খেলা সেরে হোমওয়ার্কের মনখারাপের সময় পেরিয়ে, তল-সাঁঝে উঠল এক লিখন সঙ্গে নিয়ে। গিয়ে নাকি দেখেছে এক প্রদীপ আজও জ্বলে। পা রাখতে ধ ধ্বড় ধ্বড় শব্দে হাজার

সিঁড়ির ধাপ ধ্বসে গেল, তারা-মাছ এসে শুঁকে গেল, আথালপাথাল করে উঠে ঘরে প্রদীপ দবদব ডুবুরির মন ছবছব, কী পায়? কলাবতীর শ'মুক্তোর ঝুমঝুমি? বেরং জলখোল? না, ভাসছে ছোট্ট লিখন-অংশ, যেন তারই জন্য এত দিন:

'ভাই শুক, তোকে ফেলে এসে আমার বুক হড়াস হড়াস করে মচকায় বাবু। কী করি বল? উনি বলেছেন, অতীতকে টুঁটি মুচড়ে তবে আমায় স্থলের হয়ে উঠতে হবে। পায়ে পড়েছি, শোনেননি। বলেছি, একবারটি এনে উড়িয়ে দেব, পা ছাড়িয়ে নিয়ে সভায় চলে গেছেন। ফিরে যাব ভেবেছিলাম, সত্যি বলি, সাহস নেই। ওঁকে ছেড়ে বাঁচার খোলস আমি ছেড়ে ফেলেছি। কে খাওয়াবে তোকে? ভাই আমার, বন্ধু আমার, মুখ গুঁজড়ে ঠোঁট থেঁতিয়ে মরে থাকিস সোনা। তোকে আমার আদরের মতো, আমার বিশ্বাসঘাতকতার মতো ঘিরে থাকুক জল, জল, জল, ওঃ জল, স্তব্ধ, দীপ্ত, দোলদুলুনি জল, উগরে ওঠা ফেনা, কঠিন ঝিনুক। ইতি।'

ক্রোড়পত্র 'রূপকথা', ২০ অক্টোবর ২০০৪

বিয়ে করতে ভয় করে

প্রথম ভয় তো বাসরের টুলটুলে মেয়েটাকে দেখে মনে কী শেল বিঁধবে, তা নিয়ে। প্রত্যেক বাসরে দেখা যাবে কোণের দিকে ভারী মিষ্টি ভঙ্গিতে বসে আছে সেই মেয়েটা, যাকে সারা জীবন ধরে চেয়ে এলাম। মুখ দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায় পৃথিবীর সব মধু ওইখানে নিশ্চিন্তে জমা আছে। একটি কথা নেই, সারাক্ষণ মুখ টিপে নরম নরম হাসি, তারপর অজস্র অনুরোধে যেই ঠান্ডা ঝরনার মতো 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে' শোনাবে, মনে হবে উফ ভগবান এর প্রাণের পরে কে গেল আমি ছাড়া? আশ্চর্য, এদের সঙ্গে কলেজে দেখা হয় না, কোচিং-এ না, মাসির বাড়িতে না, এরা শুধু বাসরে আসে। তারপর ভোর হতে না হতে, ব্যস। ফোন নম্বরটা অবধি রেখে যায় না। শুধু হৃৎপিণ্ডে পদছাপ প্রায় তেরো বছর ধরে থাকে। আর এই মেয়ের অল্প বাঁয়ে বসেছে যে? তার যৌবন দেখে বঙ্কিমি বললে 'দলমল', ফ্র্যাংক বললে 'আহাউহু'। সে আবার কনেরই কীরকম যেন বোন। তো আর কী করা? বোনের দুঃখে মনে যাও। নতুন জামাই সিগারেট খাওয়ার ছল করে বারান্দায় গিয়ে নক্ষত্রের দিকে শাঁ শাঁ ধোঁয়া নিক্ষেপ করে। হু হু করে ওঠে পাঞ্জাবির পকেট। নতমাথা মানুষ যেমন, যতই নিঃশব্দে হোক, গিলোটিন নেমে আসার আওয়াজ ঠিক শুনতে পায়, কয়েদির পেছনে যেমন আলোর আয়তক্ষেত্র কমিয়ে দুপ্ শব্দ করে অবধারিত বন্ধ হয়ে যায় দরজা, বিয়ের রাত্রে পুরুষও বুঝতে পারে, ব্যস, ঝড়াংসে, যাবজ্জীবন। অ্যাদ্দিনও কি অটোর ডাইনে বসা কোঁকড়া চুলের মেয়েটিকে পেয়েছি? পাইনি। দেখতে দেখতে মেট্রোয় ঢুকে গেল, আমি তো মোড়ে যাব। কিন্তু কোথাও, তত্ত্বগত ভাবে, আশা ছিল। যেন যে কোনও রাজকন্যাকেই, সঠিক সাধনা ও ভাগ্য ক্লিক করে গেলে, করতলে মহার্ঘ আঙুরের ন্যায়, লভিব ঠিকই। এবার? তাকানোই বারণ। কামনা করা? বারণ বারণ! অ্যাবসার্ড, অপমানজনক, অমানবিক, মৌলিক অধিকার হরণকারী

আদেশ—মোনোগামিতা। যা-ই হোক, জীবনের বাউন্ডারিতে হেমামালিনী নাচুক, এক মেয়েকেই বেসে যাবে ভাল। মনোগামিতা-র উল্টো। এ প্রতিশ্রুতি কি মানুষে দিতে পারে, আঠেরো বছর পরেও/আঠেরো মাস পরেও/আঠেরো দিন পরেও এই মেয়েকেই ভাল লাগবে? হ্যাঁ, লাগতেই পারে। আবার, না লাগতেও তো পারে। সে স্বাধীনতাটার সম্ভাবনাটাই মুখে ঠুলি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে, হামানদিস্তায় থেঁতো করে, পূর্বাহ্নেই ফেলে আসছ অন্ধগলিতে? আরও ঝামেলা হল, শোনপাপড়ি হয়তো খেতামই না বুধবার, কিন্তু কেউ যদি কানের কাছে 'খবরদার বুধবার শোনপাপড়ি খাবি না', 'বুঝলি রে কিছুতেই বুধবার আর যা-ই খাস, হ্যাঁ বাবু, শোনপাপড়ি খাবি না' জপে যায় একনাগাড়ে, বুধ সকালে উঠেই কি মেগা-দীর্ঘশ্বাস পড়বে না এই ভেবে যে, উফ, আজ বুক ফেটে গেলেও শোনপাপড়ি বারণ? তাই বারে বারে নজর চলে যায়, পাশের ফ্ল্যাটে নতুন আসা মেয়েটি তরকারি দিতে এলে দুমড়ে ওঠে খবরের কাগজ, আর যুক্তি-বুদ্ধি মাথা তুলে সপাটে জানতে চায়, কোন হাঁদামি এই স্বেচ্ছা-শৃঙ্খল সযতনে পায়ে জড়াতে প্রণোদিত করল বাছা? কোন অ-গজকচ্ছপ লোক স্বাধীনতাহীনতায় বাঁচিয়া হুররে দেয়?

বাপু, বিপদ বহু লেভেলে। মেয়ে তো দেখেছ পর্দায় কাজল-রানি, আর ঢাকুরিয়া লেকে নারী এসেছে মিঠে চরণে মেক-আপ বরণে কাচা জামা পরনে লাজুকলতা ধরনে। গা দিয়ে ভুরভুর করে সুগন্ধ। 'এক্সকিউজ মি' ছাড়া হাঁচি বন্ধ। এবার তাকে পাবে জন্মদিনের পোশাকে। প্রলেপ ছাড়া। ডিওডোর‍্যান্টহীন। হ্যাঁ, ওগুলো স্ট্রেচ মার্ক। ওখানটা ছোটবেলায় পুড়ে গেছিল, সেই থেকে ও রকম। তারপর সকালে উঠে সে বাসি মুখে হাসবে। আলটাকরা দেখিয়ে হাই তুলবে। শব্দ করে ব্রাশ করবে। তার ঘংঘং কাশি হবে, মোগলাই খেয়ে অম্বল হবে, ঘসরঘসর করে সে পেটের কাছটা চুলকোবে। 'খুব টক জল উঠছে জানো? আর বিনবিন করে ঘাম ভাঙছে', ঘনিষ্ঠ হয়ে বলবে। ঠোঁট উল্টে মুখ বিকৃত করে জলঠুঁটো দেখাবে। সইবে, এই ম্যাজিকের খোলস উন্মোচন? এই আশ্চর্য বেঢপ সত্যি? মেয়েরা দেবী নয়। দাড়িগোঁফ না থাকলেও, নিখুঁত নয়। অনেকটা খরখরে। এই যে বউ এসেছে চতুর্দোলায় চড়ে, তার বাতের ধাত। 'আগে বলোনি তো!' 'আগে কখনও কথা উঠেছে? আর তুমি বলেছ, তোমার রোজ আমাশা?' ফিলিম ফেস্টিভ্যালে যে প্রেম দেখে হৃদয়ের একূল ওকূল একেবারে দক্ষিণবঙ্গের ভাঙন, তাতে ক্যামেরার ফিল্টার

ছিল, নায়িকার ফল্‌স ইয়ে ছিল, তুখোড় স্ক্রিপ্ট-লেখকের ডায়লগ ছিল। জীবনের ট্রেলর কেউ বিশ্বাস করে কমাদাঁড়িসুদ্ধু?

তারপর শুরু খুড়শ্বশুরের বুকনি। বা শালার ছোটমেয়ের সিকনি। অ্যাজ দ্য কেস মে বি। টানা পনেরো দিন ভুরিভোজের পর ফুলমামুর বাড়ি গিয়ে ফের 'এক দিন খেলে কিচ্ছু হবে না, খেয়ে নাও'। কী করে বলি, এক দিন নয়, হে ব্লাডি ফুল, আমি ডেলি অত্যাচারিত হচ্ছি, আপনাদের রাবণের গুষ্টির আপ্যায়নের ফাঁসে আমার পেটরোগা সত্তাটি গিঁট পাকিয়ে গেল? ওদিকে বউয়ের সনির্বন্ধ 'বাবার যখন চাকরি গিয়েছিল, উনি আমাদের কতটা করেছেন জানো?' জানি না। শুধু জানি, জেলুসিল কোম্পানির সাধ্যি নেই এ প্রলয় রুধিবে। তবে এ তো শুধু প্রথম ক'দিন। প্রথম সাঁইত্রিশটা শনি-রবিবার তোমার জীবন তছনছ করে সবার নব জামাইয়ে জাগো। নতুন রেসিপি বই খুলে ট্যাড়সের মাংসালু প্রিপারেশনে গিনিপিগ-করণ। কিন্তু পিছনে পিছনে বগি হিসেবে আসছে আসলি বাঁশ, দায়িত্বের জলস্তম্ভ। 'ওগো, তিলুদির ছেলের নাকে ফুসকুড়ি হয়েছে! তিলুদি মনে নেই, চন্দননগর থেকে এল, হলদে রঙের টোস্টার দিয়েছে!' মনে থাক না-থাক, আঁতকে উঠতে হবে। তারপর দৌড়তে হবে সে নেকো ছেলেকে কোল দিতে। ছিঃ, নইলে ওঁরা কী মনে করবেন।

এরপর ক্রমে গাঁটগচ্চা দিয়ে কিনে আনতে হবে আমেরিকায় ছেলের কাছে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে সেজজ্যাঠার লজঝড়ে ফ্রিজ, ঢাকুরিয়ায় ভায়রাভাইয়ের বাড়ি ঘাড়ে বয়ে দিয়ে আসতে হবে জয়নগরের মোয়া আর নলেন গুড়ের লিক-করা হাঁড়ি, মাংকি ক্যাপ পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে শ্বশুরের দেওঘর যাওয়ার মোক্ষম লগ্নে হাওড়া স্টেশনে, শালাবউয়ের আবদারে লিখে দিতে হবে তার ছোট্ট মেয়ের 'প্রিয় ঋতু' রচনা, ফোন বিল দিতে হবে আট হাজার টাকার কারণ 'রক্তকরবী' দেখে বউয়ের ভারী মন কেমন করে উঠছিল কলেজের বন্ধু নন্দিনীর জন্য। ভয়াবহ রক্তচোষা ইন্দি-পিন্দি-সিন্ধি ক্রমশ ঘাড়েপিঠে চড়তে থাকবে নানা অছিলায়। নিজের তাবৎ পরিজনকে কী পরিমাণ দাবড়ে এলাম চিরকাল! কুটো নেড়ে দুটো করিনি, সিল করা সিরাপ ফুটো করিনি, নাগাড়ে ধমক-ধামকে বুঝিয়েছি, পাঁচশো চিনি ওজনদাঁড়ি বুঝে নিয়ে আসার জন্য আমার জন্ম না। বরং তোমাদের জন্ম আমার মুখের সামনে ম্যাগি ধরতে আর ছুট্টে এসে জল গড়িয়ে দিতে। হায়, গোকুলে কে বাড়ছিল কে জানত।

আর ঠেলা বোঝো, একটু গোমড়া হয়ে বসে থাকার জো নেই! 'কী হয়েছে

গো? কেউ কিছু বলেছে?' আরে! সর্বক্ষণ ঘরে এই মেয়েটা হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে কেন বল্ তো? মন খারাপ করছি কী সুন্দর, নিজের ওপর মায়া হচ্ছে, সেটা অবধি ভোগ করতে দেবে না? বিছানায় শুলে আর একটা গা, হাঁটলে পাশে আর একটা লোক। বই পড়ছি, শাড়ির খসখস, টিভি দেখছি, আলমারি গোছানোর ঘটাংঘট, কবিতা ভাবছি, বারান্দায় গেল হিমেল হাওয়ার দরজা খুলে দিয়ে। কী সুন্দর একলা ছিলাম। রাজা। এখন সব সিদ্ধান্তই গণতান্ত্রিক। কী সিনেমা দেখব, এফ টিভি খুলব কি না, বন্ধুর সঙ্গে নোংরা জোক বললে হাসি কদ্দুর, সব সময় দ্রুত ক্যালকুলেশন, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে কী খটাখটি হতে পারে মনের পিছন দিকে অনবরত তার আন্দাজ। ইচ্ছে হল, নাইট শো-তে একটা সিনেমা দেখে ফিরলাম, না বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। 'খামখা দাঁড়িয়ে আছ কেন? ঘরে বসে টিভি দেখলে কী হত?' 'সে তুমি বুঝবে না।' সত্যিই বোঝা দায়। আরও দায় মান ভাঙাবার। জবাবদিহি। জানকারি। না বলিয়া কোথাও যাইবে না। বাইরে খাইলে রুটি হওয়ার আগে বাড়িতে ফোন করিবে। আর, আমাকে না লইয়া বাইরে খাইবার সাহস হয় কী করিয়া? বাথরুম অবধি যত বার খুশি যাওয়া যাবে না। 'ডাক্তারকাকুকে ফোন করব?' আরে নিকুচি করেছে! নিজের মতো করে জীবন কাটানো ক্রমে অপরাধ হয়ে গেল। সায়ামিজ টুইন যেমন মাথায় মাথায় লেগে থাকে, এ বীরেনদার দোকানে গেলে ও-ও ঘেঁষটে ঘেঁষটে যেতে বাধ্য। আয়নায় দাঁড়ালেও দুটো চেহারা দেখতে পাব, সন্দেহ।

এবং দুশ্চিন্তার কী বহর! পর্দার ম্যাচিং কাপড় পাচ্ছি না। মলয়ের বিয়েতে কী পরব বলো তো? ঘাগরা চোলি? আরে করো না যা খুশি। হলদে দেওয়ালে মেরুন পর্দা টাঙালে কি বাড়ি ধসে যাবে? যা গন্ধমাদন ডাঁই করা রয়েছে গোদরেজে, মলয় আটটা বিয়ে করলেও হিন্দি সিনেমার মতো মিনিট দুয়েক অন্তর শাড়ি বদলানোর খ্যামতা আছে তব। তারপর যদি ঘাগরা, নাগরা, পাগড়ি কিনতে ইচ্ছে যায়, কেনো। কিন্তু এমন গ্রাম্ভারি থমথমে মুখ করে এমত সমস্যা উপস্থিত কোরো না, যেন ইরাক যুদ্ধের পর এই আর একটি স্টপ প্রেস। কী কাণ্ড হয়ে চলেছে এ মহাবিশ্বে, সূর্যের ডবল সাইজের নক্ষত্ররা রেগুলার হাঁইহাঁই করে গিয়ে ব্ল্যাক হোলে পড়ছে। সৌরভ খেলতে পারবে কি না কেউ জানে না। বুশ তো মাউন্ট রাশমোর-এ নিজ মুন্ডু গড়াতে দিল বলে। বস্তি ভেঙে দিচ্ছে বামপন্থী সরকার। আর আমার কোন প্যান্টের পায়ে এট্টু কাদা লেগে আছে বলে উনি আমায় বেরোতে দেবেন না। বাড়িতে লুঙ্গি পরা নিষিদ্ধ,

চোস্ত পাজামা পরে বিরাজ করতে হবে। ইলেকট্রিক ইস্তিরি না আনলে অনশন করবেন। চোদ্দো ইঞ্চি টিভি টান মেরে ফেলে দিয়ে দক্ষযজ্ঞ বাধাবেন, কুড়ি ইঞ্চি ছাড়া কিচ্ছু দেখা যায় না। আর কাজের লোক এল না গো এল না, কাজের লোক এই করল না গো ওই করল, কাজের লোক বলল ওর মেয়ের ভেদবমি হয়েছে কিন্তু তা হলে মিন্টুদের বাড়িতে কাজ করল কী করে, কাজের লোক কোনার দিকটা কখনও ঝাঁট দেয় না আজকে তাই ঘড়ঘড় করে খাট সরিয়ে রাখো, কাজের লোক কোঁচড়ে করে চন্দনের বাটি নিয়ে গেছে না যায়নি। এই অবিশ্বাস্য তরল, খুচরো, পাতিস্য পাতি কাণ্ড দৈনিক ও অনন্তকাল! যেন শাড়ির ছেঁড়া পাড় খুঁজে পাওয়ার ওপরেই দাম্পত্য দাঁড়িয়ে থাকে, গামবাট দম্ভে। নামে সরোবর, চিন্তা ডোবে না।

তবু বিয়ে। কেন? সত্যি বললে ভারী অশ্লীল কথা বলতে হয়। মিথ্যেটা সুন্দর। জ্বর-কপালে এক কোমল স্নেহঝর হাতের স্পর্শ পাওয়ার জন্য। সন্ধেবেলা বাড়িতে এসে খোঁচ-উঠে থাকা বাস্তবের ঘষায় যে নির্মম জ্বলুনি তাতে একটু মলম লাগাবার জন্য। দোঁহে মিলে খুদে মানুষের নিদ্রিত মু'খানি নিরখি মরার জন্য। এ যখন মই দিয়ে উঠে ফিউজ ঠিক করছে ও মই নাড়িয়ে দিয়ে খিলখিল হাসার জন্য। গাইনির চেম্বার থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে একটা ফিসফিস কথা বললে 'অ্যাই, অসুব্য কোথাকার' বলে গুমগুম ফাঁপা কিল মারার জন্য।

আসল কথা কী? সবাই করে, তাই আমিও করছি। সাহস নেই, নিজের মতো হওয়ার। আলাদা। অন্যদের কাছে হাসির। আর, সবচেয়ে বড় কথা, ভয়। বারান্দায় একদম একলা দিনের পর দিন বসে থাকার। নিজের ডান হাত দিয়ে নিজের বাঁ হাতে হাত বোলাতে বোলাতে।

বিশেষ ক্রোড়পত্র 'তত্ত্ব তালাস', ২০০৬

শুক-সারীর গান

শুক বলে, বিয়ে মানেই একঘেয়েমির দুঃখু
সারী বলে, এক মেয়েতেই সব মেয়ে আছে, মুখ্যু! তোর মন কি কানা?
কোরাস: মন কি কানা ঘোর দিওয়ানা উলুকসুলুক ফিল্মে
তন্বী দেখেই ধন্যি সুরত ঝাপটা মারে দিল মে?
কুইন/বাঁদী সব সোয়াদ-ই জাগবে পেলে মন্তর
ঘুমিয়ে আছে জিনাত আমন সব মেয়েরই অন্তর।

শুক বলে, ক'দিন পরেই বউ তো মোটা ছোড়দি
সারী বলে, আমরা তখন 'বোনপো' গড়ায় জোর দি। এ কি সেলফিশানি!
কোরাস: সেলফিশানি বিয়ের পানি ফুললে এবং ফললে
নতুন মানুষ খপখপিয়ে উঠতে যাবে কোল্লে
তাকেও হামি বউকে স্বামী ঘেউকে নতুন হাড্ডি
মিলজুলিয়ে সবাই নিয়ে চলতি কা নাম গাড্ডি।

শুক: বিয়ে মানেই খুড়শাশুড়ি মাথায় চেপে বসছেন
সারী: আরে ইয়ার, বাড়ছে 'পি. আর', সেটাই আসল কোশ্চেন। বস, কম কথা না!
কোরাস: কম কথা না জঙ্গি হানা কিংবা আকুল কিডনি
এপাং ওপাং ফোন বাগিয়ে 'আত্মীয়-ইন-নিড' নিই
বিয়েয় পেলে এক্সট্রা মা-বাপ, ট্যাক্স-ফ্রি শুভাকাঙ্ক্ষী
রামের বরেই সাগর পেরোয় ভক্ত হনুমাঙ্কি।

শুক: সকালবিকেল খ্যাচর খ্যাচর মাজন এবং সব্জি
সারী: গ্যাঁট বসে যে খ্যাঁট মেরে যাও ডুবিয়ে মিহিন কব্জি! প্লাস লাল জেলুসিল?

কোরাস: লাল জেলুসিল-ছিটকিনি খিল-মোক্তারুকিল সামলে
সাজবে সাকি? জবরখাকি! হিম্মৎ সে কাম লে।
সত্যি যদি দাঁতন ফেলে রোবিননাথন কপচায়
চুন খসিবে বরগা হতে নুন বসিবে সব চা-য়।

শুক: বিয়ে মানেই হাফ-স্যালারি লিপিস্টিকের খরচা
সারী: ওই জিনিসেই ফলছে তোমার নয়নসুখের চর্চা। শুধু দেখলে হবে?
শুক: গ্রীষ্মে-শীতে প্রাইভেসিতে সাতজন্মের ভস্ম
সারী: উহাই হল শয্যা-শেয়ার অমৃত-রহস্য। গুরু, দু'দিক আছে!
শুক: মোট কথা এই দিল্লিনাড়ু খাক বা না-খাক, পস্তায়
সারী: তাইলে বাপু খেয়েই দ্যাকো, মিলছে যখন সস্তায়! আর ঢং কোরো না!

ক্রোড়পত্র 'সেদিন দুজনে', ২০০৫

নেই গুণ, কপালে আগুন

অথবা, ঋত্বিক ঘটকের মর্তে আগমন

'বর এসেছে বর এসেছে' বলে সব চিল্লিয়ে হাপ্পুস, উলুটুলু দেওয়ার জন্য জিভ গুটিয়ে রেডি, 'অ্যাই ঠেলছিস কেন, বরকাকু দেখব' রবে বাচ্চারা বেজে উঠেছে, এমন সময় সবার বুকে যেন ধড়াম করে গদা এসে লাগল। বাড়ির লোকের একটা টেনশন ছিলই, যা তেএঁটে গিটপাকানো টাইপ, হয়তো ক্যাজুয়াল ড্রেস পরে চলে এল আজকের দিনটাও। কিংবা নেশা চড়িয়ে এল অল্প। কিন্তু এ জিনিস কেউ কল্পনাও করেনি। নিদেন পক্ষে বাঘছালটা যে কোমরে আলগা পেঁচিয়ে রাখে, তা-ও নয়, বর এসে নামল, ছাইফাই মাখা গোটা অঙ্গে, এবং পরনে কিচ্ছুটি নেই, ন্যাংটা! একটুক্ষণ সব ব্যোমকে চুপ, তারপর হর্‌রা। খিঁকখিঁক খ্যালখ্যাল হৌহৌ। মেনকা মূর্ছাই যেতেন, কিন্তু টুকটুকে মেয়েটির কথা মনে পড়ল। দৌড়ে কনের ঘরে গিয়ে দোর দিলেন। তারপর কী হয়েছে কে জানে। আধ ঘণ্টা বাদে দুমদুম দরজা ধাক্কিয়ে সবাই আগল খোলাল, সমস্বরে বলল, কাপড় পরানো হয়েছে, অযত্নের ছাইগুলো অল্প ঝাড়তেই ছোবলের মতো ঝিকিয়ে উঠেছে কাঁচা সোনার রং, জটাটি খুলে দিতেই পিঠ ঝাঁপিয়ে পড়েছে গঙ্গাধোওয়া চিকন রাশি, আর শৌখিন জোড়ের ওপর বুটি-বুটি বাঘছালটি শালের মতো ফেলে দিতে নাকি কেউই আর চোখ ফেরাতে পারছে না, রাজপুত্তুর না রাজপুত্তুর! বরের চ্যালাগুলো সব খ্যাখ্যা করে হাসছে। ক্কী? কেমন দিলাম?

মেনকা সত্যি বলতে কী, কিছু বোঝেন না। কী দিলে বাছা, কেন দিলে? আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের বুকে পাথর না ডললে কি তোমাদের চলে না? ছোট দেওর তড়িঘড়ি বোঝায়, ছি বউদি, আমাদের দিয়ে ওঁকে বিচার

কোরো না। কত বড় সাহস বলো তো? কতখানি সততা? নিজেকে উন্মোচন করে দেওয়ার ক্ষমতা কী অমানুষিক! এখন একবার ভাল করে তাকিয়ে দ্যাখো, কী রূপ ওঁর! জ্যোতি বেরুচ্ছে পুরো গা দিয়ে। এ জিনিস না-দেখাতে কত মনের জোর লাগে বোঝো? যে, আমি কিছুতেই জেল্লার দাস নই? ছুট্টে তিতির এসে বলল, ওসব বাংলা মিডিয়ামের ভাব-সম্প্রসারণ না, আসলে স্টাইল স্টেটমেন্ট। মানে, আমিই আমার বাণী আর কী। আরে, ওঁর নো-কম্প্রোমাইজ স্টান্সটা তো জানো। সেটা প্রতিটি মুহূর্তে উনি দেগে দেবেনই। এটা হচ্ছে নিজেকেও মনে করিয়ে দেওয়া, যা-ই ঘটুক, আমি ভিড়ে ভিড়ব না। কাউকে, কিচ্ছুকে, কক্ষনও রেয়াত নয়। সমাজ, সংসার তো দূর, নিজের লোভকে এগাল-ওগাল থাপ্পড় মারব। এ না হলে ভগবান হওয়া যায় না, কাম্মা। প্রাইজপাড়ায় দেঁতো হাসব, জগদ্ধাত্রী পুজো ওপেন করব, আবার দপদপে কলজেয় ত্রিশূল ছুড়ব অব্যর্থ, সব একসঙ্গে হয় না। সন্টু হেসে বলল, অত বলতে হবে না, বউদি জানে। পারু যার হাত দিয়ে প্রথম লাভ-লেটারটা পাঠায়, তাকে উনি সিম্পলি ভস্ম করে দিয়েছিলেন। তখন সাধনা চলছে যে!

হুমদোহামদা ভদ্রলোকরা ডেকে নিয়ে গেলেন, 'ইয়ে, হিমালয়বাবু, এট্টু এদিকে আসবেন? মানে, কাণ্ডটা তো দেখলাম, ছেলে এমনিতে কী করে?' এমনিতে কিচ্ছু করে না। কিন্তু অমনিতে রাজা। শিল্প নিয়ে ফ্যালে, ছোড়ে, লোফালুফি করে। ওর পায়ের কাছে সব সমঝদার বসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বাস রে! গানের সম্রাট। নাচের শাহেনশা। একবার, নারদের বেসুরো গান শুনে শুনে অতিষ্ঠ হয়ে রাগ-রাগিণীরা মুচ্ছা খেয়ে পড়ে আছেন। নারদ তাঁদের কপালে জল-ফল ছিটিয়ে কেঁদেকেটে বললেন, ই কী? আমি তো পাগলের মতো হিট। পপুলার। তা হলে আপনাদের এ দশা কেন? রাগ-রাগিণী টং করে বেজে উঠলেন। আরে ড্যাকরা, তোর জনপ্রিয়তায় নাতি মারি। আমরা জেনুইন শিল্পের কথা বলছি। যতক্ষণ না মহাদেব গান গাইছেন, আমরা পূর্বরূপ ফিরে পাব না। তো ছুট ছুট। শিবুদা, গাইতে হবে। শুনে ও গাওয়ার একমাত্র শর্ত কী দিল জানেন? উঁহু, লাখ টাকা নয়। না, বিজ্ঞাপন নয়। বছরভর স্পনসর? আ ছি ছি। শুধু বলল, উপযুক্ত শ্রোতা জোগাড় করে দাও। ওর গানটি বোঝার ঠিকঠাক আধার। বুঝলেন? এদের কাছে টাকাকড়ি দিন, খিস্তি করে কমোডে ফেলে দেবে, যশপ্রতিষ্ঠা তো শূকরীবিষ্ঠা, এরা চায় শুধু সমঝদার। আমি আমার শিল্পে আমোদগেঁড়েমি সইব না, তুমি বুঝলে বোঝো, নইলে ফুটে যাও। তা, প্রতিভা এতটা যুগের চেয়ে এগিয়ে, অডিয়েন্স পেতেই

প্রাণ ওষ্ঠাগত। শেষে নির্বাচিত হলেন শুধু ব্রহ্মা আর বিষ্ণু। সারা হল-এ শুধু দু'জন। ভাবুন।

নিন্দুক চেয়ারে বসে ধাক্কাপাড় ধুতি কাফ মাস্‌ল অবধি তুলে, পা নাচাচ্ছিল। বলল, হিমালয়দা, ব্রহ্মা গান শুনে ক্ল্যাপ দিল বললেন না? এই ব্রহ্মাই তো কী একটা মুখ খারাপ করেছিল বলে আপনার জামাই পোঁচ দিয়ে একটা গোটা মাথা কেটে নিয়েছিল? সেই থেকে পাঁচের বদলে ওঁর চাট্টি মুখ মাত্তর! হিমালয় চোখ বড় বড় করে ফেললেন।

—সে ভায়া, টেম্পারটা সাংঘাতিক, মানতেই হবে। যখন তাণ্ডব সিকোয়েন্সটা নাচে, ওরেব্বাপরে, এক একটা পা ফেলবে আর মিডিওকার পৃথিবীর ধোঁকার টাটি চুরচুর হয়ে ভেঙে যাবে। সে কী মূর্তি! লাথাচ্ছে, মেরে চুর করে দিচ্ছে, বুকের ভেতর হাত চালিয়ে মুঠো করে রক্তশাঁস ভর্তি ধকধকে হৃৎপিণ্ডটা খপ করে তুলে আনছে একেবারে। ওসব ফঙ্গবেনে বাহির-স্মার্টনেসের কাঁথা, ভণ্ডগোঁসাইপনার আলখাল্লা, সব ফর্দাফাই করে, কনভেনশনের কাঁখে ঝুলে থাকা নাড়ুগোপালের হাত মুচড়ে তছনছিয়ে হান্ডুলবান্ডুল সে কী প্রলয়! নতুন করে দলা পাকিয়ে নাকি ছানতে হবে সব। ধুলো মেখে, ধুলো হয়ে, নিজের রক্তের চিৎকার শুনে, পাশের লোকটাকে বুকে জাপটে নাকি নতুন আখর তৈরি হবে। বোঝো। আসলে এই লেভেলে উঠতে গেলে তো আমাদের মতো মেনিমুখো ধম্মজিরাফ হয়ে বাঁচা যায় না। এরা ঢেকেচেপে পেছন থেকে ছুরি মারে না, সটান চাকু চালিয়ে দেয়। সেদিন একটা প্রগতিশীল বসে মদ খাচ্ছিল, হেব্বি ভাবুক হিসেবে নাম করেচে, সিধে তার সামনে গিয়ে বলে কী, ভাবো ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিস করো!

নিন্দুক ২ খক্ক করে এক রকম হেসে উঠলেন। মাউন্টেড পুলিশের ঘোড়ার উদ্‌গার যেন। বললেন, অবশ্য পাড়ার লোক অন্য রকম বলছিল। ডেলি নাকি মাছের মতো মাল খায়। টলতে টলতে ফেরে। সকাল থেকে গাঁজার ধুমকি। শ্মশানে-মশানে টাল খেয়ে পড়ে থাকে। নর্দমায় নাক ডাকায়। সাঙ্গোপাঙ্গও জুটেছে পারফেক্ট! শালা ভূতের দল। বাড়ির একটা কাজ করে না, চাকরি সেধে দিলেও নেবে না, ওই সব লোফারলাফাংগা নিয়ে দিনভর উদ্দাম বাওয়াল, আর নেশা। মাতাল হয়ে আরবিট ভাঙচুর করে, ভদ্রলোকদের ধরে ধরে অপমান করে, চাড্ডি কথা শিখেছে, আইডিয়ালের নামে চালিয়ে দেয়। মালটি প্রকৃত প্রস্তাবে একটি পাঁড়-অ্যাডিক্ট। স্যাভেজ। আর কিস্যু নয়। ডাক্তার দিয়ে একটু এগজামিন করিয়ে নেবেন, গলার কাছটা নীল হয়ে আছে, অবজার্ভ

করলুম। শুনে চারদিকে একটু হাসি পড়ে যায়। চোখ টেপাটেপি চলে। চলো, বুফে আবার শুরু হয়ে যাবে, বলে চকাৎ চকাৎ ঠোঁট চাটতে চাটতে সবাই অন্য দিকে হাঁটা দেয়।

একটু দূর থেকে প্রায় হুমড়ি খেয়ে ছুটে আসে উস্কোখুস্কো চেহারার নন্দী। কী বলছিল শালারা? শুয়োরের নাদি কোথাকার! দাদার নামে আর একটা কথা শুনলে...একটা আধলা ইট কোত্থেকে কুড়োয় সে। হিমালয় শক্ত মুখে থামান। যথেষ্ট হয়েছে, ছাড়ান দাও। ফ্যাঁৎ করে মারমুখী যুবক কেঁদে ফ্যালে। ওরা বোঝে, দাদা কাদের জন্য রেগুলার বিষ খান? ওরা জানে, কাদের অপরাধের সব শাস্তির বকলমা দাদা নিয়েছেন বলে ওঁর গলাটা কষ্টে নীল? দিনের পর দিন কতগুলো লোমশ জন্তু আমার দেশটাকে ধরে রেপ করে চলেছে, আমার বোনের ওপর চড়ে এঁটো জিভ দিয়ে রূপ হাঁটকাচ্ছে হারামজাদাগুলো, খুবলে ছেঁচড়ে দু'টুকরো করে দিচ্ছে আমাদের মা'কে, আর এ ভেড়ুয়ারা বসে বসে লাল্টু আইসক্রিম চুষছে। ক্যাবলাকলা কলাকৈবল্য শালা। এই আত্মঘাতী ইনডিফারেন্সের বিষ কতটা বলুন তো, মেসোমশাই! সেই পুরোটা একা গিলে নিয়ে দাদা বারবার চাবুক ছুড়ছেন থুথু মারছেন লাথ কষাচ্ছেন ভদ্দরলোকদের টুনি-লাইটের পসরায়, এই বীভৎস মজার গর্তে, যেখানে ভাই শালা খারাপ পাড়ায় বোনের কাছে যায়, বোন শালা দিদির প্রেমিক নিয়ে সটকে পড়ে। নিজেকে নিংড়ে মুচড়ে সেঁকো বিষে ঝলসে দাদা বলছেন, তোরা পেছন উল্টে হাওয়া খা, আমি তোদের লড়াইটা লড়ে মারগুলো একলা সইব। আর এই শুয়োরের বাচ্চাগুলো কিচ্ছু না বুঝে দাদাকে অষ্টপহর শুধু খিস্তি করছে, স্যাটায়ার করছে গোপাল ভাঁড়ের দল!

ভৃঙ্গী কোত্থেকে এসে দাঁড়িয়েছে। 'অ্যাই নন্দে, এক রদ্দা খাবি। দাদা পাবলিকের কাছে এসব ড্রামাবাজি করতে বারণ করেছে না?' খুঁ-খুঁ করে হাসি শোনা যায়। দাড়িফাড়ি নিয়ে পাড়ার জ্ঞানী ঢোকেন। এমনিতে একটু হাঁপানি আছে, এখন হাসি চাপতে গিয়ে খুকখুক কাশিটা উঠতির দিকে।—তোদের দাদা ড্রামা করতে বারণ করেছেন, অ্যাঁ? সুযযো কোন দিকে যেন রাইজ করল রে! মোটামুটি মেলোড্রামার ওপর দিয়ে যাঁর লাইফটা চলে গেল, হেউহেউ করে আঁকাড়া চিৎকার করে, ভেউভেউ করে কান্না এক্সিবিট করে তোদের মতো কিছু পায়ের তলার চ্যালা জুটল, তিনি এখন সংযমের ক্লাস নিচ্ছেন না কি? শালা, কত শুনব মাইরি। গাঁকগাঁকের অবতার, তোমার লীলে বোঝা ভার। এই তিনি রেগে গিয়ে মেয়েছেলের পচা মড়া কাঁধে শহর প্রদক্ষিণ কচ্ছেন, ওই

ডিসেন্ট লোককে জাপটে 'অই যে নীচে পুববাংলার ম্যাপ দ্যাকা যাচ্ছে র‍্যা, কে কেড়ে নিলে র‍্যা' বলে নিকিরিপনার চূড়ান্ত করছেন, সেই তোদের মতো কোনও ওয়ার্থলেসের স্লাইট বেলপাতা-কচলানিতেই লাগ লাগ খুশি হয়ে বলছেন, আমি তাইলে খালাসিটোলা চললুম, বাকি শিল্পটা তুই ফিল আপ দ্য গ্যাপ করে নিস। নাটুকে নটবর আমার! এই তোদের দাদার জিনিয়াসগিরি? আর্ট? বল, পারে না। যতটা না গর্জায় তার চেয়ে বেশি লিটল-ম্যাগের ইন্টারভিউয়ে বর্ষায়। গল্প জমাতে না পেরে উল্টোপাল্টা মিলিয়ে দিয়ে বলে, 'কো-ইনসিডেন্সকে ফর্ম করে নিইচি।' বহুরূপীকে মা কালী সাজিয়ে, সেদিকে আঙুল দেখিয়ে 'ইয়ুং পড়েচ? টেরিব্‌ল মাদার!' বলে মাথা খায়। ওরে, যে শিল্পের ফুটনোট শুধু স্রষ্টার মগজে থাকে, তা উতরোয় না রে গাধাজন! আধশোয়া হয়ে যে তত্ত্ব ভেবেছিস, ওটাকে নিখুঁত বুনতে জানতে হয়। পরে লেকচার দিয়ে ম্যানেজ করা যায় না। অডিয়েন্সের সামনে গদগদ করে মদ ঢেলে দিলেই প্রলয়-জঙ্গি সাজা যায় না, ন্যাকামি আর পেজোমি মিশিয়ে বড়জোর মাতালদের ঠেকে চাট সাপ্লাই করা যায়। ওকে বল, আগে নাচের তাল আর ঘুঙুরের আওয়াজ মিলিয়ে সিঙ্ক করে আনতে। তারপর কথা হবে।

ভৃঙ্গী বলে, কাকু, ওটুকু তো ফাইভের ছেলেও পারে। আমাদের দাদা ও নিয়ে রগড়াবেন কেন? শিল্পী আর মিস্তিরি তো এক নয়। যিনি জ্বলন্ত পাশুপত ছুড়ে অজেয় ত্রিপুর দুর্গ খাক করেন, পায়ের একটি বুড়ো আঙুলের চাপে রাবণের হাতে গোটা পাহাড় চেপে দেন, তিনি রং মিলিয়ে গাধা-পেটাপেটি খেলতে জন্মেছেন? আপনাদের মতো নিরেস দিগ্‌গজের কথা ভেবেই উনি বলেন, রাখিতে নারিনু প্রেমজল কাঁচা হাঁড়িতে। ওঁর সৃষ্টি তুলে কথা বলছেন! জানেন, থরথর করে উনি যখন ভেতরকাঁপুনি দিয়ে ভলকে ভলকে প্রাণরস উগরে দেন, সেই তেজ ভূভারতে কেউ ধরে রাখতে পারে না? ভাবনা-দর্শন-দরদ মন্থন করে যখন সেই উজ্জ্বল প্যাশন ধক করে জ্বলে ওঠে, সব ভয়ে চোখ বুজে ফ্যালে, পাংশু হয়ে যায়। একবার উনি সেই তেজ স্বয়ং অগ্নিকে ধারণ করতে দিয়েছিলেন। সে অবধি থরথর করে, একটু পরেই ফেলে দিয়েছিল। সে তেজ গিয়ে শেষে শরবনে পড়ে। আর সেখান থেকে জন্ম নেন দেবসেনাপতি। বীরশ্রেষ্ঠ, দব্‌দবে, আগুনলোচন। এই ভাবেই তো এঁটোকাঁটা খেয়ে বড় হয় আমার দাদার সন্তানরা। তারপর তাদের ছটায় আবর্জনা কুঁকড়ে যায়। এ জিনিসকে আপনার ড্রইং রুমের পাতিত্ব ধারণ করতে গেলে ভুঁয়ে বসে যাবে যে!

কাকু কেশে নেন। বলেন, বাব্বা, বাতেলা প্রচুর শিখেছিস। পেছনে করুণ ক্ল্যারিনেটও বেশ শুনতে পাচ্ছি। বাপ আমার, এই যে ফ্যাশনটি না, ডিসিপ্লিনের অভাবটাকে সৃষ্টিশীলতা বলে মাথায় তুলে নাচা, এর চেয়ে ঘাতক সুবিধাবাদ আর দু'টি নেই। মিস্তিরি আর শিল্পী এক নয়, তার মানে কি এই, যে নিজের কাজে অমনোযোগটা একটা লোকের জোরের জায়গা? এত নাকি প্যাশন, তেজ-ঢালন, আর খোদ প্রসবের সময়টায় সে কিনা হেলাছেদ্দা করে নেশা লড়ায়, ভুঁয়ে গড়ায়? আসলে তোদের দাদা এই সর্বপাপতাপহর ইমেজটি করে রেখেছেন, কারণ অজুহাত হিসেবে এটা স্বর্গীয়। এগুলেও ট্যালেন্টের দোহাই, পিছুলেও। ভাল করতে পারলে তো মিটেই গেল, আর বাজে করলেই, কী করব, আমি না ক্রিয়েটিভ! আমি কি বসে বসে মজুরদের মতো খুঁটি প্লাস নাটি মাপব! আমার যে ভরে পাওয়া মাদুলি! ঘোরের মধ্যে কাজ! যেটুকু দৈব প্রেরণায় উতরে গেল, গেল। বাকি অকথ্য ড্যাবলাগুলো তুমি ওভারলুক করবে, এই তোমার ভক্ত হিসেবে ডিউটি। খাজনা। এতে দু'টো কাজ হয়। তোদের মতো গাড়লের কাছে একটা বাউন্ডুলে ঝোড়ো ডোন্ট-কেয়ার ন্যালাভোলার ইমেজ তৈরি করে ভাও বাড়িয়ে নেওয়াও হয়, আবার জায়গায় জায়গায় প্রতিভা ও প্রয়োগের ঘাটতিটাকে একটানে জাস্টিফাই করে দেওয়াও হয়। ওই জন্যই বাঘছাল সড়াৎ স্লিপ করে যায়, নাচতে নাচতে পা ফসকে গেলে বলতে হয়, 'ওটাই স্টাইল। পার্ফেকশন তো গাঁইয়াদের প্রায়োরিটি।' সত্যিই, আমাদের মতো 'পাতি' রুটিনে ভর্তি হয়ে কাজ করতে গেলে, কিছু জবাব দেওয়ার দায় ঘাড়ে এসে পড়ে। মাল ছড়ালে, গালাগাল খেতে হয়। এমনকী নিজে ভুল করলে নিজেরই লজ্জা করে। ঠিকগুলোর সাবাসি নেব, আর ভুলগুলোকে ভগবানের চিহ্ন বলে আরও গ্লোরিফাই করব, এই মওকাবাজ থিওরি চলে না। আমি না পারলেই, 'তোরা বুঝিসনি' বলে সহজে আঙুল তোলা যায় না। তাই চট করে ঈশ্বর হয়ে নেওয়া খুব বুদ্ধিমানের কাজ।

নিন্দুক ২ মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এসেছিলেন। বললেন, তোদের দাদার ওই প্রেমজলের ব্যাপারটা ঠিক জানি না, তবে ওঁর আত্মপ্রেমজল কিছু এক্সট্রা বোধহয়। তাই নিজেকে দিনরাত্তির এত ভরপুর লাই, নিজের পালিশ করা জ্যোতির থালার দিকে তাকিয়ে আঁখি আর ফেরে না। কোথায় অনবরত নিজেকে কোশ্চেন করবে, তা না, ফোগলা শিশুর দিকে চেয়ে মা'র দুধের মতো, প্রশ্রয়ের বান ডেকেছে। অবশ্য সে ওঁর যুক্তি বা তক্কো এমনকী গপ্পো শুনলেও বোঝা যায়। এত নির্লজ্জ স্ব-বিজ্ঞাপন তো চাদ্দিকে তাকিয়ে বিশেষ

দেখি না। নিজেকে পরম প্রফেট হিসাবে প্রচার করব, এ কোনও আত্মসম্মানওলা শিল্পীর প্রোজেক্ট হতে পারে? ছেঃ! ধাস্টামোর জাসু!

মহাদেব কখন উঠে এসেছিলেন। কেউ দেখেনি। তাঁর চোখ নিমীলিত, একটা অদ্ভুত নীলচে দ্যুতি তাঁকে ঘিরে রেখেছে। সে আলো ধ্যানের, না বেদনার, চট করে বোঝা যাচ্ছে না। গলায় অপূর্ব মালা, চওড়া হাসি, ফুটকি ফুটকি দাড়ি রূপের মতো লেগে আছে। হিমালয়ের চোখে ত্রস্ত দৃষ্টি ফলো করে হট করে তাঁকে দেখে সবাই কিছু থতমত। তটস্থও বটে। শিব হঠাৎ ম্যারাপ কাঁপিয়ে হো-হো করে শিশুর মতো অট্ট হেসে উঠলেন। বললেন, 'অ্যাই রে, ধরে ফেলেছে! আমার সব জারিজুরি ধরে ফেলেছে গো!' সবাই কোরাসে হেসে উঠল।

নিন্দুকরা ভাবল, যাক, স্বীকারোক্তি। ভক্তরা ভাবল, মোক্ষম ব্যঙ্গের চাবুক। পার্বতী ভাবলেন, উক্তিটার মূলে কী আছে? ক্ষুরধার বুদ্ধি, না একটু আগে টানা সিদ্ধি?

কেউ কিছুই সাপ্টে বুঝে উঠতে পারল না। বাসরের সময় হয়ে গেল।

পুজো ক্রোড়পত্র 'মর্তে আগমন', ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬

পয়লা বৈশাখ কত তারিখ পড়ছে?

ন্যাকামি মেরে লাভ নেই, ইংরিজি জিতে গেছে। জিতে গেছে মানে, ছক্কা মেরে, গোল দিয়ে, টাংকি মেরে রেড ফেলে, কাদায় ঠুসে, মাথা মুড়িয়ে, উল্টো গাধায় চড়িয়ে, টাকে ঘোল ছেতরে, তেপান্তরের বর্ডার ক্রসিয়ে, খেদিয়ে দিয়েছে। বাংলাকে। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় ৫০% ডিসকাউন্ট দিয়েও বিকোচ্ছে না। শপিং মলে দেড়া দামে মসলিন কিনে লোকে হ্যাঁচ্চো হেঁচে নাক পুঁছছে। বাংলা গরিব তো চিরকালই ছিল, হদ্দ গরিব, কিন্তু নিকোনো উঠোনে দুয়োরানির আলপনা দেখতে অডিয়েন্স দাঁড়িয়ে যেত। এখন বাংলা পিচুটি ও উকুনওলা ঘিনঘিনে ডাউনমার্কেট, হংসধ্বনি থেকে প্যাঁকে হড়াৎ সিলিপ খেয়েছে, সে রেগুলার প্রলাপ বকে, রাস্তার পাঁউরুটি তুলে খায়, তার সঙ্গে ঘুরতে দেখলে লোকে পার্টির লিস্টি থেকে নাম কাটে, তর্জনী প্লাস মধ্যমা পেঁচিয়ে বলে 'এ মা, টিকটিকি!' পুরুষশাসিত সমাজে যেমন সুন্দরী মেয়ের কদর সবচেয়ে বেশি, তেমনই বঙ্গদেশে ঝরঝরে ইংরিজি বলতে পারা চিরকালই সবচেয়ে প্রার্থিত গুণ, আমাদের কাছে সত্যজিৎ রায়ের সম্মান যত না বাংলা ছবি করার জন্য, তার চেয়ে ঢের বেশি 'দেকেচিস কেমন সাহেবের মতো চোস্ত ইংরিজি বলে? বাঘের বাচ্চা মাইরি!' থিমে।

তবু ইংরিজি আদৌ না-পেরে, রেগে গেলে ভুল উচ্চারণে চাড্ডি ইংখিস্তি আউড়ে আমাদের বাবা-কাকা মোটামুটি কাটিয়ে দিলেন, কিন্তু মডার্ন মনুষ্যদের ফটাফট ইংলিশ আওড়াতে না-পারলে কুমিরডাঙা খেলাতেও নেওয়া হচ্ছে না। ক'দিন পরে রেস্তোরাঁয় বাংলায় খাবার চাইলে, সিনেমার কাউন্টারে বাংলায় টিকিট চাইলে, ডিপার্টমেন্ট স্টোরে বাংলায় জাঙিয়া চাইলে, ঘাড়ে ধরে থানায় দিয়ে দেবে। ভ্যাগাবন্ড স্যর, আমাদের ইয়েতে ঢুকে পড়েছিল। বাংলায়

প্রোপোজ করলে তো বোধহয় সভা ডেকে থাপ্পড়। রবীন্দ্রগান এখনও কিছু বিকোচ্ছে, কিন্তু সে ওই নোবেলের তলানির চোটে, আর এক দু'টি বুড়ো-ব্যাচ সটকে পড়লেই ওই বিলম্বিত অ্যাঁওঅ্যাঁও সবেগে বাতিল, স্রেফ ঝিংকুচাকু পার্টি মিক্স। রবীন্দ্র জয়ন্তী হবে শুনে অকলুষ শিশু জিজ্ঞেস করবে, 'জয়ন্তী কে?' রেগে গিয়ে লাভ নেই, 'অ মা গো, কী ছিলাম কী হইলাম' মড়াক্রন্দনে কোনও চিড়েই ভিজবে না। জমানা প্রশ্নাতীত সমারসল্ট খেয়েছে। তা-ই খেয়ে থাকে। আপনি বাপের জন্মে ভবভূতি পড়েছেন? কিংবা চর্যাপদের বিটলে পদ্য? এ ট্র্যাপিজের লীলা নিরন্তর। কেউ যদি এখন পুতুলনাচ, বা সংস্কৃতে অ্যাপ্লিকেশন লেখা, বা পলিউশন রোধে অটোর বদলে পালকি প্রচলন—এসব দাবিতে আন্দোলন বাগায়, তার প্রচেষ্টা মহৎ মেনে নিয়েও আমরা তাকে গোবরা মেন্টালে পাঠাতে ব্যস্ত হব তো? সে ভাবেই, বাংলার ওপর ঝুলঝুলি দেওয়া অনিবার্য কার্টেন নেমে এসেছে, ট্র্যাজিক বাজনা বাজছে নিশ্চিত ক্লাইম্যাক্সবাচক, 'দি এন্ড' ফুটে উঠেছে শার্প ফোকাসে, পড়তে না পারলে আপনিই নিরক্ষর। 'অনেক হল' বলে মানে মানে সরে পড়া ছাড়া ভদ্রলোকের আর দ্বিতীয় পন্থা নেই। তবু প্রত্যহ বিকেলে বাচ্চারা যেমন বেড়ু-বেড়ু যায়, তেমনি আশ্চর্য তারিখবাজির খপ্পরে যদি পয়লা বোশেখ টার্গেট করে এট্টু বাঙু-বাঙু খেলে নিতে ঝাঁপান, খ্যাঁকখ্যাঁক পাবে না?

দাঁড়ান, এট্টু ক্লিয়ার করে নেওয়া যাক। এই প্রবণতা কিছু আকাশ থেকে পড়েনি। আগেও বাচ্চা সবার সামনে 'মাঁ, ফিঁফটি সিঁক্স মানে কিঁ বঁত্তিরিশ?' ফুকারি উঠলে মা গর্বে পুলকে গ্যাসবেলুন হয়ে বলতেন 'ও কিচ্ছু বেঙ্গলি জানে না রে!' কুইজ কনটেস্টে নিয়মিত টিম-ঠকানো প্রশ্ন ছিল, 'আজ বাংলা ক্যালেন্ডারে কত তারিখ?' ইদানীং বখেড়াটা পাকিয়েছে অন্য। জিতে গেছে আসলে ইংরিজি নয়, হিন্দিও না, টাকা। চিরকালই বৈভবের একটা দুরন্ত পালিশ আছে, যা সব গরিবকেই দীর্ঘশ্বাসের গর্তে ফেলে দেয়। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক কালে, ধরুন বছর কুড়ি আগেও, বাঙালি এই আস্তরণের চকচকানিকে অবিশ্বাস করতে জানত। নগ্ন বিক্কিরিবাজির প্রতি তার একটা ঘেন্না ছিল। এই ঘেন্নাটা খুব পবিত্র। বাঙালি ছিল এমন একটা জাত, যে পণ্ডিতকে বড়লোকের চেয়ে বেশি সম্মান দিত, স্মার্টনেসের চেয়ে ভালমানুষিকে বেশি আদর দিত। এখনকার ছেলেমেয়েরা নাক সিঁটকে বলে, 'আসলে তোমরা টাকা করতে পারোনি, তাই নিজেদের ওসব হাবিজাবি জপিয়ে নিয়েছিলে।' সঙ্গে বাবার টাকা-অক্ষমতার আক্ষেপে 'শিট'ও বলে। শিট মানে গু। কোনও

ভদ্রলোকে সে কথা কাপ থেকে কফি চলকে গেলেই উচ্চারণ করবে না। কিন্তু সে মূল্যবোধও কখন চলকে গেছে।

ইংরিজিয়ানা এখন সপ্রতিভতা, জিতে যাওয়া, ঠিকঠাক ট্র্যাকে দৌড়নো, লাইনেই থাকা-র চিহ্ন। হিন্দি তারই প্রায়-যমজ সহোদর। ইংরিজি সিনেমা খুব খারাপ, ফাঁপা, কিন্তু ক্যামেরা-ট্যামেরা অপূর্ব। হিন্দি গানের রেকর্ডিং-এর যন্ত্রপাতিই আলাদা। ষোলো হাজার টাকার জামা-জুতো-প্যান্টালুন, ব্লিচ করা হাসি, কম বয়সে কাঁড়ি কাঁড়ি রোজগার, এস এম এস-এ প্রোপোজ করা বা প্রত্যাখ্যান জানানো, বাপের বয়সী লোককে পিঠ চাপড়ে দেওয়া, শুধু ফ্ল্যাট আর গাড়ির কথা ভেবে দিনযাপন, ভালবাসার ক্ষেত্রে ডিওডোর‍্যান্টের সর্বাধিক গুরুত্ব—এসব ওই দু'আঙুলে 'ভি' দেখানো সংস্কৃতির মিছিল, রকে বসে ষাটের দশক ভেজে খাওয়া বাঙালি যা দেখে হৃদি চড়কগাছ করে আছে। লাখ লাখ টাকায় ফ্ল্যাট বিকোচ্ছে, একফোঁটা ছেলেপুলে কোটি কোটি টাকা পাচ্ছে, উঠন্ত এসকালেটরে উল্টোবাগে নেমে আসছে যৌবন-টাটানো যুবাযুবি। এর সঙ্গে বাঙালিয়ানা পারবে না। শপিং মল-এ ঢুকতে তার পায়ে ঝিঁঝি ধরে যায়, সিনিয়রদের অপমান করে জুনিয়র তারকা হাততালি কুড়োচ্ছে জেনে তার হাঁটু খুলে আসে, কাষ্ঠ হেসে সে সন্তানকে কিনে দেয় আঠারো-পকেট পাজামা, বাংলা ব্যান্ডের বেসুরো চিৎকারের সিডি। তার হাত থেকে ফসকে যাওয়া ক্যাচের মতো জীবন বেরিয়ে গেছে। প্রাদেশিক ভাষায়, কমদামি যন্ত্রে, ইস্তিরিহীন জামায়, বোদলেয়রের নাম জানার গর্বে, সিড়িঙ্গে কব্জিতে, কোলাপুরি জুতোয় পিছলোতে পিছলোতে সে আর সুইচবিহীন আই-ফোন বাগে আনতে পারবে না। বাথরুমই খুঁজে পায় না মাল্টিপ্লেক্সে গিয়ে। বাথরুমকে যে 'লু' বলতে হয়, তা-ই বা শিখল কই?

না, চুলে খুশকি থাকা ভাল বলছি না। কিন্তু খুশকিহীনতাকেই মানুষের সেরা পরিচয় মনে করার চেয়ে ভাল। বাঙালিয়ানা বদলাতেই পারে, যুগে যুগে তা বদলাবে সে তো স্বাভাবিকই, 'টাকা মানেই খারাপ' এও তো বিচ্ছিরি কুসংস্কার—কিন্তু শুধু টাকা করাই ভাল, এবং টাকা করলেই সাতাত্তর খুন মাপ, এবং টাকা না-পেলে সে কাজ করার মানেই হয় না, সকল প্রয়াসের সার্থকতা হাতে-গরম বস্তুগত লাভে : এ জিনিস বাঙালির মজ্জায় ছিল না। হ্যাক থু করে চৌপহর গুটখার পিক ফেলব আর সেই থুৎকারে উড়িয়ে দেব লিটল ম্যাগাজিন, কমলকুমার, বাজারের সঙ্গে আপসহীন শিল্পপ্রয়াস, টুইলের শার্ট পরে টিউশনি ক্লুরে কাটিয়ে দেওয়া বাপদাদা, নম্রতাকে দুর্বলতা ঠাওরাব,

অভদ্রতাকে স্মার্টনেস ভাবব, গরিবকে মায়া না-করে ব্যঙ্গ করব, ঝুপড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া লাইভ দেখে বলব 'যাক বাবা, ওখানটায় পার্ক হলে মিষ্টুকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া যাবে'—এই জাত বাঙালি নয়।

বাঙালির কিচ্ছু ছিল না, সে ভারী ক্যাবলা কোঁচকানো ভিতু ছিল, কিন্তু তার নোংরা রুমালে মোড়া একখানা হিরে ছিল, তা হল বহিরঙ্গের পালিশের চেয়ে অন্তরের ঐশ্বর্যের দিকে ঝুঁকে থাকার প্রবণতা। সেটা সে পেয়েছিল তাঁদের কাছ থেকে, যাঁরা বছরের পর বছর ছ্যাৎলা-পড়া কুঠুরির মেঝেতে আসনপিঁড়ি বসে ঝুঁকে লিখে গেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, যাঁরা এক কথায় বিশাল চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন মোসাহেবি করবেন না বলে, যাঁরা ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ারে লাথি মেরে রাজনীতি করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন, যাঁরা বস্তির মানুষের জীবনকে আর একটু স্বচ্ছন্দ করতে সমস্ত মধ্যবিত্ত সুখ ছেড়েছেন, যাঁরা জেলখানায় পাগলের মতো অত্যাচার সয়েও বাইরে এসে প্রসন্নতা হারাননি। 'তোমার বাজারদর কত?' এই প্রশ্নকে বাঙালি চূড়ান্ত অশ্লীলই মনে করেছে। এখন, উল্টো। জিতে গেছে লোভের সংস্কৃতি। টাকা দেখলেই কষ বেয়ে নীতিহীন লাল পড়া এখন মান্যতা পেয়ে গেছে। ইংরিজিয়ানা, ইংরিজি কেতা, পয়সার ঔদ্ধত্য, মূর্খতার গৌরব, 'মানুষ ছোট ক্ষতি নেই পকেট তো বড়', 'জিততে গেলে স্লেজিং করব', পরাজিত-র দিকে আঙুল দেখিয়ে নির্মম অপমান—এই টাকা করার আবশ্যিক শর্ত। বাঙালিয়ানা এখন মাথা হেঁট করে থাকার ব্যাপার। যৌন অসুখের মতো, মায়ের কলঙ্কের মতো, মুখের দুর্গন্ধের মতো, ঢেকে রাখতে হয়। পয়লা বৈশাখ নিশ্চয়ই আছে। মাংস, মদ খাওয়ার দিন। এস এম এস-এ শুভা নাভাভার্সা পাঠাবার দিন। থাকবেও। নেড়ি কুকুররা যেভাবে দগদগে ঘা নিয়েও, থিকথিকে এঁটুলি নিয়েও, ধুঁকতে ধুঁকতে থেকে যায়। যদ্দিন না নিপুণ নিখুঁত নিশ্চিত কর্পোরেশনের গাড়ি এসে তাদের টুঁটি ধরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

বিশেষ 'কলকাতা' ক্রোড়পত্র, ২০০৮

পুজোর পকেট-বুক

শোকের বাড়িতে ঢোকার আগে যেমন ভাল করে রুমাল দিয়ে হাসিটাসি মুছে, রামগরুড়ের বংশধরের মতো মুখ করে নিয়ে কলিং বেল বাজানোই দস্তুর, ভীষণ দুঃখু দুঃখু করে 'কোথা থেকে কী হয়ে গেল' এক্সপ্রেশন ধরে রাখতে হয় ঠাকমা টু ছোটনাতি—পুজোর সময় একেবারে বিপরীত বাধ্যতা। এবং সত্যি বলতে, আরও মর্মান্তিক। মনে যতই অবসাদ বজবজিয়ে উঠুক, রগ টিপটিপ করুক ঘ্যানঘেনে ভাল-না-লাগায়, ঘাড়ে লোহার ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে থাকুক ছিঁচকে ব্যর্থতাবোধ বা জেনারেল বিষণ্ণতা—তোমায় ছেঁড়া তোশকের ওপরে থান বেডকভারের ন্যায় একখান এক্স এক্স এল সাইজ আমোদগেঁড়ে হাসি ঝুলিয়ে রাখতে হবেই। পুজো এসেছে যে! যেহেতু লেখা আছে এটাই সেরা পাব্বন, রচনাবইয়ে এবং সমষ্টিপ্রবাদে, ফলে তুমি চলতি আনন্দস্রোতের বেশ মাইলটাক ল্যাটিচুড লংগিচুড টপকে একটি খোঁচ-বেরনো বেতের মোড়া এনে বারান্দার রেলিঙে থুতনি সেঁটে বসে থাকবে ও মলিন বাল্বের ন্যায় স্তিমিত ডিপ্রেশন পোয়াবে—টোটাল নিষিদ্ধ। সিগারেট প্যাকেটের ছোট ছাপার চেয়েও কড়াকড় ফরমান। তোমার মৌলিক অধিকারের গলা ডলে চ্যাংদোলা করে স্বল্প দুলিয়ে সবাই ঝপাস করে ছুড়ে দেবে আনন্দামৃতের পুলে। আর অমনি চুপ্পুড় ধমাকা প্রথাসিদ্ধ স্প্রে করে বগলে ও হৃদে, তোমায় বেরিয়ে পড়তে হবে, খড়খড়ে জামা ও পায়ে কড়া ফেলা বজ্জাত জুতোর দলে ভিড়ে, মামাতো ভাই বা পিসতুতো বাড়িওলার কাঁধে ঘামফুটকি মিলিয়ে, রামচক্কর কাটতে হবে একডালিয়া বা দোডালিয়া বা তিন, কোঁত করে গিলতে হবে অকথ্য রোল/কুলপি/ধোসার জেরক্স/গাজরের মোমো (এবং পকেটে থাক এক পাতা ডাইজিন, শেষপাতের ঈশ্বর), কান ফাঁক করে শুনতে হবে ফাটা বাঁশের

মতো মাইকের গান, পাঁজরায় সইতে হবে কনুই বাঘনখ কোঁতকা, আর জ্যামে সুপার-সহিষ্ণু নিতম্ব ঠেকিয়ে বসে থাকতে হবে অহল্যার বাবা হয়ে, যুগের পর যুগ। মজা করতে হবে, না? পালিয়ে যাবে কোথায়!

যাঁরা বলেন বাঙালি জাতের মধ্যে কায়িক শ্রমের স্পৃহা নেই, বা সাধারণ মানুষ আলস্যের পোকা, তাঁদের নড়া ধরে একবার পুজোয় রাউন্ড দেওয়াতে হয়। কী সাংঘাতিক অবান্তর বখেড়া! তলা থেকে আলো জ্বলে জ্বলে একটা পাতি ডিজাইন করা নারকোল গাছ হচ্ছে, তাই একশো সতেরো বার দেখে আঁখি না ফিরে। ধোনি ছক্কা মারলে তো কথাই নেই। অবশ্য মাঝখানে একটা স্ট্রোকের তোল্লাই অ্যাকশন অন্ধকার হয়ে আছে। চন্দননগরেও হেভি লোডশেডিং চলছে বোধহয়। তা ছাড়া ড্রাকুলা উড়ছে। কচ্ছপের ডিম অবধি এই মওকায় এগ রোলে বিকশিত। ঈশ্বরচন্দ্রের 'প্রথম ভাগ' বেধড়ক বিক্কিরি হচ্ছে, লাল শালুতে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর কিছু মন্দা। গোল্লা শেপের বেলুনসমষ্টিতে যেই না রাইফেল টিপ, চলতি ভিড় থেকে 'অভিনব বিন্দ্রা মাইরি' আওয়াজ বাঁধা। মাটিতে বিছোনো র‍্যাপারে এইটুকুন টুকুন প্লাস্টিকের টিউকল, গ্যাস সিলিন্ডার, এমনকী ডবল বেড। খুদে গিন্নি হাঁটু গেড়ে দর করছে, গরুতে ফ্রক মাড়িয়ে দিয়ে গেল সে খেয়ালও নেই। নিজের সংসারের হাল আর কে ধরবে বলো ন'দিভাই!

পিলপিল করছে, গিজগিজ করছে লোক। পাঁইপাঁই করে রাস্তা পেরোচ্ছে। হুড়মুড় করে আনন্দ পোয়াচ্ছে। ভয়ানক চেঁচাচ্ছে, একে-তাকে ডাকছে, গাড়ির তোয়াক্কা না করে রাস্তার অ্যাক্কেরে কম্পাস মেপে মধ্যিখান ধরছে, আছোলা বাঁশ তোয়াক্কা না করে টুকুস ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে। প্যান্ডেলে ব্যাজ পরা দুঁদে লোকের একশো বারণ সত্ত্বেও নাগাড়ে হাত দিয়ে দিচ্ছে কড়িতে ঝিনুকে টেরাকোটার শুঁয়োপোকায়। আর অবশ্যই, প্রবল গণতান্ত্রিক ভ্রাতৃত্বে অচেনা লোকের জামায় ঘাম মুছে নিচ্ছে, কিংবা হাতের উল্টোপিঠের রোলের সস।

সংগঠকরাও তেড়ে শয়তান। 'পিছনের লোককে দর্শনের সুযোগ দিন' চিল্লিয়ে সামনের লোককে এক সেকেন্ডও দাঁড়াতে দিচ্ছে না। নিজেদের পাওয়া বিগত চুয়াল্লিশটা ট্রফি সাজিয়ে রেখে দিয়েছে ধ্যাকড়া স্টেজ বাঁধিয়ে, তাতে রোগা গলি আরও উনপাঁজুরে স্লিম। প্রাচীন গ্রামের মন্দির করা হয়েছে, তাই কালচে কুপির লালচে শিখা ছাড়া আলো নেই। ছমছমে বিচ্ছিরি এঁদো ১৭৮৭-তে পায়ে পায়ে জনসমুদ্র চলেছে। সবার ঘাড়েগর্দানে মশার মতো

আরও একুশটা লোক সেঁটে। মাইকে ঝিঁঝি ডাকছে। হটাস করে দড়ি পড়ে গেল। এবার দাঁড়াও, ঠায় আরও পৌনে ঘণ্টা। সে কী দাদা, আগের বার যে অনেক বেশি লোক যেতে দিলেন। আরে ইচ্ছে করে করে জায়গাটা জ্যাম করছে বুঝলেন না? কালকে খবরের কাগজে ছবি বেরোবে, অমুক জায়গায় ভিড়ে ভিড়াক্কার! শাশুড়ি আর বউ দড়ির ও-পারে, সরসর এগোচ্ছে। দেশভাগের সংকট রিভিজিটেড। আরে দাদা, কী মুশকিল, আমাকে ছাড়ুন, শাশুড়ি একা যাবেন কী করে! কী বললেন, অত ইয়াং শাশুড়ি হয় না? মা দুগ্গা তো স্বয়ং নারায়ণের শাশুড়ি। পিতিমেটিকে তবে ফোকলা বুড়ি করুন, ইয়ে থাকলে!

এদিকে সেলফোনের আসল নাম ক্যামেরা। সবাই সব ঠাকুরের ছবি তুলে রেখে দিচ্ছে। প্রাইভেট পুজো পরিক্রমা। মশারির মধ্যে ঢুকে এট্টু মহম্মদ আলি পার্ক দেখবে। কিংবা ম্যাডক্স স্কোয়ারে যে মেয়েটা নীল স্কার্ট পরে এসেছিল। বাচ্চারা তিন চার সেট উরুর মধ্যিখানে রেগুলার চিপকে যাচ্ছে। কিন্তু চাপা টুঁটি নিয়েই চেঁচাচ্ছে, বাবা দ্যাখো, কাত্তিকের মৌর প্যাখম মেলতে ভুলে গেছে! কে বাচ্চা সবে এই গ্রহে ক'দিন হল এসেছে, লক্ষ্মীর প্যাঁচাকে 'ব্যাম্ভেজ ভূত' ভেবে আকুল কান্না আর থামে না। ঠামুর কাছে যাব! সাদা কাগজে মোটা লাল স্কেচপেনে 'মহিলা' লেখা না দেখেই পুরুষ ঢুকে যাচ্ছে। ফের দড়ির তলা দিয়ে গুঁড়ি মেরে এদিকে আসা। দেখে বন্ধুরা চেঁচিয়ে গোদা কাটিং আদিরস ছুড়ছে ছ্যারছ্যার। একুশ-বাইশের তন্বী গ্রুপটা তাতেই লজ্জা আর সুখে টকটকে। অবশ্য আলোও পড়েছে তাপস সেনের নাটকের মতো, কমলা সেলোফেনে ঢাকা। এই কনে-দেখা ময়দানে কে যেন ফট করে দৃষ্টি সুইপ করতে গিয়ে পুরনো প্রেমিকাকে দেখল, স্বামী-ছেলের সঙ্গে উদ্ভাসিত মুখ। সে ইচ্ছে করে পিছিয়ে পড়ছে।

ইদিকে লোনসম্রাটের ছ'পকেটি সমাহারের এক পকেটে গাড়ির চাবি অ্যায়সান খোঁচা খোঁচা হয়ে জেগে, যেন থাইয়ে মিনি-ত্রিশূলের দংশন। গাড়ি অবশ্য পার্ক করতে হয়েছে সাতাশি মাইল দূরে। বড়লোকিয়ানার মাশুল। ট্রামে চড়ে এলে যতটা হাঁটতে হত, তার দেড়শো গুণ হেঁটে, গোড়ালির নলি টাটিয়ে, ফুসফুস ফাটিয়ে, মালাইচাকিতে খচ খচাৎ একশো ভোজালি খেয়ে, শুধু ফোনে ছোটপিসিকে বলা: 'আর বোলো না, টাবুন কোনও কথাই শুনল না, এসি গাড়ি চড়ে নাকি গোটা কলকাতা ঘুরতে হবে। কালকে আবার নর্থটা কভার করব ভাবছি।' কোনও মতে ঠাকুরকে আলগোছে স্যালুট ঠুকে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে

ফেরত। গাড়ি অবশ্য যেখানে ছিল, সেখানে আর নেই। ভলান্টিয়াররা আরও পঁচিশ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে উজিয়ে ঠেলে দিয়েছে। তাতে কী? নেটিভদের মতো ট্রামে-বাসে? ওঃ, ইমপসিব্‌ল!

আর এক পকেটে রংদার ফর্ম, মা দুগ্গার বাঁ দিকে শ্রেষ্ঠ হাত সিলেক্ট করুন। আরও পুঁটলি-পাকানো রাশি রাশি নমিনেশন-কাগজ। এক্ষুনি বেছে নিন শ্রেষ্ঠ সিংহ, সেরা অসুর, অতুলনীয় কাত্তিক, প্লেগপতি ইঁদুর, ফিগারিণী সরস্বতী, প্যাঁকবিশারদ হাঁস, লাজুকতম কলাবউ, মৃততম মহিষ। বিচারকের সঙ্গে মিলে গেলে পাচ্ছেন এ-ক-দ-ম ফ্রি দু'প্যাকেট নাটবল্টু/রেশনের ব্যাগ ভর্তি আলুনি চিপ্‌স/ল্যাগবেগে হাফপ্যান্ট। বিচারক অবশ্য ছেষট্টিটা কোম্পানি থেকে দুশো সাঁইত্রিশ জন। গাড়ি থেকে নেমে হাঁপ টানতে টানতে প্যান্ডেলের দিকে চলেছেন। সকাল থেকে নাগরদোলার কান্নিক খাওয়া ঘোড়ার মতো পাক মেরে কাহিলেশ্বর। টিপিন জুটেছে ক্যাম্বিস বলের মতো দানাদার ও এঁটেল মাটির ন্যায় এগরোল। পাড়ার দাদারা তড়িঘড়ি এসে আসুন বসুন কোল্ড ড্রিংকস, মাটিতে গাঁথা টিউবলাইটগুলো মাড়িয়ে দেবেন না প্লিজ, ওগুলো প্রাগৈতিহাসিক জোনাকি হয়েছে। আর গানটা খেয়াল করবেন ম্যাডাম, লারেলাপ্পা ক্যানসেল, প্যানপ্যানে ভোমরার মতো রবীন্দ্রসংগীত দিবারাত। কালচার, না?

পুজোরা নিজেরাও প্রাইজ ও ইন্টার-অ্যাকটিভের আস্তাবল। কুইজ হয়ে গেল, অন্ত্যাক্ষরী তো ফি দিন সাতাশ বার, তারপর বাঘা বাঘা সেলিব্রিটি নিয়ে ডিবেট: গণেশের শুঁড় কোন দিকে বেঁকে থাকা উচিত। মধ্যিখানে পাড়া মাতিয়ে হয়ে গেছে 'মাজা হিলাকে দিখা'। বনেদি বৈঠকখানা থেকে লাজুক ভঙ্গিতে মেয়েরা এসে দনাদন আইটেম ঝটকা মেরে হৃদয় মাল্টিকালার করে দিয়ে গেছে। পুংসমাজ হিলে আছে বেশ। হাবভাব দেখে কাগাবগা অবধি তালে তালে ডাকছে। বাইরের লোকও এসে নবমীতে নাচতে পারে। ভাইটালস্ট্যাট-সহ অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতে হবে তরুণ সংঘ-র কাছে। সেখানে ক্যারম বোর্ডের পাশে লাল পড়ে মেঝে ড্যাম্প।

লোফারদের ফুর্তির বান ডেকেছে। নয়া নয়া তরিকায় মেয়েদের অবলোকন ও অপমানের ব্লুপ্রিন্ট রেডি। মূল অশ্লীল দাদা ঘামে-ভেজা পাঞ্জাবি আর গর্দানে সেন্টেড রুমালের থাবড়ায় আগে আগে যাবেন। তাঁর ইশারায় ধাক্কাধাক্কি শুরু হবে। বিপন্ন মহিলাদের কানের সামনে শেয়ালের চিল্লান,

নেকড়ের হলদে শ্বদাঁত বের করে গরগর। কিছুক্ষণের জন্য কোনও কোনও ভদ্রনারীর শারদীয় আনন্দে ছাই ঢেলে দেওয়া হবে। আলো পানসে ঠেকবে। কী মজা! পরের প্যান্ডেলে আরও ভিড়। চল চল, মোচ্ছব গ্যারান্টি। ক্যাবলা স্বামীটা কিস্যু বোঝেনি, বারবার জিগেস করছে কী হল, কী হল! শরীর খারাপ লাগছে? বউটা শেষকালে ঠোঁট চেপে বলল, ওঃ, আদিখ্যেতা কোরো না তো, সরবত খাওয়াও। ছেলেরা একটু দূরে হাই-ফাইভ করছে। একজন ভাসান-নেত্যর পোজ দিল। দ্যাখ বস কেমন লাগছে! এ বলল শাহরুখ খান। পোজম্যান বলল, ধুর বে, অক্ষয় কুমার বল। গলায় সাপ জড়াচ্ছে মাইরি, কী জিনিস!

টিভি ক্যামেরা নিয়ে অলিতে গলিতে কালোজিরের মতো ছড়িয়েছে অ্যাংকরের দল। প্রত্যেকের নাকের সামনে মাইক হাঁকড়ে ভীষণ ভেবেচিন্তে ডিপ প্রশ্ন করছে। ছোটবেলার পুজোয় কোনও মজার ঘটনা? বিবাহিত জীবনের পুজো আর কুমারী জীবনের পুজোয় তফাত? আপনি গণেশ হলে মাথা প্লাস্টিক সার্জারি করাতেন কি না। ক্যামেরায় উঁকি দিতে গোটা জনগণ মা ছেড়ে লেন্স দেখছে। দিদি কবে দেখাবে? রিপিট আছে? দাদা আমার ক্লোজটা ঠিকঠাক এসছে তো, ওই যে চুল আঁচড়াচ্ছি? আউর হ্যাঁ, নগদ হাঙ্গামা আছে বই কী! এই সুদৃশ্য ফ্রাইং কড়াইটি পাবেন বউদি, যদি দাদা দিতে পারেন একটা ইইজি প্রশ্নের চটজলদি উত্তর: লক্ষ্মীর বাহন কে? (ক) বাঁদর, (খ) ক্যাঙারু, (গ) প্ল্যাটিপাস, (ঘ) ডাইনোসর। দাদা ফ্যালফ্যাল। ভিড় করে দাঁড়ানো গোটা সার্কল বাকরুদ্ধ। ক্যামেরাম্যানের খোঁচায় অ্যাংকরিণী ধাঁ করে স্লিপ অব টাং বুঝে অ্যাল ক্রিয়ায় জিভ কাটে। আসলি কাগজ-টুকরা ভুল করে ফেলে রেখেছে থাইয়ের শ্রীপকেটে। সবই পকেটের ব্যাপার, বললাম না?

পকেটমারদের ওভারটাইম। ডাকাতদের যেমন মা কালী, পকেটমারদের মা দুগ্গা। বিড়বিড় করে নাম জপতে জপতে ঝলমল সিজনে বেরিয়ে পড়ো। টার্গেট মিট না করতে পারলে বস চামড়া তুলে নেবে। মুশকিল, এখন সবাই পায়ের চেটোর কাছটায় টাকা রাখছে। ফুটপাথে সাষ্টাং হয়ে গড় তো আর করা যায় না। শেষমেশ একলাটে আড়ষ্ট রোগা ছেলের পেছনপকেট থেকে দুশো মেরে দিল। ছেলে আর কী করে, মন মুষড়ে একটা নির্জন ছোট্টমতো গলিতে। এইটুকুনি প্যান্ডেল। ঘরোয়া পুজো, যেন ঠান্ডা একতলার আটপৌরে ঘর থেকে গজিয়ে উঠেছে। পাশে একটা অ্যাত্তবড় ঝিল গা আলগা করে তিন চারটে

মাস্তর টুনিমালার আয়না হয়েছে। স্বাস্থ্যবানরা সিগারেট ধরিয়ে গোল হয়ে চেয়ারে জীবন চাখছে, এমন সময় হট করে চোখ পড়ে গেল। পাশের আঁধার বারান্দাতেই গ্রিলে মুখ চেপে অমন শ্যামলা বউদিটা কেন কাঁদছে ভেবে পেল না। একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। তারপর সেই মুখটা মনে চেপে হাঁটতে হাঁটতে বাগবাজার। মাসির বাড়ি থেকে খুচরো নিয়ে বাসে চেপে বসা। ভাগ্যিস পকেটমার হয়েছিল। প্রণামে বিশ্বাস করে না। কিন্তু বাসের জানলা দিয়ে আকাশে তাকিয়ে বলল থ্যাঙ্কু। অন্ধকার আকাশে তখন লাগাতার পশ্চিমবঙ্গের আলোর ছোঁয়াচ লাগছিল।

'আনন্দ উৎসব ডটকম' ওয়েবসাইট, পুজো ২০০৮

অপুর প্রথম ভোট

'বুথের মধ্যে কী গেল বাবা, বড় বড় কান?'

হরিহর স্তম্ভিত হইয়া নবীন পালিতের অতীত গৌরবগাথা শুনিতেছিল। 'তখন আমি জ্যোতি বোসের ডান হাত, বুইলে না? তো এক দিন জ্যোতিবাবু বললেন, নবীন, সকাল থেকে গা-টা জ্বর জ্বর কচ্ছে, স্পিচটা তুমিই লিখে দাও। আমার তো, বুইলে না, মৃগীর মতো হাত-পা কাঁপচে। ভয়ে করেছি কী, সব কমপ্লিট সেন্টেন্স লিখে দিয়েচি।' সবাই এইটুকু শুনিয়া তটস্থ হইয়া নবীনের দিকে ঘেঁষিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ ছেলেটির সরু রিনরিনে স্বর ফের বাজিয়া উঠিল, 'কী গেল বাবা? এই দ্যাখো বাবা, এমনি করে অ্যাত্তোখানি কলার তোলা, কালো কালো চশমা, হাত দুটো এমন করে হাঁটছে যেন বগলে ফোঁড়া, হ্যাঁ বাবা!' হরিহর এইবার রাগিয়া গেল। 'ওঃ, তুমি বড্ড হাঁ করা ছেলে বাপু। চুপ করে দাঁড়াও দিকি। তখন থেকে খালি এটা কী ওটা কী, এমনি করলে কিন্তু পুলিশ এসে লাইন থেকে বের করে দেবে!'

লাইন বড় কম পড়ে নাই। আসলে, আসিতেও অনেকটা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। পাকা গৃহস্থের দলের সঙ্গে এই টুলটুলে মুখের সুকুমারকান্তি কিশোরটি জুটিয়াই যত বিপত্তি। বাবার অজস্র তাড়া এবং 'খোকা, নাও নাও পা চালাও' বকুনি সত্ত্বেও সে পদে পদে থামিয়াছে, মুখ উঁচু করিয়া সব ব্যানার পড়িয়াছে, মাঠে চরিতে থাকা গরু-বাছুরের ধবল গাত্রে আলকাতরা দিয়া 'অমুক পার্টিকে ভোট দিন' লিখন দেখিয়া উহা প্রকৃতিদত্ত কি না পরীক্ষা করিতে রাস্তা হইতে ছুটিয়া গিয়াছে, ধাবমান রিকশার পিছনে পতপত করিয়া ওড়া নির্বাচনী চিহ্নগুলি দেখিয়া অবাক হইয়া ভাবিয়াছে, 'বাঃ, কারা এমন সুন্দর আঁকে? আচ্ছা, আমি যদি সি পি এম-কে গিয়ে বলি, কিচ্ছু দিতে হবে না, আমি অমনি অমনি তাদের কাস্তে-হাতুড়ি গাছে গাছে এঁকে দেব, শুধু একটা লাল

রঙের টিন আর ইয়া মোটা বুরুশ, দেবে না কেন, বাঃ, নিশ্চয়ই দেবে।' হরিহর একটু বিরক্তই হয়। তাহার এই ছেলেটি আঠারোয় পা দিল, ভোট দিতে যাইতেছে, অথচ গড়নে কিছুটা সাবালকত্ব আসিলেও, মস্তিষ্কে যেন বাড়চাড় নাই। এই বয়সে আগেকার কালে লোকে দুই ছেলের বাপ হইত।

প্রসন্ন টিচারের প্রায় মুখে মুখ ঠেকাইয়া নবীন পালিত বলিল, 'ভায়া, কান্তি বিশ্বাসের কথাই যখন তুললে তখন বলি। টিকিট সে পাবে কোত্থেকে?' চাঁদিফাটা রৌদ্রে গল্পের গন্ধে ভোটের লাইন ম-ম করিতেছে। কোন গ্রামে নাকি মেয়ে-বউরা সব জোড়াফুল ছাপ ছাপ শাড়ি পরিয়া ভোট দিতে আসিয়াছে। পুলিশ আচ্ছা জব্দ, তাহারা বুঝিতেছে অন্যায় পাবলিসিটি, কিন্তু টান মারিয়া শাড়ি তো খুলিয়া লইতে পারে না! শাড়ি খোলার প্রসঙ্গে সাতঘরার ভয়াবহ ঘটনার কথা উঠিয়া পড়িল। দীনু মুখুজ্জে রাতারাতি পার্টি বদলাইয়া ফেলায় তাহার স্ত্রীকে ল্যাংটো করিয়া চুল ধরিয়া হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে সারা গ্রাম ঘোরানো হইয়াছে। সকলে মাথা নাড়াইয়া চুক চুক করিয়া শব্দ করিল। শুধু একজনের এ সকল কেচ্ছায় এতটুকু মন নাই। এই মুহূর্তে সে প্রাণপণ অবাক হইয়া একটি অশীতিপর বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া ছিল। বাপ রে, এই বয়সেও ছেলের কোলে চড়ে ভোট দিতে এসেচে দ্যাখো...কিন্তু তাহার চিন্তাস্রোতে সহসা বাধা পড়িল। ফের চেঁচাইয়া 'ওই যাচ্চে বাবা, দ্যাখো বাবা, ওই গেল বাবা, বড় বড় কান' বলিয়া ছটফট করিয়া অস্থির। রাজকৃষ্ণ হাসিয়া ফেলিল, 'ওটা ক্যাডার খোকা, ক্যাডার।' ক্যাডার! —জীবন্ত! একেবারে তোমার সামনে হাঁটিয়া বেড়ায়, হম্বিতম্বি করে! সতুদার কাছে সে ইহাদের অশিক্ষিত আনুগত্য, নির্বোধ গুন্ডামির কথা শুনিয়াছে, সেই সেবার জষ্ঠিমাসে চিনিবাস ময়রা-কে টুকরা করিয়া কুপাইয়া রাখিয়া গেল কে বা কাহারা, অজস্র মিষ্টান্নের মধ্যে পড়িয়া থাকা তাহার কর্তিত মুণ্ডটি দেখিতে উঠানে ভিড় ভাঙিয়া পড়িল আর সকলেই বলিল 'ক্যাডারে করেচে', বাবাও সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় বসিয়া বহু বার শেলেটে লিখিতে দিয়াছে, 'ওই ক্যাডার, বাপ রে!', কিন্তু সে জিনিসটিকে নশ্বর পৃথিবীতে এমন সত্যিকারের চলিতে-ফিরিতে দেখিবে, তাহার কল্পনারও বাহিরে ছিল। উজ্জ্বল মুখ তুলিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাদের এখেনে টিভি চ্যানেলরা আসবে বাবা?'

এমনিতেই গত দু'সপ্তাহ অপু আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে। ভোট দিবে সে এবার, ভোট! কম দায়িত্ব তাহার! দেশ গড়িবে! তাড়াহুড়া করিয়া ভুল বোতাম টিপিয়া বসিবে না তো! আচ্ছা, মা তাহার আই-ডি কার্ডটা গুছাইয়া রাখিয়াছে?

ঠিক হারাইয়াছে! দুশ্চিন্তায় সে মাঝরাতে বিছানায় সোজা উঠিয়া বসে। অনেক খুঁজিয়া একটা পছন্দসই লম্বা কঞ্চি জোগাড় হইয়াছে। তাহার ডগায় সে নিজের গেঞ্জিটা খুলিয়া জড়াইয়া নেয়। বাঁশবনের ভিতরে গিয়া সে ওইটা উঁচু করিয়া ধরিয়া চলিতে থাকে...ওঃ, কী মিছিল কী মিছিল...সল্‌তেখাগী তলা থেকে সেই ব্রিগেড অবধি! না, সে কোনও দলে যোগ দেয় নাই...সকলে হদ্দমুদ্দ করিয়া সাধিয়াছে, তবু কেহ তাহাকে টলাইতে পারে নাই...দেশবাসীর অনুরোধে সে নিজের পার্টি তৈরি করিয়াছে, প্রতিদিন কোটি কোটি লোক আসিয়া তাহার দলে নাম লিখাইতেছে, অপূর্ববাবুর জন্য তাহারা প্রাণ দিতে পারে...অপু জনসভায় বক্তৃতা দিতেছে, মাথায় মাথায় সমুদ্র হইয়া গিয়াছে...ওজস্বী উদ্দীপক ভাষার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের জিংগল মিশাইয়া দিতেছে, 'পৃথিবী আমারে চায়, খুলে দাও বাহুডোর, ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর', তাহার কথায় লোকে এই হাসিয়া লুটাইতেছে ওই কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। এমন বক্তা, এমন সংগঠক, এমন দেশপ্রেমিক আর আসে নাই। তারপর সেই দিন সকলে বারণ করিল, ওইখানে যাবেন না, আমরা জানি, আপনাকে খুন করতে ওরা লোক লাগিয়েচে...অপু কিছুতে শুনিল না, সঙ্গে বডিগার্ড নিল না, মানুষের উপর তাহার এমনি বিশ্বাস, তার পর তাহাকে উহারা নৃশংস ভাবে হত্যা করিল। তাহার মৃতদেহ লইয়া মিছিল হইতেছে...এমন শোকমিছিল কেহ কখনও দেখে নাই...দেশ জুড়িয়া হাহাকার, বিলাপ, ক্রন্দন...। নিজের মৃতদেহের দিকে তাকাইয়া অপু শেওড়া ঝোপের আড়ালে বসিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।

কিছুর মধ্যে কিছু না, দিদি রাগিয়া গেল। 'তেমনি হাবা হয়েছ তুমি! ওদের কথা কেউ বিশ্বাস করে! টিউকল হবে না ছাই হবে। পাকা হাসপাতাল হবে না কচুপোড়া হবে!' তাহাকে ভেংচাইয়া দিদি ছুটিয়া যায়। পোড়ারমুখি কলিকাতার সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিল, সারা দিন রৌদ্র মাথায় টো-টো করিয়া ঘোরে, কোন ঝোপে-জঙ্গলে বেড়াইতে গিয়া মাওবাদীদের সঙ্গে আলাপ করিয়া, তাহাদের কাছে 'ভোট বয়কট' মন্ত্র শিখিয়া আসিয়াছে। সারাক্ষণ মুখোমুখি তর্ক। সাধে কি মা চেঁচায়, 'মানিকবাবু যে তোমায় মরা দেখিয়েছিলেন, বেশ করেছিলেন!' কাল রাত্রে শুইয়া অপু জানলা দিয়া বাহিরে মিটিমিটি নক্ষত্রগুলির দিকে তাকাইয়া পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের কথা ভাবিতেছে, বড্ড অনেক দূর হইতে কেহ যেন তাহাকে ডাকিতেছে, 'কমরেড অপু-উ-উ', সর্বান্তঃকরণ লইয়া সে সাড়া দিতেছে 'যাআই', হঠাৎ দিদি তাহার পিঠে দুম করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল, 'দামড়া গাধা! বাঁশবনে ভোট-ভোট খেলচেন! তোমার ওই চোর

নেতাগুলো রোজ সকালে উঠে আমাদের বুকে বাঁশ ডলে, তবে না বাহ্যে যায়!' অপুর কান জ্বালা করিয়া উঠিল। সে দিদিকে একটা খুব কঠিন, খুব রূঢ়, খুব একটা প্রাণ-বিঁধানো কথা বলিতে চাহিল। ফট করিয়া মনে পড়িল শহর হইতে দুইটা পাশ দেওয়া উপেনদা-র বুলি। কাটিয়া কাটিয়া বলিল, 'আর কদ্দিন এসব পুতুপুতু কাঁদুনি নিয়ে থাকবি দিদি? তোদের লেভেলটাই আসলে নিচু—বি-লেভেল। সুযোগ ঢেলে গড়াগড়ি যাচ্ছে, নিবি না...শুয়ে শুয়ে নালিশ গাইতে বড় সুখ। চ্যাপেলের কথা শুনেছিস? নিজেকে এ-লেভেলে নিয়ে যা।' ইহার পুরস্কারস্বরূপ আজ বাহির হইবার সময় দরজার আড়াল হইতে সুর করিয়া 'অপু এ-লেভেলে—অপু এ-লেভেলে—' টিটকিরি শুনিয়া আসিতে হইয়াছে।

এক হুড়াহুড়িতে অপুর চমক ভাঙিল। একটি তেইশ-চব্বিশ বছরের পাতলা ময়লা রং-এর ছেলেকে ধরিয়া কাহারা নির্মম ভাবে মারিতেছে। নাকি নিজের নামে ভোট দিয়া গিয়াছিল, ফের নিজেরই যমজ ভাই সাজিয়া ভোট দিতে আসিয়াছে। কিন্তু তৃণমূলের পোলিং এজেন্টকে ফাঁকি দেওয়া কি অতই সহজ? সে দুজনের সঙ্গেই দিনের পর দিন ক্লাবে ক্যারম খেলিয়াছে। ভাবিল, ও কী, অমুক তো বাড়ি চলিয়া গেল, ইহার তো ঠোঁটের তলায় একটি ক্ষুদ্র আঁচিল থাকিবার কথা। মুহূর্তের মধ্যেই কলার টানিয়া ধরিয়াছে। তাহার সহকর্মীরা ঘিরিয়া ধরিয়া অজস্র ধারায় কিল চড় ঘুষি বর্ষণ করিতেছে, সি পি এম-এর কিছু কর্মী নিরপেক্ষতা দেখাইতে মুখে ক্রমাগত লাথি মারিতেছে, কংগ্রেসি একজন শুধু মুঠা মুঠা চুল ছিঁড়িয়া লইতেছে, ছেলেটি লুটাপুটি খাইতে খাইতে রক্ত-সিকনি মাখামাখি মুখে উন্মত্ত জনসঙ্ঘকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে, আঁচিল খসিয়া পড়া এক নিতান্ত স্বাভাবিক নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। হরিহর তাহার পুত্রকে চেনে, এখুনি তাহার চোখ উপচাইয়া গাল ভাসিয়া যাইবে, সকলে ধেড়ে ছেলের মায়া দেখিয়া হাসিয়া খুন হইবে। হরিহর তাড়াতাড়ি বলিল, 'পার্টি আপিস পার্টি আপিস করছিলে, ও—ই দ্যাখো পার্টি আপিস। রাজুদা লাইনটা একটু রাখবেন? চলো, ঘুরিয়ে নে আসি।'

আগে এখানে সাহেবদের নীলকুঠি ছিল। এখন রঙের দাপটে লালকুঠি বলা যাইতে পারে। পুরোটাই পতাকা দিয়া মোড়া, অপু উঁকি দিয়া দেখিল, কিছু পাকানো চেহারার ছোকরা বিড়ি খাইতে খাইতে তাস খেলিতেছে। বাকিরা বেঞ্চিতে পা দোলাইয়া কেব্‌ল টিভি দেখিতেছে। অপু ভাবিয়াছিল দেওয়ালে টাঙানো মনীষীগণের ফোটোগুলি একটু দেখিবে, কিন্তু ছেলেগুলি এমন করিয়া হলদেটে চোখ তুলিয়া ঠান্ডা স্থির চাহিয়া রহিল...একজন আগাইয়া আসিয়া

কহিল, 'কী মেসোমসাই, কী দেখচেন? তাজমহল?' অপুর মেরুদণ্ড দিয়া যেন এক শীতল সরীসৃপ নামিয়া গেল। হরিহর থতমত খাইয়া বলিল, 'এই একটু...হেঁহেঁহেঁ...চলো তোমায় বলছিলাম না, সাহেবের বাচ্চার কবর দেখিয়ে আনি। আহা সাত বছরের কচি ছেলে...।' তড়িঘড়ি তাহারা ধার ঘেঁষিয়া রাস্তায় পড়িল। কিন্তু সে কবরের উপর শহিদ বেদি উঠিয়াছে। কালো পাথরের ফলকের উপর সমাধিস্থ শিশুর স্মরণলেখন ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিয়া নিহত কমরেডদের নাম খচিত। হরিহর কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া দেখিয়া, বলিল, চলো চলো, আবার লাইন এগিয়ে গেল কি না দেখি।

লাইন সত্যই অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে। রাজকৃষ্ণবাবু তাহাদের জায়গা ছাড়িয়া দিতেই, অপু আসিয়া গেল বুথের একদম সামনে! তাহার হৃৎপিণ্ড যেন ফাটিয়া পড়িবে! কিন্তু তাহার স্লিপটি হাতে লইয়া ভোটবাবু কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকাইয়া থাকিলেন, তারপর বলিলেন, 'আপনার ভোট তো হয়ে গেছে!' হইয়া গিয়াছে মানে? অপু কিছুক্ষণ কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না। সে তো ভোট দেয় নাই! একসঙ্গে অনেক কথা, উদ্বেগ ও বিস্ময় আসিয়া বুকের মধ্যে ঠেলাঠেলি করিয়া যেন তাহাকে একেবারে নির্বাক করিয়া দিল, শুধু 'আমি...আমি তো...যাঃ, তা কী করে...' বলিয়া চারি দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিল। হরিহর বলিল, 'কী বলছেন মশায়, এই চচ্চড়ে রোদ মাথায় করে কখন থেকে...দেকুন ভুল হচ্ছে কোথাও...।' কিন্তু হরিহরেরও ভোট পড়িয়া গিয়াছে। বাবুটি ক্রমে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। 'গ্যাজ্ঞাম করচেন কেন? পেছনের লোককে চান্স দিন!' অপু এতক্ষণে বুঝিতে পারিল তাহার বোধহয় ভোট দেওয়া হইবে না। তাহার গা যেন ভাঙিয়া আসিল। বাঃ রে! বেশ তো! সে কেন ভোট দিতে পারিবে না? সে তো কোনও অপরাধ করে নাই? তীব্র স্বরে সে বলিল, 'দেখুন, এ ভারী অন্যায় কিন্তু—' হঠাৎ একটা চোয়াড়ে মতো টেরি বাগানো ছেলে তাহাকে লক্ষ করিয়া উঠিয়া আসিল। 'এই যে ভাই, তুমি এক্ষুনি লাইনের মাঝখানে ঢুকলে না?' তাহার ভঙ্গি দেখিয়া অপুর জিভ জড়াইয়া যায়। কোনও মতে বলে, 'না, মানে, আমরা তো...' হরিহর বলে, 'আরে এই এঁদের জিগেস করুন না—' কিন্তু ছেলেটি তাহাকে হাত তুলিয়া থামাইয়া দেয়, 'আপনার সঙ্গে কথা বলেছি?' কে জানে, ছেলের সামনে এত ধমক খাইতে হয়তো হরিহরের ভাল লাগিল না, সে একটু গলা চড়াইয়াই বলিল, 'আরে দূর মশায়, বলচি তো পইপই করে আমরা এখেনেই ক'ঘণ্টা ধরে...শেষে পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরতে...জায়গা রেখে একটু ওদিকটায়...'ছেলেটি খেঁকাইয়া বলিল, 'এটা সিনেমার লাইন পেয়েচ, রাস্কেল? জায়গা রেখে হাওয়া খাচ্ছ, এতগুলো

লোক তা হলে ইট পেতে বাড়ি গিয়ে ভাত-পঞ্চব্যঞ্জন গিলে আসুক! লাইন ভেঙে ঢুকছে, হাড়হাভাতে বস্তি-ঝুপড়ির দল, আবার মুখে-মুখে কথা!' সে কলার ধরিয়া হরিহরকে লাইন থেকে টানিয়া বাহির করিল। সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মতো আরও ন'দশটি ছেলে যেন মাটি ফুঁড়িয়া হাজির হইল। হরিহর বলিল, 'আরে আরে, এঁয়ারা সব...বলুন না নবীনবাবু...' কিন্তু নবীন পালিত সহসা তাঁহার ছাতাটি লইয়া খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অপুর মুখটা রাঙা টকটকে হইয়া উঠিয়াছে, সে 'এ কী করচেন কী করচেন' বলিতে বলিতে হুমড়ি খাইয়া বাবার কলার ছাড়াইতে গেল। তখন তাহার গালে সপাটে প্রথম থাপ্পড়টি আসিয়া পড়িল। অপু কেমন বিস্ময়ের সঙ্গে ক্যাডারটি ও তাহার পুনরায় উদ্যত পাঞ্জার দিকে চাহিল—তাহার বিভ্রান্ত মন যেন প্রথমটা প্রহার খাওয়ার সত্যটাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না, পরে সে কতটা নিজের অজ্ঞাতসারেই পরের চড়টা ঠেকাইবার জন্য হাত দুখানা উঠাইল। ব্যস, যায় কোথায়? 'আবার ফিরে মারে? গাঁইয়া শুয়ারের আবার পেছন ভরা তেজ!' বলিয়া অনেকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

মন্থর গতিতে দলটি ফিরিতেছে। নবীন পালিতের গল্প আর জমিতেছে না। অপুর চোখে কোথা হইতে বার বার ধূলা উড়িয়া পড়িতেছে। ক্ষারকাচা শার্টের হাতা দিয়া মুখ মুছিয়া মুছিয়া সে চামড়া প্রায় ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। বাহির হইতে কেমন মনে হইবে সে ঠোঁট টিপিয়া মাটির দিকে তাকাইয়া চলিতেছে, কিন্তু মনে মনে সে অনবরত জপ করিতেছে, পাঁচ বছর পর আমার যেন ভোট দেওয়া হয়, ভগবান, তুমি এই কোরো যেন পরের বার ঠিক ভোট দেওয়া হয়—নইলে বাঁচব না—পায়ে পড়ি তোমার--

গণতন্ত্রের দেবতা কাষ্ঠ হাসিয়া বলেন—মূর্খ কিশোর, তামাশা তো আমার শেষ হয়নি তোমার এক দিনের ঝাড় খাওয়ায়, ক্যাডারের রোয়াবে কিংবা শহিদ বেদির ভণ্ডামিতে? তোমার অপমান ছাড়িয়ে, তোমার সামনে তোমার বাবার অপমান ছাড়িয়ে, তোমার বাবার বাবার অপমান ছাড়িয়ে, বটকেরা আমার চলে গেল কত দূর—সূর্যোদয় ছাড়িয়ে পিচুটিময় ঘুপচি আঁধারের দিকে, ভিতরভূমি ছাড়িয়ে পিচ্ছিল ইতরমহলের দিকে...

সে কমেডির অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় পালায় ভর্তি করেছি!...

চলো এগিয়ে যাই।

নববর্ষ ক্রোড়পত্র 'রেখেছ ভোটার করে', ১৫ এপ্রিল ২০০৬

আমার ও-পার কাঁকুড়গাছি

জপ্পো পড়ছে পত্র নড়ছে ফ্রগা ডাকছে ফ্রগি
এমনো দিনেই তো গুরু জমবে পেডাগগি
দাগড়া ক্ষত শ্বাসের মতো ঘটক দিয়ে সাঁতলা
কেহ কাঁদবে 'দোহাই আলি' কেহ ফাঁদবে 'আঁতলা'
দোলবসন্ত খুশির পুষি অটোর তলায় অট্ট
ওভারব্রিজে চুপসিরিজে হঠাৎ কী যে কট্টাস!
আমার না কি বাবার গল্প? কলকাতায় না বঙ্গে?
আজও বইছে সুরের ধুনী বাজে গাইছে মঙ্গেশ
হাওয়া সরলেই ঢাকের কাঠি ইলশে ঝরলেই পদ্মা
কেহ বলছে জাতির নাতি কেহ ঝলছে গদ্দার
নৌকোভর্তি স্বর্ণধান্য পার্শ্ববর্তী সন্ধে
রেগে হাঁকছে কমল মিত্র প্রণয়পাপের গন্ধে
সাদা-কালো ছুট লাগাল রঙিন হয়ে চিত্তির
হায় রে কালার এ কী জ্বালার বুড়োচ্ছে সৌমিত্তির
অর্থাৎ কিনা অপুর ফুলুট কালিনী নঈ কূলে
আর বাজে না, রাধে গেছেন তীব্র কো-এড স্কুলে
ছেদের নাকি মেয়েদের গল্প? পার্টিশন না পার্টি?
ঘোর কলি না শহরতলি? ছিন্ন বীণার তারটি
যে ধ্রুব-রভসে গোঙায়: নাড়ির? না হাফ-কাব্য?
চল্, প্রদাদুর ব্যথায় চুবে শহিদ-শহিদ ভাবব!

আসলি ঝঞ্ঝা: এ যৈবন যায় তেপান্তরের নর্থে
নস্টালজিয়া আয় সখিয়া জল খেলি নিঃশর্তে
স্মৃতির খাঁজে মিথের টুনি জ্বলতিনিভতি জেল্লা
ও-পারেতে শৈশব আমার একশো সোনার কেল্লা
আমার ও-পার কাঁকুড়গাছি তোমার ও-পার সিক্সটিজ
সন্ধেশাঁখে ও-পার থাকে, রোবিননাথন ফিক্সড-ই
মহান ব্যথা দারুণ পুঁজি, নিজের মায়ায় ছলকে
ছুঁচ-কে দিলাম ফালের গ্ল্যামার, আগুনকে জাত-কক্কে
সব্জিশাকে সুপ্ত থাকে ভেতরজমির কান্না
সেই লবণেই সোয়াদ ভনে দ্রুপদবালার রান্না
তেমন যদি ভোরের ঘুমে আসতে থাকেন ঠাম্মু
রিংটোনে দাও লালন ফকির, স্ক্রিন-সেভারে: 'তার' মুখ।

নববর্ষ ক্রোড়পত্র 'তবু রঙ্গে ভরা', ২৫ এপ্রিল ২০০৫

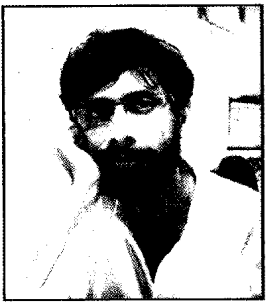

চন্দ্রিল ভট্টাচার্য সুইটজারল্যান্ডে মানুষ হননি, বদ্রিয়ার পড়েননি, নাকতলা মিনিবাসে কন্ডাক্টরের সঙ্গে হাতাহাতি করেননি, হারেম রাখেননি, গাঁজা টানেননি, হেলিকপ্টারে চড়েননি, সত্যজিৎ রায়কে গাল পাড়েননি, প্রচুর ডলারের প্রাইজ প্রত্যাখ্যান করেননি, বিষাদ-ব্রেকডাউন খেয়ে দু'দফায় দেড় বছর করে অ্যাসাইলামে থাকেননি, ভিখিরিকে হিরের আংটি অবহেলায় দিয়ে দেননি, রাইফেল ছুঁয়ে দেখেননি, ছ-ফুট দুই হননি, কয়লাখনির নীচে নামেননি, দেউলিয়া হয়ে বাড়িওলার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াননি, ভাসানে নাচেননি, সারেগামাপাধানি।

লেখকের ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমারবই.কম amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও !

Amarboi.com Like 814

Say Thanks to Humayun Ahmed at www.humayunahmed.org

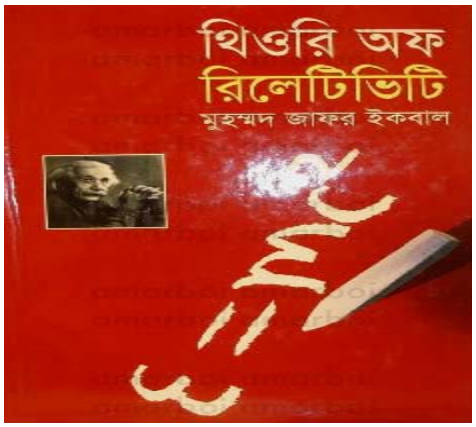

থিওরি অফ রিলেটিভিটি - মুহম্মদ জাফর ইকবাল

30 Nov 2011 | 1 comments

// থিওরি অফ রিলেটিভিটি E=mc[2]মুহম্মদ জাফর ইকবাল You can follow us ... *Read more*

আলোচিত বইগুলি

Dec/01 পূর্ব পশ্চিম (অখন্ড) - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

Dec/01 হাঙ্গর নদী গ্রেনেড - সেলিনা হোসেন

Dec/01 Winner of Amazon Gift Card

Nov/30 থিওরি অফ রিলেটিভিটি - মুহম্মদ জাফর ইকবাল

Nov/26 তিন ডব্লিউ - হুমায়ূন আহমেদ

Nov/26 অর্ধেক জীবন - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

Nov/25 AmarBoi Gets Google+ Page. Join. Win A Amazon.com Gift Card!

Nov/23 তেল দেবেন ঘনাদা - বাংলা সম্পূর্ণ কমিক

Nov/22 বৃক্ষকথা - হুমায়ূন আহমেদ

Nov/19 কচ্ছপকাহিনি হুমায়ূন আহমেদ

আরোও আছে

জনপ্রিয় বইগুলি

হিমু এবং হার্ভার্ড পিএইচডি বন্টুভাই - হুম আহমেদ

থিওরি অফ রিলেটিভিটি - মুহম্মদ জাফর ই

মিসির আলি বিষয়ক রচনা যখন নামিবে ত

প্রডিজি - মুহাম্মদ জাফর ইকবাল [বইমেলা

একটি সাইকেল এবং কয়েকটি ডাহুক পা আহমেদ

মেঘের উপর বাড়ি (২০১১ ঈদ) হুমায়ূন আ

হুমায়ূন আহমেদ এবং হুমায়ূন আহমেদ

শার্লক হোমস গল্প সংগ্রহ

রাতুলের রাত রাতুলের দিন - মুহম্মদ জাফর

বৃক্ষকথা - হুমায়ূন আহমেদ

বাংলা বই

পূর্ব পশ্চিম (অখন্ড) - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হাঙ্গর নদী গ্রেনেড - সেলিনা হোসেন

Winner of Amazon Gift Card

থিওরি অফ রিলেটিভিটি - মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আলোচিত বই

থিওরি অফ রিলেটিভিটি - মুহম্মদ জাফর ইকবাল

30 Nov 2011 | 1 comments

// থিওরি অফ রিলেটিভিটি E=mc[2]মুহম্মদ জাফর ইকবাল You can follow us ...*Read more*

Subscribe To Get F Books!

enter your email address...

subscribe

RECENT POSTS | COMMENTS

পূর্ব পশ্চিম (অখন্ড) - সুনীল গঙ্গো
01 DEC 2011

হাঙ্গর নদী গ্রেনেড - সেলিনা হোসেন
01 DEC 2011